

জীবনের বিবর্তন-১ম খণ্ড (Auto Biography)



ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো
Venerable Prajna Bangsa Mahathero



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

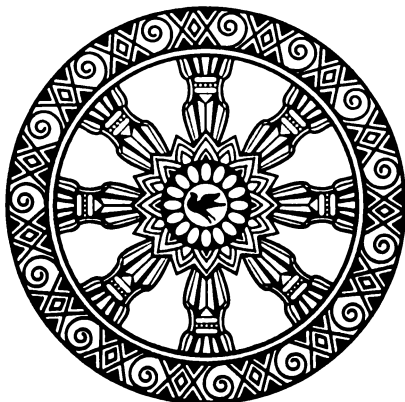
কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhikkhu

জীবনের বিবর্তন-১ম খণ্ড (Auto Biography)



ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো
Venerable Prajna Bangsa Mahathero

বনভন্ডে-প্রজ্ঞাবংশ একাডেমী
শ্রীশান ভূমি শাক্যমুণি বুদ্ধ বিহার ও প্রজ্ঞাজ্যোতি ধ্যান কেন্দ্র
মোগলটুলি, আশ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

জীবনের বিবর্তন – ১ম খণ্ড

(Auto Biography)

- প্রকাশনায় :- অনুত্তর বড়ুয়া, হলদিয়া, চট্টগ্রাম ।
- প্রকাশকাল :- ভদ্রান্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো এর ৫৯তম জন্ম
জয়ন্তী স্মরণে প্রকাশিত ।
১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ইংরেজী
৩রা ফাল্গুন, ১৪১৪ বাংলা ।
- কম্পিউটার কম্পোজ :- শ্রীমৎ মুদিতারত্ন ভিক্সু
শ্রীমৎ শাসনজ্যোতি ভিক্সু
গহিরা শান্তিময় বিহার, চট্টগ্রাম ।
- সহযোগীতায় :- সাধক নন্দবংশ ভিক্সু
শ্রীমৎ তিলোকাবংশ ভিক্সু
শ্রীমৎ সত্যপাল ভিক্সু
শ্রীমৎ বিপুলবংশ ভিক্সু
শীলালংকার ব্রহ্মচারী
- প্রুফ সংশোধনে :- শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো
শ্রীমৎ বুদ্ধবংশ ভিক্সু
- গ্রন্থসম্বন্ধ :- বনভঙ্কে-প্রজ্ঞাবংশ একাডেমী কর্তৃক সর্বসম্বন্ধ সংরক্ষিত ।
- প্রাপ্তিস্থান :- শ্রীশানভূমি শাক্যমুণি বুদ্ধ বিহার, চট্টগ্রাম ।
গহিরা শান্তিময় বিহার, রাউজান, চট্টগ্রাম ।

উৎসর্গ

প্রয়াত
মাতা পিতা,
শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু
সহ যাদের অবদানে এ জীবন
গড়ে উঠলো, সেই মহানগণের ঋণ
স্মরণ করে কৃতজ্ঞ পূজায় উৎসর্গিত হলো ।

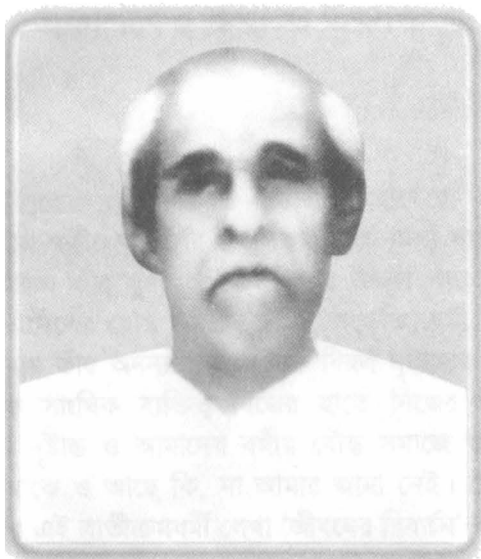
ইতি
প্রজ্ঞাবংশ মহাধেরো

ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো'র



প্রয়াত পিতা : যতীন্দ্র লাল বড়ুয়া, মাতা : রাজলক্ষ্মী বড়ুয়া

প্রকাশকের পিতা-মাতার ছবি



প্রয়াত পিতাঃ সিন্দুরাজ বড়ুয়া



মাতা : মল্লিকা বড়ুয়া

প্রকাশকের কথা ও উৎসর্গ

আমাদের অতীব শ্রদ্ধেয় ধর্মগুরু ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাধেরো বাংলা-ভারতের বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজে স্বকীয় আদর্শের উজ্জ্বলতায় এক নমস্য সাংঘিক ব্যক্তিত্ব। বুদ্ধের প্রবর্তিত সজ্জ তঁার সুদীর্ঘ ৩৫টি বছরের উজ্জ্বল পদচারণা আমাদের বিমুক্ত করেছে। এদেশের বৌদ্ধ সমাজে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ও মানবতার সেবায় তঁার অনন্য অবদান এক বিরল দৃষ্টান্তের প্রতীক তিনি। এমন এক দুর্লভ সাংঘিক ব্যক্তিত্ব নিজের হাতে নিজের জীবন কাহিনী লিখেছেন। এমন দৃষ্টান্ত ও আমাদের বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজে শুধু নহে, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মাঝে ও আছে কি, না আমার জানা নেই। তেমন, একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের এই ব্যতীক্রমধর্মী লেখা ‘জীবনের বিবর্তন’- নামক গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড-টি ভদন্ত মহোদয়ের ৫৯তম জন্ম জয়ন্তী স্মরণে প্রকাশের সুযোগ পেয়ে আমি এবং আমার পরিবারের সবাই সত্যিই গৌরব বোধ করছি।

শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা সাধনায় সমুজ্জ্বল এ পুণ্য পুরুষের আত্মজীবনী প্রকাশের মহতী পুণ্যরাশি আমাদের প্রয়াত পিতা সিন্দুরাজ বড়ুয়া এবং মাতা মল্লিকা রাণী বড়ুয়া এর প্রতি কৃতজ্ঞ পূজায় উৎসর্গ করছি। আমাদের জীবন যাদের সর্বস্ব দান দ্বারা অনন্ত অপ্রমাণ ঋণ পাশে আবদ্ধ করেছেন সেই পরম স্নেহময় পিতা এবং স্নেহময়ী মাতা- এ পুণ্যের প্রভাবে সর্ব দুঃখহীন পরমাশান্তি নির্বাণ অধিগমে সক্ষম হোন।

প্রণতঃ

স্নেহদ্য অনুত্তর বড়ুয়া।

Young Buddhist Association's Certificate To Ven. Prajna Bangsa Mahathero



YOUNG BUDDHISTS ASSOCIATION OF THAILAND
UNDER ROYAL PATRONAGE

58/8, Petchkasem 54, Pasicharoen, Bangkok 10160 Tel. 413-1706, 413-3131



TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Venerable Prajnabangsa Bhikkhu, secretary general, Bangladesh Supreme Sangha Council is personally and organizationally wellknown to us. He is an energetic young and leading Buddhist monk who devoted himself in various socio-religious and humanitarian welfare activities at home and abroad.

It will be very much appreciated if he gets necessary help from any person, authorities or organization in this connection.

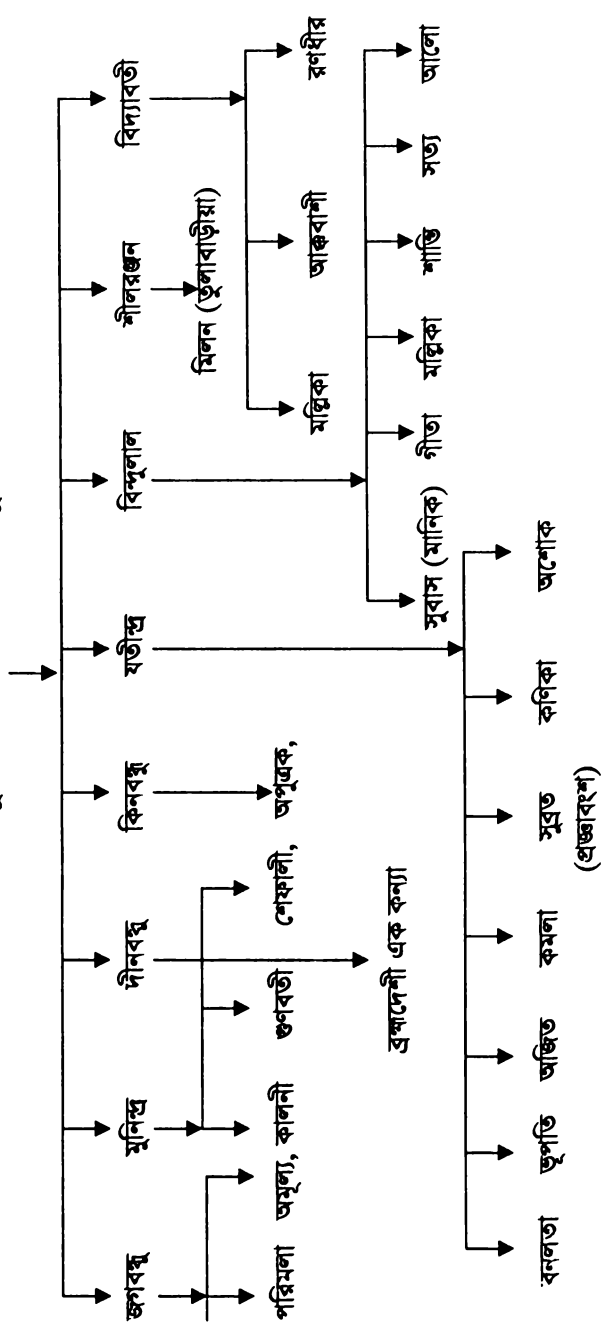
We wish you a successful long life with blessings of the noble Triple Gems.

Bangkok, 24th November 1992,
YOUNG BUDDHISTS ASSOCIATION OF THAILAND
UNDER ROYAL PATRONAGE

(Anurut Vongvanij)
President

ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশের প্রজন্ম পরিচিতি :

মতুঞ্জয় বড়ুয়া, পত্নী জ্ঞানদারঞ্জন বড়ুয়ার বোন



জীবনের বিবর্তন :

প্রজ্ঞাবংশের আত্মচরিত উপাখ্যানের জন্ম কথা

সেই ১৯৮৯ইং থেকে ৯৬ইং পর্যন্ত দীর্ঘ ৭টি বছর ভিক্ষু প্রজ্ঞাবংশের জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেছে সবচেয়ে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়। চট্টগ্রাম মহানগরীর বৌদ্ধ মন্দির সড়কস্থ চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ভদন্ত শীলাচার শাস্ত্রীর মহাপ্রয়াণে প্রথমে প্রস্তাব এসেছিল রাউজান উপজেলার কদলপুরস্থ বাংলাদেশ ভিক্ষু প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মহাপরিচালক অধ্যাপক ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ খেরো মহোদয়কে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ পদের বরণ করার। কিন্তু, বড়ুয়া সমাজের হীন স্বার্থবাদী অবমূল্যায়ন প্রবৃত্তির চিরাচরিত নিয়মে শেষ পর্যন্ত উপাধ্যক্ষ পদেই তার অবস্থান হলো। অধ্যক্ষ পদে এলেন, অশীতিপর বৃদ্ধ, স্মৃতি শক্তি, দেহশক্তিহীন, কেবল দান-দক্ষিণা সংগ্রহ সর্বস্ব এক প্রবীণ মহাখেরো। সংগত কারণেই প্রাচীনতম কেন্দ্রিয় বৌদ্ধ বিহারের দাবীদার, চট্টগ্রাম মহানগরীর ব্যস্ততম এই বিহারটির যাবতীয় খুট-ঝামেলা, উপদ্রব তার বহন করতে হয়েছে উপাধ্যক্ষ প্রজ্ঞাবংশ খেরোকে। তিথি শ্রাদ্ধ, অতিথি অভ্যাগতদের নিয়ে ভোর ৪টা থেকে রাত ১২টা, ১টা পর্যন্ত রুটিন মাসিক ঐতিহ্যবাহী ব্যস্ততার মাঝে, বাড়তি আর একটি ভয়ানক ব্যস্ততা যুক্ত হয়ে গেল উপাধ্যক্ষ প্রজ্ঞাবংশের ভাগ্যে। তা হচ্ছে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের দখল নিয়ে বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি বনাম ভদন্ত অজিতানন্দ মহাখেরো ঞ্চপের তীব্র-যুদ্ধ। উপাসক হেমেন্দ্র লাল বড়ুয়ার নেতৃত্বে দুর্বল বৌদ্ধ সমিতি এক পর্যায়ে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার হতে বিতাড়িত হওয়ার মুখে, প্রজ্ঞাবংশ ভিক্ষুর দৌলতে সংঘরাজ ভিক্ষু মহামণ্ডলের প্রবল সহযোগীতায় অষ্টম সংঘরাজ, নবম সংঘরাজ, যুদ্ধের অবসানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার নিজ দখলে রাখতে সক্ষম হলো।

দীর্ঘ ৭ বছর ধরে চলা এই চর দখলী যুদ্ধের অবর্ণনীয় দুঃখ নির্মাতনের মাঝে ও ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ জাতীয়, আন্তর্জাতিক দান সংগ্রহের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারে ভিক্ষু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে শীলাচার ভবনের তৃতীয় তল নির্মাণ, নিয়মিত আয়ের উৎস হিসেবে ধর্মবংশ ইনিষ্টিটিউট ভবন নির্মাণ সহ বিহারের ক্ষত-বিক্ষত দ্বিতীয় তলের বুদ্ধাসন সহ হল ঘরটির মোজাইক করণ, বোধি-ঘর নির্মাণ; ইত্যাদি উন্নয়ন মূলক কাজ সম্পাদন করেন। শুধু তা-ই নহে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের প্রয়াত

তিন অধ্যক্ষ অগ্রমহাপণ্ডিত ধর্মবংশ মহাস্থবিরের স্মৃতিতে ধর্মবংশ ইনষ্টিটিউটের নামাকরণ, ভদন্ত দীপঙ্কর মহাস্থবিরের স্মৃতিতে চট্টগ্রাম পালি কলেজকে দীপঙ্কর পালি কলেজে নাম পরিবর্তন প্রয়াস সহ ভদন্তের নামে দ্বিতলের বুদ্ধাসনকে দীপঙ্কর স্মৃতিবেদী নামাকরণ এবং ভদন্ত শীলাচারের স্মৃতিতে ‘শীলাচার ভবন’ নামাকরণ, ইত্যাদি কৃতজ্ঞ পূজা দানও করা হয়, এই প্রজ্ঞাবংশের হাতে।

চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের উপরোক্ত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড কিন্তু, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির মোটেই মনঃপূত হয়নি। অপর দিকে সেই দুর্যোগ পূর্ণ সময়ে, বিদেশী আর্থিক অনুদানে কুমিল্লার বড়ইগাঁও অনাথাশ্রম, রাউজানের হিঙ্গলা অনাথাশ্রম, কদলপুরে প্যারীমোহন-সুমনতিষ্য অনাথাশ্রম, বিনাজুরী ধর্মকথিক অনাথাশ্রম, পটিয়ার মুকুট নাইটে পূর্ণাচার শিশুসদন, উখিয়ার পাতাবাড়ী অনাথাশ্রম এবং রাস্তামাটির ভেদভেদি সংঘারাম, রাজস্থলীর বাঙ্গালহালিয়া অনাথাশ্রম সমূহে পাকা দালান নির্মাণ সহ দান অনুদান সংগ্রহ করে দেয়া; চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন প্যাগোডায় গোবিন্দ-গুণালংকার বৌদ্ধ ছাত্রাবাস এবং প্রজ্ঞাবংশের প্রব্রজ্যাস্থান রামুর রামকোটে জগজ্জোতি শিশুসদনের মতো দৃষ্টি নন্দন প্রতিষ্ঠান স্থাপন সহ বিশ্ব বৌদ্ধদের আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের সাথে নীবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে গিয়ে এই প্রজ্ঞাবংশ ভীষণ মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায় জাতীয় আন্তর্জাতিক ভাবে একচ্ছত্র আধিপত্যকামী কিছু বড়ুয়া, চাকমা ভিক্স-গৃহী ব্যক্তিদের।

উল্লেখ্য যে, বড়ুয়া বৌদ্ধ ভিক্স সংঘে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশের আবির্ভাবের আগে, সংঘরাজ নিকায়ের ভিক্সদের মধ্যে গুটিকয় ভিক্স ব্যক্তিত্ব ধর্ম ও সমাজ কল্যাণ কর্মে নানা পর্যায়ে কিছু অবদান রাখলেও সেই অগ্রগতি ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশের মতো তত ব্যাপক ছিল না। সাধারণ শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত, বাংলা- ইংরেজী ভাষায় সহজ-সাবলীল, সর্বোপরি সাংগঠনিক ও সৃজনশীল প্রতিভায় উজ্জ্বল মেধার অধিকারী ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশের আত্ম-পরিচয়হীন স্বার্থ-বুদ্ধি সম্পন্ন কিছু লোকের চক্কু শূল হয়ে দাঁড়ায়। সেই হীনতারই এক জঘন্য বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৯৬ সালে Buddha's Light International Association তথা BLIA- বাংলাদেশ তাইওয়ানস্থ এক সংস্থার কানাডা- শাখা কর্তৃক আয়োজিত ভ্যাঙ্কভার সম্মেলন উপলক্ষ্যে। উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্যে কেবল BLIA- বাংলাদেশ শাখা নহে, অন্যান্য বড়ুয়া বৌদ্ধ সংগঠনের অনেক নেতা-নেত্রী ও কানাডা সরকারের ডিসা প্রার্থী হয়েছিলেন। এই প্রার্থীর সংখ্যা প্রায় অর্ধশত অতিক্রম করেছিল। কিন্তু, ডিসা পেলেন মাত্র প্রজ্ঞাবংশ, শীলভদ্র, সুগতপ্রিয়- এই ভিক্স ত্রয় সহ ডঃ বিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়া। ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বাঁধা প্রাণ্ড হলো মাত্র প্রজ্ঞাবংশ ভিক্স। ভদন্ত মহোদয়ের ব্যবহারিক দ্রব্য ও কাগজ পত্রের ব্যাগ সিঙ্গাপুর বিমানে উঠে গেলেও তা নামিয়ে আনা হলো, তার বোর্ডিং- কার্ড নিয়ে নেয়া হলো, কানাডার ভ্যাঙ্কভার সম্মেলনে যোগদানে তাঁকে আর যেতে দেয়া হলো না। তাঁর অপরাধ কি? তাঁকে ইমেগ্রেশন চেক পোষ্ট হতে

পরামর্শ দেয়া হলো, বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আর বিদেশ মন্ত্রণালয়ে গিয়ে এ প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে। মহামুণি পাহাড়তলীর সু-সন্ধান, ধর্ম ও সমাজ কল্যাণে নিবেদিত প্রাণা মন্ত্রণালয় কর্মকর্তা উপাসক কাজলপ্রিয় বড়ুয়ার অক্লান্ত পরিশ্রমে আবিস্কৃত হলো;- প্রজ্ঞাবংশ ভিক্ষু পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বাধীনতাকামী শান্তি বাহিনীর বার্তাবাহী হয়ে কানাডার ভ্যাঙ্কভার সম্মেলনে যাচ্ছেন; এই মর্মে ফোনে অভিযোগ করা হয়েছে, এই দুই মন্ত্রণালয়ে। অথচ সেই প্রজ্ঞাবংশ জীবনে কোন দিন এই শান্তিবাহিনীকে স্বচক্ষে দেখিনি, কেবল নামই শুনেছেন।

কানাডা সম্মেলনে যোগদানে এমন মিথ্যা অভিযোগে বাঁধা সৃষ্টির কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আজ থেকে এক হাজার বছর আগে বাংলা ভাষার জন্মদাতা চর্যাপদ কর্তাদের শরণাপন্ন হতে হবে। বাঙ্গালী জাতির আদিপুরুষ এই বৌদ্ধ ধর্মচার্যদের অন্যতম নামক চর্য্য কর্তা তাঁর একটি চর্য্যগীতিতে লিখেছেন,-

.....

আপন মাঁসে হরিণা বৈরী;

অর্থাৎ, অভাগা হরিণ আপন মাংসের কারণে-ই অন্যের শত্রুতার শিকার হয়। এই প্রজ্ঞাবংশ ও তার বহু কষ্ট সাধনায় অর্জিত পুণ্য প্রতিভার কারণেই বড়ুয়া-চাকমা সমাজের হীনমন্য ব্যক্তিদের লাঞ্ছনার শিকার হয়ে গেল। এই অপমান-অপদস্থতার পাষণ্ডভার লাঘবের উদ্দেশ্যে জিয়া বিমান বন্দর হতে সেদিন আর চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারে ফিরে আসেননি। তিনি, তাঁর এই কষ্টের দিনের এক পরম বন্ধু মারমা ভিক্ষু ভদন্ত উ শোভনা মহাথেরোর সাথে তার আবাসস্থল রামগড় শাক্যমুণি বিহারে চলে যান। সেখানে তিনি প্রায় ২০দিন মতো অবস্থান করে তার ঝাঞ্জা বিক্ষুব্ধ মনকে অন্যদিকে আকর্ষণের প্রচেষ্টায় আপন মনে লিখতে শুরু করলেন তাঁর আত্ম-চরিত কাহিনী। তবে, ১৯৭৭ সালে বাংলা সাহিত্যে বি,এ,(অনার্স) এর ফাইনাল পরীক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর থেকে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ তাঁর দিনলিপি লেখার যেই অভ্যাস গড়ে তোলেন, তার উদ্দেশ্য ও ছিল- এমন একটি নিরেট সত্য ভিত্তিক জীবন চরিত রচনা করা।

১৯৮২ সাল হতে ৮৫ সাল পর্যন্ত ভদন্ত মহোদয়ের শ্রীলঙ্কার শিক্ষা জীবনে তিনি প্রথমে 'জীবন'- নামে এই আত্মচরিত রচনায় প্রয়াসী হন। কিন্তু কয়েক পৃষ্ঠা মাত্র অগ্রসর হয়েই এই উদ্যোগ বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর ১৯৯৬ সালের শেষ ভাগে পার্বত্য চট্টগ্রামের কাচলং রিজার্ভ অরণ্য সারোয়াতলীতে অবস্থানকালে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশের মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ট হওয়ার ঘটনা থেকে শুরু করে সর্বজন পূজ্য বনভাস্কের সান্নিধ্যে গমন কাল পর্যন্ত তৎ লিখিত দিনপঞ্জী ভিত্তিক একটি প্রমাণ্য জীবন চরিত রচনা করেন। এতটুকু লিখতে গিয়ে ভদন্ত মহোদয় ৬টি ডায়েরী বই এর সমুদয় পৃষ্ঠা শেষ করেন। বর্তমান মুদ্রিত গ্রন্থ, সেই ৬খণ্ডের প্রথম-খণ্ড মাত্র। আশাকরি ক্রমান্বয়ে অপরাপর খণ্ড সমূহ ও প্রকাশিত হবে।

মাঝে মাঝে কতগুলো ঘটনা আমার জীবনে কাকতালীয় ভাবে ঘটে। যেমন, আমার জন্ম লগ্নটায় মা ছিলেন ভীষণ অসুস্থ। এমন কোন অভিভাবক ছিলেন না, যিনি আমার জন্ম মুহূর্তটা লিখে রাখবেন ভবিষ্যতে টিকুজী তৈরীর স্বার্থে। একান্ত অবহেলিত অবস্থাতেই যেন আমার জন্মটা হয়ে গেল। আমার প্রব্রজ্যার দিনটা ঠিক একই অবস্থা। রামু সীমা বিহারের অধ্যক্ষ মহোদয় হতে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আকাশে ঝির ঝির বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে গিয়ে উঠলাম। লামার পাড়া বিহারের অধ্যক্ষ ভদন্ত উ পাণ্ডবা মহাশয়ের আশ্রয়ে। নীরবে নিভৃতে ১৯৭১-এর আষাঢ়ী বিকেলে প্রব্রজ্যাটা হয়ে গেল, কোন আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই। উপসম্পদা গ্রহণের দিনেও ঠিক একই অবস্থা। আজ সন্ধ্যায় গুরুদেব জানালেন, কালকে সকালে তোমার উপসম্পদা হবে, সম্ভব হলে তোমার মা-বাবাকে খবর দাও। কদলপুর থেকে বহু কষ্টে জোবরায় পৌঁছে, পরদিন ভোরে মা-কে সাথে নিয়ে উপস্থিত হলাম ১৯৭৩ এর ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত কদলপুর পরিবাস ব্রতে। কেহ জানে, কেহ জানে না। বিনয়াচার্য ভদন্ত জিনবংশ ভাঙে, মহাপণ্ডিত ধর্মাধার ভাঙে প্রমুখ অনেকেই অসন্তোষ প্রকাশ করলেন, তাঁদের অজ্ঞাতে আমার এই উপসম্পদা গ্রহণে।

দেখা যায়, কোন উদ্যোগ নিতে গেলেই, অনাহত প্রবল বাঁধা-বিপত্তির শিকার হতে হয় আমাকে। শেষ পর্যন্ত একাই লড়তে হয় সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। সাফল্য আসে, তিষ্ঠ অভিজ্ঞতার বিনিময়ে।

সমাজ ও শাসন-সঙ্কর্ম কল্যাণ মূলক বহু স্বপ্ন বুকে নিয়েই আমার এক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। কিন্তু, কাঠামো দাঁড় করতে, না করতেই শুরু হয় স্বপ্ন ভঙ্গের পালা। ফলে, নীরবেই সরে পড়তে হয় আমাকে সেখান থেকে। এভাবেই, অদ্যাবধি আমি স্থির হতে পারলাম না কোন স্থানে, কোন খানে। এজন্যে অনেকেই আমাকে বলে থাকেন, এটা না-কি আমার জন্মান্তরীণ কর্ম বিপাক। কিন্তু, আমি বিশ্বাস করি যে, আমার সহযোগী যারা হয়, তাদের চেতনায় আমার ধ্যান জ্ঞান, আমার চিন্তা-চেতনা, আমার আদর্শ উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটাতে আমারই অক্ষমতা; অথবা যারা আসে আমার কাছে, তাদেরই অনুধাবন অক্ষমতা।

আমার শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম সাধক নন্দবংশ ভিক্ষু আমারই নির্দেশে সারোয়াতলী অরণ্যে অবস্থানকালে, আমার এই আত্মজীবনীর (১ম হতে ৬ষ্ঠ খণ্ড পর্যন্ত) পাণ্ডলিপি গুলো সুন্দর হস্তাক্ষরে বহু কষ্ট স্বীকার করে লিপিবদ্ধ করেছিল। স্নেহের মুদিতারত্ন ও শাসনজ্যোতি ভিক্ষুদ্বয় কম্পিউটার কম্পোজের ন্যায় দুরূহ কার্য সম্পাদন করে দিয়ে অত্র গ্রন্থ প্রকাশে অতি ত্বরান্বিত করেছে। আমি তাদের সর্বস্বীন দীর্ঘায়ু ও প্রাজ্ঞোজ্জ্বল জীবন কামনা করছি। সঙ্কর্ম শাসনের প্রতি দরদী হলদিয়া নিবাসী (শারজা প্রবাসী) প্রিয় উপাসক অনুত্তর বড়ুয়া ও তদীয় পত্নী মুন্নি বড়ুয়া তাদের প্রয়াত পিতা সিন্দুরাজ বড়ুয়া ও মাতা মল্লিকা রাণী বড়ুয়ার স্মরণে এই গ্রন্থ মুদ্রণে

সহায়তা করেছেন, তজ্জন্যে আমি তাদের পরিবারের সকল সদস্যের সর্বাঙ্গীন আশীর্বাদ ও মঙ্গল কামনা করছি।

আমার এই ‘আত্মচরিত’ রচনায় শৈশব, কৈশোর পর্বের বর্ণনায় একান্ত অকৃত্রিম ভাবে নিজেকে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করছি। যেদিন থেকে দিনলিপি, ডায়েরী লিখা শুরু করেছি, সেই থেকে বর্ণিত বিষয়গুলো দিন তারিখ নির্ভর নিরেট অনুভূতির উপর ভিত্তি করেই লিখা। এই অনুভূতি একান্তই ব্যক্তিগত। তাই, আমার বর্ণিত বিষয় নিয়ে পাঠক মহলে দ্বিমত অবশ্যই থাকতে পারে। অতএব, এ জাতীয় দ্বিমত সত্য এবং গ্রহণযোগ্য হলে তা মেনে নিতে আমি বাধ্য।

১৭ই জানুয়ারী, ২০০৮ইংরেজী
৪ঠা মাঘ, ১৪১৪বাংলা।

ইতি
প্রজ্ঞাবংশ ডিক্খু
মহাশাশান ভাবনা কেন্দ্র।

জীবনের বিবর্তন জন্ম কথা

শুনেছিলাম ভাদ্রের বর্ষন মুখর কোন এক মধ্যাহ্নে হাটহাজারী বাজার বারেই আমার জন্ম। নিকটবর্তী সেই হাট হাজারীর বাজার বারটা রবি কি বৃহস্পতি কারো সঠিক মনে নেই। সালটা ও বেমালাম উদাও। মাত্র দিন কয় ব্যবধানে প্রতিবেশী প্রশান্তের জন্ম তথ্য অনুসরণ আর জন্ম দাত্রী মা ও কাকী-মার বর্ণনা থেকে আমার জন্ম তারিখটা অনেক অংক করে নির্ধারিত হলে এভাবে, ১৯৫০ খৃস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর, রবিবার, ১৮ই ভাদ্র ১৩৫৬ বাংলা, কন্যা রাশি, রবি, ইউরেনাস ও বুধগ্রহ দ্বারা প্রভাবিত। এ নিরীখে আমার চরিত্র নির্ধারণ করা হয়েছে কিছুটা রক্ষণশীল, কিছুটা গতিবাদী। একারণে নিজস্ব পরিমণ্ডলে বিচরণে আশ্রয়ী। আমার জন্ম তথ্য সংরক্ষণে কেন এমন হলো বলুনতো? আমার আর আট ভাই বোনদের জন্ম তারিখটা ঠিকই ধরে রাখা হয়েছে। মায়ের সাত নম্বর সন্তান আমি। শুধু আমার বেলায় এই ব্যতিক্রম কেন?

মায়ের মুখে শুনেছি, আমার জন্মের কয়েক মাস আগে থেকেই মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি কেবলই স্বপ্ন দেখতেন আমার প্রয়াত ঠাকুরদা কে। বাবার ব্যবসায় মন্দার কারণে আর্থিক অবস্থা ভালো যাচ্ছিল না বেশ কিছু কাল ধরে। তবে আগের চেয়ে বেশী ধান ফলেছে এবারের চাষে। দিন মজুর দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না টাকার অভাবে। পাকা ধান প্রায় মাঠেই পড়ে আছে। সেই ভাদ্রের এক পড়ন্ত বেলায় আমার জন্মের সংবাদ বাবার নিকট নেওয়া হয়েছিল হাটহাজারী বাজারে। বাবা ছোট ব্যবসা খুলেছেন বাজারে। তাতেও সুবিধে নেই উপযুক্ত সহায়কের অভাবে। মায়ের বক্ষে দুধ ছিল না আমার জন্যে। মেঝদি, মেঝদা পালাক্রমে গ্রামের দুগ্ধবতী মাদের থেকে দুধ চেয়ে খাওয়াতেন আমাকে। তাঁদের মধ্যে নিজ বাড়ীর মীরার মা, পটুর মা, এবং প্রতিবেশী খুকির মা, পেয়ারসির মা, লক্ষণের মা, উষার মা, এদের দুধই নাকি বেশী আছে আমার দেহে।

শৈশবের খন্ড স্মৃতি

খুব শৈশবের কথাই বলি। বয়স আগার চার থেকে পাঁচ বছরের বেশী নয়। ধুলি খুসর নেটো, খেলা প্রিয়, সঙ্গী প্রিয় ছেলেটি তখন আমি। গায়ে জামা কাপড়তো নেই, কোমর বন্ধনী দিয়ে নেংটি পড়ানোর চেষ্টাই চলছে ক্রমাগত। কিন্তু এই দেয় তো এই নেই। মুহূর্তেই উদাও হয়ে যায় কোমর বন্ধনী; নেংটিই বা আর থাকে কোথায়। পরিচ্ছন্নতা? সে তো বলাই।

প্রিয় জনেরা আমার দৈহিক অবস্থা দেখে দুঃখ পেতেন, বিরক্ত হতেন। জ্যেষ্ঠরা হাসতেন খিল খিল করে। কৌতুক করে বলতেন— এই যে গাঁতের (গর্তের) ইদুর এলো বুঝি। বর্ষায় কাঁদা জল খেলি, শীতে-গ্রীষ্মে ধুলা-বালি এ-ই ছিল আমার

শৈশবের প্রাণ। মধ্যাহ্নের ঝাঁ ঝাঁ রোদ। ভোজনের আবেশে দিবা নিদ্রায় এলিয়ে দিয়েছে বাড়ী আর গাঁ গ্রামের প্রায় মানুষ। কেহ বা গাছ তলায়, কেহ বা ঘরের খোলা বারান্দায়। মৃদু- মন্দ দক্ষিণা বাতাসে গায়ে ও নাকের ডগার ঘাম আর মাছির বিরজিকর আনাগোনা নিয়ে ও বেঘোর ঘুমে অচেতন হয়ে যায় তারা। বাবা মা সাবধান করে বলে থাকেন এমন ভরদুপুরে ঝোঁপে-ঝাড়ে থাকে জিন-পরীর আনাগোনা, ঘরের বের হয়োনা; শুয়ে পরো। মনে জিন- পরীর ভয় ছিল। অবাধ্য হলে মা-বাবার মার খাওয়ার আতঙ্ক ও ছিল। কিন্তু সাথীদের নিয়ে জঙ্গল থেকে ঝড়ে পড়া আম, জাম, পেয়ালা (আমড়া), বেত্তাইন (বেতস ফল), আছাড়, জলপাই, তেঁতুল আরো কত নাম না জানা কাঁচা-পাকা ছোট ফল কুঁড়িয়ে খাওয়ার সেই প্রবল নেশায় সব ভয়-ভীতি উপেক্ষিত হতো সহজেই। পায়ের বন্ধান্ধুলে ভর দিয়ে চুপি সরে পরতাম বাবা-মার শয্যা পাশ থেকে। কত কাঁটা ফুটেছি, ভীমরুলের দংশন জ্বালা কত বার সয়েছি, সাপের মুখোমুখি হয়ে ও কতবার রক্ষা পেয়েছি তার অস্ত নেই। তবু ও কী আনন্দ, কী উচ্ছাসেই না মাতাল হয়ে পড়তাম তখন। সে স্মৃতি এই চুয়াল্লিশ বছরের মাথায় হীন স্বার্থের দ্বন্দ্ব ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়কে কেমন ব্যাকুল করে তুলছে আজো! বেদনা- বিদুর আবেগে চোখ ছিল ছিল করে ওঠছে। ফিরে যেতে প্রবল ইচ্ছে হচ্ছে সেই ফেলে আসা অনাবিল শৈশবে। যে বাড়ীতে আমার জন্ম, তা ছিল বেশ বড়ো। গ্রামের মাঝখান দিয়ে যে রেল লাইনটা, তা আমাদের বাড়ীকে গ্রাম থেকে এক প্রকার বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এতে শৈশব কৈশোরের সকল খেলাধুলা প্রায় নিজবাড়ীর সাথীদের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। বাড়ীর সামনে বড়ো পুকুরের পশ্চিম পাশ দিয়ে যাওয়া রেল লাইনটি ছিল ভীতি মিশ্রিত স্বপ্নময়। প্রতিদিন ট্রেনের যাতায়াতের প্রতি কৌতুহলী দৃষ্টিতে কেবল তাকিয়েই থাকতাম। ঘটনা ক্রমে রেললাইন পার হতে হলে বয়োজ্যেষ্ঠ কারো উপর নির্ভর না হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। শৈশবের ঠিক এমনি অবস্থায় রেল লাইন শ্রমিকদের কিছু কাজ-কর্ম আমাদেরকে ও দারুন ভাবে অনুপ্রানিত করতো মাঝে মাঝে। একদিন বড়পুকুরের পূর্ব-দক্ষিণ কোণায় আমাদের সেই নিত্য দিনের বহুস্মৃতি জড়িত বিশাল শিমূল গাছটির তলায় রেল শ্রমিকদের দৈনন্দিন কাজের অনুকরণে খেলছিলাম। সকলেই বাঁশের খুটির এক মাথাকে গেদির ন্যায় সরু করে নিয়ে রেল লাইনের চৌকাঠ গুলোর তলায় পাথরের জ্যাম দেয়ার অনুকরণে নিজের দু' পায়ের প্রসারিত ফাঁক দিয়ে মাটিতে খুঁটির মোটা মাথা স্থাপন করলাম। আর যেই মাত্র হে ইয়া- রে, হে ইয়া করে সজোরে উপরের দিকে হেঁচুকা টান দিলাম; আর যায় কোথায়? খুটির সরু ভাগ আমার কপালের চামড়ায় এক লম্বা চিড় ধরিয়ে রক্তের স্রোত বইয়ে দিল। মারলাম এক দৌড় বাড়ীর দিকে, কপাল চেপে কান্নার রোল ছুটিয়ে। সেই চিহ্ন এখনো কপালে আছে। মাঝে মাঝে খুব সাহস করে দুরু দুরু বুকে পৌছে যেতাম রেল লাইনের উপর, সঙ্গীদের সাথে নিয়ে, ঠিক ট্রেনের আগমনী শব্দ শুনে। লাইনের উপর বসিয়ে দিতাম পাথর বা

তারের টুকরো। নিরাপদ দূরত্বে থেকে লুকিয়ে উপভোগ করতাম গুড়িয়ে যাওয়া পাথরের পরিণতি অথবা চাকার চাপের পর চাপে ভীষন প্রসারিত হয়ে গোল তার চেপ্টা হয়ে যাওয়ার অবাক করা দৃশ্য। যখন আরো একটু বড়ো হয়েছি। বয়সের সাথে সাথে বুকের পাট্টা (সাহস) ও বেড়েছে। তখন কৈশোরের উন্মাদনায় এই রেল লাইনকে ঘিরে দু' একটি কু-কর্ম ও করতাম মাঝে মধ্যে। লাইনের পাথর ছুঁড়ে পাশের টেলিফোনের তার ঠুকানোর প্রতিযোগিতা আর তারের ঝিন ঝিন, শো- শো শব্দের আনন্দ উপভোগ। এ প্রতিযোগিতা উজাড় করে দিত লাইনের পাথর-খন্ড গুলো। আর ভরিয়ে তুলতে পাশের ফসলী জমিগুলো কৃষকের দুঃখ বাড়াতো। আবার ঐ পাথরই সন্ধ্যার আলো- আঁধাবিতে মাঝে মধ্যে আঘাত হানতো চলন্ত ট্রেনের যাত্রীদের গায়ে। আমরা হাসতাম হো হো করে। বাবার ব্যবসাটা ছিল গুটিকি মাছের। এ লাইনে বড়ো বড়ো আকারের ব্যবসা করতে গিয়ে আমার দাদা সমস্ত সম্পত্তি হারিয়ে ছিলেন লক্ষ্মী শাহী নামে স্থানীয় জমিদারের কাছে। পৈতৃক ব্যবসার নেশা ছাড়তে পারেননি আমার বাবা। রোজ সকালে স্থানীয় ক্রেতার সমাগম হতো আমাদের বাড়ীতেও। পিতার বেচা-কেনার এই দৃশ্যের অনুকরণ করতাম আমিও। বাড়ীর অন্যান্য সাথীদের নিয়ে দিন- দুপুরে দক্ষিণ পাশে বিরাট আম গাছের তলায় গিয়ে কচু গাছের প্রশস্ত পাতার উপর বুনোকচুর লতি ও নানা জাতের বৈচি সংগ্রহ করে মালের পসরা সাজিয়ে বসতাম দোকানদারীতে। চাল, ডাল, মরিচ, লবণ সবকিছুই থাকতো এ দোকানে। টাকা পয়সার বিনিময় মাধ্যম ছিল হাঁড়ি পাতিল ভাঙ্গা টুকরো। বেচা-কেনার ধূম পড়ে যেতো প্রচুর হাক- ডাকের মাধ্যমে। কখনো কখনো অনুষ্ঠান করতাম বিবাহ উৎসবের। কাটা কাপড়ের টুকরো সংগ্রহ করে তৈরী হতো বর-কনে। দেসলাইয়ের বস্ত্র দিয়ে তৈরী হতো পালাকী অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভাবে। ভাঙ্গা থালা, টিনের কৌটা, বেত পাতার বাঁশী এগুলোর মিশ্রিত শব্দে বেশ উপভোগ্য হতো বরযাত্রার বাজনা। ধুলোর ভাত, লতা- পাতার মাছ- মাংসের তরকারী রান্নার ধূম পড়ে যেতো বিবাহ উৎসবে। ভোজন পর্ব শেষ হতো প্রচুর আমোদ- উল্লাসে। অধিক রাত্রে অনুষ্ঠিত বিবাহের মন্ত্রপাঠের পূর্ব অভিজ্ঞতা যেহেতু আমাদের ছিলনা তাই শৈশবের এ বিবাহ উৎসবে সে পর্বের আয়োজন ও ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

বৌদ্ধ পরিবারে জন্ম এবং বৌদ্ধ পন্থীর অধিবাসী হলেও আমাদের বাড়ী ছিল মুসলিম পাড়া ঘেঁসে। ফলে বাড়ীর বাইরে শৈশবের খেলাধুলার স্মৃতি বলতে গেলে মুসলিম ছেলেদের সাথেই ছিল বেশী। তারা মুসলিম, আমরা বৌদ্ধ, এ বিজাতীয় ভাবের তীব্রতা বর্তমানে যে পরিমাণ বেড়েছে আমাদের শৈশবও কৈশোরে এমনটি কখনো দেখা যায়নি। বাবা- মাদের সাথে মুসলিম প্রতিবেশীদের যে রূপ গভীর আত্মীয়তার বন্ধন সে সময়ে লক্ষ্য করেছি শিক্ষা ও ধর্মচর্চার প্রসার উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বৃদ্ধির সাথে হৃদয়ের সেই উত্তাপ এখন আর নেই।

আমার ভাবতেও আবাক লাগে, দারুণ লজ্জাও জাগে কাকা জ্যেষ্ঠাদের সাথে আমার বাবা মায়ের সম্পর্কে শৈশব স্মৃতি চারণ করতে গেলে। প্রতিবেশি মুসলিমদের সাথে যে ভাবে গভীর আত্মীয়তার বন্ধন অনুভব করতাম তেমন হৃদয়তার ছোঁয়া কখনো বাড়ীর অন্যান্য জ্ঞাতীদের সাথে গড়ে উঠার সুযোগ পায়নি খুব বেশী। আমার বাবা-চাচাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সেই মিলন মধুর আলাপচারিতার পরিবেশ ও কখনো দেখিনি। জ্ঞাতীর স্বার্থ দ্বন্দ্ব কতই যে বিষাক্ত পরিবেশের জন্ম দিতে পারে তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমি। সামান্য কথা কাটাকাটি হলেই দেখতাম দীর্ঘ দিনের জন্যে পরস্পরের মধ্যে সব যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। এমন কি খোদ উঠোনের উপর আড়াআড়ি ঘেরা পর্যন্ত বসানো হয়ে গেছে। এমন হৃদয়হীন পরিবেশেই শৈশব ও কৈশোর অতিক্রম করতে হয়েছে আমাকে।

আপন ভাই-বোনদের নিয়ে শৈশবের তেমন কোন উজ্জ্বল স্মৃতি নেই বললেও চলে। বড়োদা অমূল্য কুমিল্লা নাকি কোন নিরুদ্দেশ বাস থেকে রিঙহস্তে পুনরাগমন, গ্রামের এক গরীব ঘরের ছোট ফুটফুটে কন্যার সাথে তার বিয়ে ও তৎপরবর্তী কিছু স্মৃতি আছে মনে। বৌদি বয়েস এতই কম ছিল যে তিনি বেশ কয়েক বার চুরি করে বাপের বাড়ী পালিয়ে যাওয়ার স্বাদ উপভোগ করেছিলেন। এক সময় দেখা গেলো বেকার দাদার সাথে মায়ের উত্তপ্ত বাক-বিনিময়ের পর দাদাও বৌদিকে পৃথক করে দেয়া হলো বাবা-মায়ের সংসার হতে।

আমার মেঝদা ভূপতি (শুতা) যিনি ছিলেন আমার জীবন গঠণে সহায়ক। সেই মেঝদা দাদার কিছু স্মৃতি মনে আছে। গ্রীষ্মের এক উত্তপ্ত অপরাহ্নে বাবা বাজারের দোকানে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিয়েছেন। ঠিক এই মুহূর্তে- কে জানি সংবাদ দিতে এলো মেঝদাকে গ্রামের মোড়ল বাড়ীতে বেঁধে রেখে ভীষণ ভাবে মারধোর করে ফেলে রেখেছে চৈত্রের ঝাঁ ঝাঁ রোদের মাঝে। এ সংবাদে আমার মা পাগলের মতো দৌড়ে গেলেন সেখানে। ইতিমধ্যেই গ্রামের চৌকিদার বাবাকে ডাকতে এলেন স্থানীয় চা-এর দোকানে আয়োজিত সালিশী বৈঠকে। বাবা গেলেন সেখানে। কোন রূপ প্রমাণ ছাড়া এক তরফা বিচারে বাবার উপর জরিমানা দণ্ড সাব্যস্ত হলো। কারণ, ১২/১৩ বছরের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র আমার মেঝদাকে মোড়লের বাড়ীর ঘড়ি চুরি এবং তাদের যুবতী কন্যাকে প্রেম পত্র লেখা ইত্যাদি দোষে নাকি দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ না দেয়াতে বাবা ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের এই রায় মানতে অস্বীকার করলেন। ফলে গ্রাম্য মোড়লেরা মেঝদাকে চৌকিদার দিয়ে থানা হাজতে সোপর্দ করলো। সেই থেকে এই গ্রাম্য মোড়লদের সাথে বাবার মামলা মোকদ্দমা চললো দীর্ঘ চার বছর ধরে। বিভিন্ন অজুহাতে সৃষ্ট মোট বারোটি মোকদ্দমার প্রত্যেকটিতে আমার বাবার জয় লাভ হলো। কিন্তু আমার সেই ক্ষুদ্র বোধশক্তিতে ও মা-বাবার সেই চার বছরের যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতিগুলো এখনো দক্ করছে। সারাদিনে কঠোর শ্রম, রাতে মামলার প্রয়োজনীয় সাক্ষী সাবুদ সংগ্রহ,

তাদের অনু ও পারিশ্রমিক, একটির পর একটি মামলার খরচ যোগানো- উঃ কী উৎকর্ষ ! কী যজ্ঞা ! না বললেই নয় আমার মেঝদাকে ঘিরে এ ঘটনাটি ছিল সম্পূর্ণ পরিকল্পিত ও ষড়যন্ত্রমূলক। আমাদের গ্রামের সেকালের নোংরা মোড়লীয় আধিপত্য বাদের অনেক যজ্ঞণার মধ্যে এটি ও একটি। গ্রামের এই মোড়লেরা কখনো বরদাস্ত করতে পারতেন না তাদের ছেলে- মেয়ে ছাড়া অন্য কারো ছেলে মেয়ে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত হউক। তারা ছাড়া অন্য কারো জমি- জমা বা আর্থিক সমৃদ্ধি আসুক এও ছিল তাদের অসহ্য। ছলে, বলে, কৌশলে অন্যের সম্পদ আত্মসাত করা, মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দিয়ে অন্যের আর্থিক সমৃদ্ধিকে নস্যাত্ করা, তাদের সন্তানদের চেয়ে বেশী শিক্ষিত হলে কুৎসা রটিয়ে গ্রাম থেকে বহিষ্কার করা- এসবই ছিল তাদের মোড়লগিরির কর্তব্য। বাবার প্রয়াত কাকা মুনিন্দ্র প্রিয়ের বিধবা স্ত্রীকে এক মোড়ল পুনঃ বিয়ে করার মোহময় টোপ দিয়ে চেয়েছিল সমস্ত সম্পত্তি হতে প্রথমা স্ত্রীর কণ্যাদেরকে বঞ্চিত করতে। আমার বাবার একক প্রতিবাদে তাদের ষড়যন্ত্র ভণ্ডুল হলো। তার প্রতিশোধ হিসেবে বাবাকে ঘায়েল করতে মেঝদাকে শারিরীক ভাবে পঙ্কু করে এমন মিথ্যা মামলায় জড়ানো হলো।

আমার বড়ো দিদি পরিমলা নাকি ফুটফুটে পরীর মতোই দেখতে। আমার জন্মের বহু আগেই প্রাণান্ত কলেরায় আক্রান্ত হয়ে জীবনের পরপারে চলে গেছেন। মায়ের মতোই সুন্দরী এই বোনটি। আর মেঝদি লেদু, যিনি আমাকে কোলে করে সারা গ্রাম ঘুরে দুগ্ধবতী মাদের দুধপান করাতেন, সেই মেঝদির বিয়ে হয়ে গেলো আমার বুদ্ধি উন্মেষের আগেই। সে শৈশব স্মৃতির কিছুই আমার মাঝে নেই। ছোটদা অজিত ১২/১৩ বছর থেকেই মৃগী রোগ গ্রস্থ হয়ে মা-বাবাকে বহু ভোগান্তির শিকার করে ১৬ বছর বয়সে জলে ডুবে মারা গেলেন। তখন আমার বয়স নয় কি দশ হবে। স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ছি। এই ছোটদা যেদিন মারা যাবেন তার মাত্র দিন ২/৩ আগে আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে- দিয়েছিলাম। আমার সযত্নে বর্দ্ধিত এক শসার লতা ছিড়ে দেওয়ার অপরাধে রাগের মাথায় যে কাজটি সেদিন করে বসেছিলাম, দাদা মারা গেলে সেই স্মৃতি আমাকে অনেক চোখের জল ঝরিয়েছে। আজো কাটার মতো বিদ্ধ করে আমাকে সেই স্মৃতি। বাবাকে অনেক বার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ক্ষেদোক্তি করতে শুনেছি- ছোটদা নাকি মেধায়, শারিরীক শক্তিতে ও খেলাধুলায় বিদ্যালয়ে সবসময় অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিতেন। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হতে না হতেই যে কাল ব্যাধি তাকে গ্রাস করলো। বহু অর্থব্যয় করেও মা- বাবা তাঁদের সেরা সন্তানটিকে শেষ রক্ষা করতে পারলেন না।

ছোটদি কমলার অনেক স্মৃতি আমার জীবনে গাঁথা। বাবা মার ঘরে আমি ছিলাম তার পরবর্তী সন্তান। উভয়ের মধ্যে অন্তরের টান যেমন গভীর ছিল, আবার মন ভাঙ্গা-ভাঙ্গিও হতো ঘন ঘন। এই দিদি রূপে লাভণ্যে ছিলেন সাক্ষ্যাত প্রতিমা; কিন্তু বিদ্যায় ছিলেন শূণ্য। অনেক চেষ্টা যত্ন হয়েছিল লেখাপড়া শেখানোর জন্যে। কিন্তু সব

চেষ্টাই হলো ব্যর্থ। সংসার জীবনে সুখের মুখ দেখালো কই? তাকে বিয়ে দেয়ার পর যতবারই শ্বশুর বাড়ী থেকে আনতে গেছি, চোখের জলে রিঙ হাতে ফিরতে হয়েছে আমাকে।

আমার পরবর্তী ছিল বোন কণিকা। সেই ছোট বোন শৈশবে ছিল খুবই অসুস্থ। ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেলো। লেখা পড়ায় মন্দ ছিলনা সে। অধ্যয়নে আগ্রহ ছিল খুব। কিন্তু, সংসারের ঘানি টানতে টানতে বাবা মা দু' জনেই তখন ম্রিয়মান। বড়দা পৃথক। মেঝদা দীর্ঘকাল ত্রিপুরায় অজ্ঞাত বাসে। ইতিমধ্যে মারাত্মক ধরনের লুট ডাকাতির শিকার হয়ে বাবা- মার আর্থিক মেরুদণ্ড হয়ে গেল চুরমার। উন্মাদ প্রায় বাবা, বার কয়েক আত্মহত্যার মুখামুখি হতে রক্ষা পেলেন আমার ও মেঝদির স্বামীর দৌলতে। মা অশ্রু বিসর্জন করতে করতে অন্ধ প্রায় হয়ে গেলেন। আমি তখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। এমন পারিবারিক দুর্যোগে আমার অধ্যয়ন টিকে থাকলেও ছোট বোন এর লেখাপড়া ওয় শ্রেণী হতে আর অগ্রসর হতে পারলো না। ধনা (অশোক) নামে, সবার ছোট ভাইয়ের হাতে খড়িও তখন হয়নি। এই ছোট বোনের যথা সময়ে বিয়ে হলো। স্বামীর ঘরে বেশ সুখেই ছিল প্রথম কয়টি বছর। কিন্তু বিধি বাম। হঠাৎ একদিন সংবাদ এলো তার স্বামীকে ব্রহ্মাছড়ির পাহাড়ের খামার বাড়ীতে হত্যা করা হয়েছে। এক সন্তান বিটন তখন কোলে, আর এক সন্তান মিলকে গর্ভে ধারণ করে বোনটি বৈধব্যের অভিশাপ বরণ করলো। বোনটি অচিরেই সহায় সম্বলহীনা নিঃশ্ব হয়ে পড়লো দেবর ও শ্বশুর শ্বাস্তরী অবহেলায়। মা যতদিন বেঁচে ছিলেন ততোদিন বোনটি মায়ের অভয় কোলে আশ্রয় পেয়েছিল। আর এখন আশ্রয় আমার মতো এক ভবঘুরে সন্ন্যাসী ভাইয়ের।

মা- বাবার ঘরে সবার ছোট ভাই অশোক (ধনা) একটু বড়ো হতে হতে তখন আমার যৌবন। সবার ছোট বলে আদর যত্ন, স্নেহ মমতার ভাগ মোটামুটি মন্দ পায়নি সে। মেঝদার সহায়তায় যখন সে বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শেষ করলো তখন আমি ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করে রাউজানের গহিরা শান্তিময় বিহারের দায়িত্বে নিয়োজিত। ছোট বোনের বিয়ে দিয়ে বাবাও ইচ্ছে করেছিলেন সংসার ত্যাগ করার। এমতাবস্থায় ছোট ভাইকে আমার সান্নিধ্যে রেখেই তার অধ্যয়নের ব্যবস্থা করলাম। কিন্তু সপ্তম শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালেই সে আমার সান্নিধ্য ত্যাগ করলো। তার লেখাপড়া এখানেই শেষ। পরবর্তীতে আমার চেষ্টায় হাতের কাজ শিখে সেই বিদ্যার জোরে সংসারী হলো।

হ্যাঁ অনেক দূরেই সরে গেলাম আমার শৈশবের স্মৃতি চারণ হতে, ভাই- বোনদের প্রসঙ্গ টেনে। প্রিয় পাঠক চলুন আবার ফিরে যাই আমার ব্যক্তি জীবনের আর কয়টি মাত্র শৈশব স্মৃতি চারণে। আমার পিতারা জগৎবন্ধু, দীণবন্ধু, কিণবন্ধু, বিন্দুলাল, শীলানন্দ ও যতীন্দ্র এই ছয় ভাইয়ের চার ভাই ছিলেন রেঙ্গুনে। রূপ লাভণ্যে রাজলক্ষ্মী নাম সার্থক হলে ও মা ছিলেন আমার জনম দুঃখী। শৈশবে হারিয়েছিলেন

গর্ভধারিনীকে। অল্প বয়সেই বিবাহ হলো আমার বাবার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগৎবন্ধুর সাথে। সংসারে দু'টি সন্তান রেখে এই প্রথম স্বামী চলে গেলেন লোকান্তরে; রেঙ্গুনের প্রবাস জীবনে। সে প্রবাসের অন্তিম শয্যা তর শয্যা পাশে দন্ডায়মান চতুর্থ ছোট ভাই যতীন্দ্র, তথা আমার জনকের হাতে তুলে দিয়ে চলে গেলেন অঙ্গুণ স্ত্রী আর সন্তানদেরকে। অনুজকে প্রতিজ্ঞা পাশে আবদ্ধ করিয়ে নিশ্চিন্তে পরপারে গেলেন পিতৃব্য। আমার পিতা দেশে ফিরে অশ্রুজের প্রতিজ্ঞা পালনে অনাগতের বিপত্তিকে তিরোহিত করতে সামাজিক প্রণয় পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলেন আমার জননীকে। এই দ্বিতীয় পাণিগ্রহণের পরপরই মা হারালেন তাঁর জন্ম দাতা পিতা এবং সাক্ষ্যাত পিতার হৃদয় তুল্য শ্বশুর মৃত্যুঞ্জয়কে। চারিদিকেই কেবল ভাঙ্গনের শব্দ। বিপর্যয়ের কালো মেঘ যেন ছেয়ে ছেয়ে ফেললো আমার জননীর ভাগ্যের আকাশ। মাত্র বছর কয়েকের ব্যবধানে হারাতে হলো আদুরে জ্যেষ্ঠ কণ্যা পরীকে। এর পর পরেই এলো তেয়াল্লিশ এর মহাদুর্ভিক্ষ। ঘরে তিন চার জন সন্তান। স্বামীর একক রোজগারে সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব। নারী পরাধীন দেশে রূপ লাভণ্যে ভরা এমন গৃহবধুর পক্ষে জীবন জীবিকার জন্যে তখন ঘরের বের হওয়া ছিল এক প্রকার অসম্ভব কল্পনা। অসাধারণ মনোবলের অধিকারীণী মা তাঁর সন্তানদের বাঁচানোর তাগিদে ভিক্ষাবৃত্তি জাতীয় লজ্জা বহনের চেয়ে সেদিন সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। আপন মান- ইচ্ছাকৃত সম্ভ্রমকে ধর্মের উপর ছেড়ে দিয়ে তিনি স্বামীর ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে সরাসরি যুক্ত হলেন। তার অনেক বছর পরেও মাকে নিত্য দিন দেখেছি সে কাক-ডাকা ভোরে ঘুম থেকে উঠে উঠানে ঝাট, গোয়ালের গরু ও খোয়াড়ের মুরগির পরিচর্যা, রান্না বান্নার হাড়ি পাতিল বাসন-কোসান ধুয়ে উনুনে প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন, সব এক হাতে সমাধা করে চলেছেন ঘড়ির কাটার মতো। সবাইকে প্রাতঃরাশ খাইয়ে দিয়ে, মাথায় শুকটি মাছ ফেরির পসরা নিয়ে আমার দুগ্ধিনি মা চলে যেতেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। আমি কি কোন দিন ক্রন্দন করে মায়ের যাত্রার বাঁধা দিয়েছি? কৈ মনেতো হয়না। মনে হয় মাতৃ গর্ভেই থাকতে আমি অভ্যস্ত হয়ে পড়ে ছিলাম মায়ের এই দীর্ঘ আচরিত সংস্কারের। মা থাকতেন না ঘরে। বাবা ও থাকতেন হয় শহরে, নয় বাজারে। ফলে সেই শিশু আমাকে লালনের সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব পড়তো আমার মেঝদি লেদুর উপরেই। এমনও শুনেছি মেঝদির বিয়ে হয়ে গেলে অবর্তমানে কোমরে পাটের সুতোলা দিয়ে, মা না আসা পর্যন্ত বারান্দার খুঁটিতে আমাকে বেঁধে রাখা হতো মেঝদা ভূপতি আর ছোটদি কমলার অবোধ দায়িত্বে। পড়ন্ত বিকেলে, কখনো বা তার ও কিছু আগে ফিরে আসতেন মা খুব ভারি ধান চালের বোঝা মাথায় করে। যেতে ও বোঝা, আসতে ও বোঝা; সংসারের এত বোঝা টেনে ও মাকে দেখিনি কখনো বিরক্তি অপ্রসন্ন মুখে। ঘরে নিজ কন্যারা বড়ো হলো বিয়ে হলো; একে একে তিন- তিনটা পুত্রবধু ঘরে এলো; কিন্তু মায়ের এই দুগ্ধিনি দৃশ্যের যেন কোন পট পরিবর্তন হয়নি আমৃত্যু। একেই বলে কি রাজলক্ষ্মী?

শৈশবে, এমনকি কৈশোরে মায়ের আদরের স্মৃতি কখনো সকালের উজ্জ্বল্যে ধরা দেয়নি আমার হৃদয়ে। পড়ন্ত বিকেলের মাতৃমূর্তি জুড়ে আছে সারাটা হৃদয়। ঘর্মাক্ত শ্রান্ত দেহের অবসাদ পুকুরের শীতল জলে ফেলে দিয়ে বিলম্বিত মধ্যাহ্ন ভোজ চটপট সেরে নিতেন, মাতার মুখে তামাকের চেয়ে পান তামুলটা যেন লেগেই থাকতো সারাক্ষণ। সেই পড়ন্ত বিকেলে মায়ের বক্ষে মুখ গুজে দিয়ে স্তন্য পান করার আনন্দ মনে নেই, কিন্তু মায়ের মুখ হতে চর্বিত পানের গুড়ো কত আল্লাদে আপন মুখে পুরে দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়েছি- সেই আনন্দ এখনো কত সহজেই না অনুভব করতে পারি।

গুরুতাই বলেছি সারাদিন আমার অঙ্গে লেপটে থাকতো ধুলো- বালি। মায়ের গর্ভে থাকা কালে মা খুব ঘন ঘন স্বপ্ন দেখতেন আমার ঠাকুরদা কে। তিনি আগুনের তাপ লাগাচ্ছেন। সে কারণেই বুঝি আমার গায়ের রংটা হলো তামাটে শ্যাম বর্ণের। সেই দেহের উপর ধুলো- বালির আস্তরণ নিশ্চই মনোহরি ছিলনা কখনো। কেমন করে এই ধুলো- বালি অঙ্গে মাখার সুযোগ পেতাম? পাঠক! নিশ্চয় বুঝতে কষ্ট হবে না। সম্ভান কে সারাক্ষণ চোখে চোখে অথবা বুকে ধরে রাখার মতো অভাগী মায়ের সে সময় কৈ? শৈশবে খস- পাচড়া ও পেটের পীড়ার জ্বালাতন তাই প্রায় থাকতো আমার শরীরে। মনে আছে, একবার রক্ত আমশায়ে ধরে ছিল আমাকে। উঃ কী অসহ্য তার শূল-যন্ত্রণা! দিনের পর দিন কোথ দিতে দিতে এক সময় মল দ্বারটাই সোজা বেরিয়ে গেলো। ডাক্তার বলেছিলেন বড়ো হলো, শরীরে শক্তি বাড়লে, ওটা ঠিক হয়ে যাবে। এক দুই করে জীবনের যৌবন প্রায় অতিক্রম করে দিলাম। কই এখনো তো সেই অভিশাপ মুক্তি ঘটলো না। বস্তুতঃ লাভী শ্রেষ্ঠ সীবলী স্থবিরের মতো জন্মলগ্নের দুর্বল পুণ্য প্রতিভা আমাকে চিররুগ্নত্বের শিকার করলো। কিন্তু, আমার বর্তমান শারিরীক অবস্থায় অনেকেই সম্ভাষ প্রকাশ করেন। এই বিয়াল্লিশ বছরের মাথায় সেদিন চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারে আমার সাক্ষ্যাতে এলেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির চেয়ারম্যান.... সাহেব। আমাকে দেখে সেই প্রবীন শিক্ষাবিদ প্রথমই বলে ফেললেন এত অল্প বয়সে আপনি এমন একটি বিহারের উপ-বিহারাদ্যক্ষ হয়ে গেলেন! শুধু তাই কি! বাংলাদেশ সংরাজ ভিক্ষু মহাসভার মতো একটি অর্ধশতাব্দী প্রাচীন সংগঠনের আমিই হলাম এযাবত কালে কনিষ্ঠতম মহাসচিব। আমার উপরে এমন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে বলে বছর তিনেক আগে থাই- সংঘ কাউন্সিলের ব্যাংক্ক এর গভর্ণর এবং ওয়াট মহাঠাৎ এর অধ্যক্ষ মহোদয় সম্ভাষ প্রকাশ করে বলেছিলেন এমন তরুণের হাতে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে বাংলাদেশের সংঘ খুবই বিজ্ঞোচিত কাজ করেছেন। আপনার দ্বারা সংঘের দীর্ঘকাল কল্যাণ সাধনের পথ সুগম হলো। W F B এর কোরিয়া সম্মেলনে এক থাই ভাবনাচার্য আলাপ প্রসঙ্গে হটকরে আমার হাত তুলে নিলেন। হস্তরেখা দর্শন করে বলে উঠলেন- আপনি নিশ্চয় বাংলাদেশের সংঘরাজ হবেন। প্রাজ্ঞ- গুণীদের সে উক্তি আমাকে বড়ো হওয়ার

প্রেরণা যোগায়। কিন্তু, সারা বছর আমার থেকে উপোসখ শীল, পঞ্চশীল নিয়ে ও কোন উপাসিকা বা উপাসক যদি হঠাৎ করে বলে বসেন-শ্রমণ আমাকে একটি বুদ্ধ পূজার থালা দিনতো। তখন কেমন লাগে? তবুও মনের হাসি গোপন করে নীরবেই তাদের অনুরোধ রক্ষা করি। আমি বলবো, গৈরিক জীবনের পূণ্যময় প্রভাব ছাড়া এ-আর অন্য কিছু নহে।

আমার মায়ের ফেরী জীবনের দু'টি ঘটনার বর্ণনা খুব শৈশবেই আমার মনে দাগ কেটেছিল। এক সময় নাকি তিনি ফেরি করতে করতে আমাদের বাড়ী থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরবর্তী এক হিন্দু গ্রামে গিয়ে পৌঁছিলেন। তখন ভরা দুপুর। ক্লাস্ত-শান্ত হয়ে এক বাড়ীর পুকুর পাড়ের গাছের ছায়ায় মাথার বোঝা নামিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন তিনি। ঠিক এমনি সময়ে এক বয়স্ক মহিলা ঘাটে আসলেন মায়ের খুব কাছাকাছিতে। মহিলার অবয়বটা ছিল নিখাত আমার প্রয়াত দিদিমার মতো। বহুদিন, বহুকাল পর মাতৃহারা এই কণ্যার হৃদয়ে হঠাৎ করে মাতৃ তৃষ্ণা এতো প্রবল হয়ে উঠলো যে, তিনি আর আত্ম সংবরণ করতে পারলেন না। ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। মহিলাটি ও এতক্ষণ ধরে ময়ের প্রতি কেন জানি বার বার কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলছিলেন। এবারে মায়ের ক্রন্দন দেখে ধীরে ধীরে কাছে আসলেন। কেন মা কাঁদছ? শোকাবেগে মা জড়িয়ে ধরলেন মহিলাটিকে। মহিলার বক্ষে মাথা রেখে বেশ কিছুক্ষণ অশ্রু বিসর্জনের পর মহিলাকে বললেন তুমি কি আমার হারিয়ে যাওয়া সেই মা? সেই যে শৈশবে, তুমি আমায় ফেলে দূরে চলে গেলে, কই একটি বারও তো তোমার একমাত্র আদুরে কন্যাটিকে স্মরণ করোনি, জীবনের কত উত্থান পতন, কত ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত হচ্ছে আমার এই দুর্ভাগা জীবনটি। নিষ্ঠুর মা তুমি, কেমন করে আঁড়ালে নিশ্চুপ রইলে এতোদিন? মহিলা বুঝতে পারলেন না কি হতে কি হয়েছে। বললেন, মা একটু পরিষ্কার করে বলো ব্যাপারটা কি। তোমাকে দেখা অবদি, আমার মনটা ও জানি কেমন কেমন করছে। এমন প্রতিমা সদৃশা মেয়ে কেন এ বয়সে এভাবে পথে বেরিয়েছ? মা বলো দেখি তোমার কান্নার কারণটা কি? মা সব খুলে বলতে বলতে এক সময় আবার জড়িয়ে ধরে বললেন- মা যতদিন তুমি বেঁচে থাক ততদিন আমাকে তোমার কণ্যা হিসেবেই স্মরণ করবে তো?

এই সেই আমার হারানো দিদিমা। শৈশবে, কৈশোরে কতবার গেছি বেড়াতে সেই মামার বাড়ীতে। বসন্তঃ কোন উৎসব পার্বণই বাদ যেতো না আমার সেই দিদিমার স্নেহাশীষ ছাড়া। শৈশবে, কৈশোরে সত্যিকার মামার বাড়ীতে যাওয়ার তেমন সৌভাগ্যই তো এই পোড়া কপালে জুটেনি। দুর্ভাগাদের অতৃপ্ত বাসনা এমনি করেই কি মেটাতে হয়?

আরেক সময়ের কথা বলি। মা যাচ্ছিলেন ফেরি মাথায় মুসলিম পাড়ার এক চায়ের দোকানের সম্মুখে দিয়ে। তখন সকাল বেলা। সে পাড়ার এক প্রভাবশালী লম্পট

চায়ের দোকান থেকে কুমতলবের বশে মাকে পেছন থেকে অনুসরণ করলো। কিছু দূর গিয়ে মায়ের কাছ থেকে শুটকি মাছ নেবে এই ছলনায় মাকে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল। পাড়ার এ লোকটি সম্পর্কে মায়ের কোন ধারণাই ছিলনা। সম্ভ্রান্ত লোক ভেবে মা নিঃসন্দেহেই ঢুকলেন তার বাড়ীতে। কিন্তু দেখা গেল মাছ কেনা নয় সে তার নির্জন ঘরে মায়ের সম্ভ্রম হানিতেই উদ্যত। কিংকর্তব্য বিমূঢ় মা। উপায় না দেখে তার পায়ে পড়ে করুণ আর্তনাদ করে বলে উঠলেন- আমার মা-বাপ কেউ বেঁচে নেই। পেটের তাগিদে, পুত্র সম্ভ্রানের জীবন রক্ষার্থে এমন অসময়ে পথে বের হতে বাধ্য হয়েছি। তুমি আমার ধর্মের বাপ। তোমাকেই আমার মান- ইচ্ছিত রক্ষার ভার দিলাম। ধর্মের দোহাই তুমি আমাকে বাঁচাও। জানিনা মায়ের এই করুণ আর্তনাদ সেই দিন কেমন করে এই পাষন্ড হৃদয়কে নাড়া দিয়েছিল। সত্যই, সে আমার মাকে সত্যিকার আপন কন্যা হিসেবেই হৃদয়ে স্থান দিয়েছিল সেদিন। আমার মাকে মেয়ে এবং বাবাকে জামাতা হিসেবে কতবারই নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেছে তাদের বাড়ীতে ইয়ত্তা নেই। এই একটি মাত্র ব্যক্তির প্রভাবে আমার মা এবং আমাদের গোটা পরিবার বহু আপদ বিপদ হতে রক্ষা পেয়েছিল। যেদিন আমার মাকে পথে দেখা পায়নি, পরের দিন নির্ঘাত আমাদের বাড়ীতে এসে সবার খোঁজ খবর নিয়েছেন; চলৎ শক্তি রহিত না হওয়া পর্যন্ত। সত্যি কত বিচিত্রই না মানুষের মন ও জীবন।

এই বিচিত্র সংসারে সংসারি হয়েছিলেন আমার জনক, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতিজ্ঞা পূরণে, না আপন খেয়ালে, সে প্রশ্ন এখন থাক। শৈশব থেকেই দেখে আসছি আমাদের পারিবারিক নীতি নিয়মটাই ছিল আর দশ পরিবার থেকে যেন একটু ভিন্ন ধাঁচের। বাবার শয়ন কক্ষের এক পাশে কাপবোর্ডের মতো এক সুসজ্জিত বাস্ত্র। তাতে সুন্দর করে সাজানো থাকতো দু'টি বুদ্ধের ফটো; একটি তিব্বতী, অপরটি বার্মার মহামুনির। বুদ্ধের ফটোর উভয় পাশে ছোট দু'টি ফটো। তাদের একটি লক্ষ্মীর অপরটি স্বরস্বতীর। বাবা যত রাত করেই বাজার থেকে বাড়ীতে আসুন না কেন, রাত্রি ভোজের আগে এবং মধ্যাহ্ন ভোজের আগে ঐ সজ্জিত আসনের সামনে ধূপধুনো, ফুল, বাতি দিয়ে, করতাল (জুরি) বাজিয়ে স্বরচিত কীর্তন সহকারে পূজা- অর্ঘ্য নিবেদন ব্রতটুকু ছিল একেবারে অনিবার্য। বাবার ধূপ জ্বালানোর প্রক্রিয়াটা ও ছিল বেশ আকর্ষণীয়। ধুনিতে জ্বলন্ত কাঠ- কয়লা, ধূপের আগুন অথবা জলন্ত নারিকেল ছোবরা বসিয়ে দিয়ে তাতে প্রচুর ধূপের গুড়ো ছিটিয়ে দেয়া হতো। ফলে ধূম উদ্দীর্ণ হতো বেপরোয়া। ধূপদানি হাতে প্রথমে আসতেন তিনি ঘরের দরজায়। চৌকাঠে ধূপদানি স্থাপন করার পর দিতেন তিনটে বড়ো করে করতালি। তারপর গৃহদেবতার উদ্দেশ্যে করজোড় ঠেকাতেন কপালে। কাজটি সেরে সারা ঘরময় ঘুরে ঘুরে ঐ ধূপদানি ঠেকাতেন সিঁকুকে, চালের মেটিয়ায় (ভাঁড়ে), ধানের গোলায় এমনকি শুটকি মাছের ষ্টকে পর্যন্ত। তার পরেই ধূপদানিকে স্থাপন করা হতো সেই সজ্জিত আসনে। অতঃপর শুরু হতো কমপক্ষে আধঘন্টা ধরে করতাল বাজিয়ে

ভক্তিগীতির আসর “ভৌমনত গৌতম, এই অতি উত্তম, উত্তম তম ভৌমনতম.....”। শুধু বাবা কেন, আমার অপুত্রক জ্যেষ্ঠমনি কিনবন্ধুকে ও দেখতাম সকালে ও সন্ধ্যায় সুরকরে মহাভারত আর রামায়ণ পাঠের ব্রত উদ্যাপন করতে। শুনেছিলাম এর আগে তিনি হারমোনিয়াম সহযোগেই এই পুঁথিপাঠ ব্রত চালাতেন। সেই নষ্ট হয়ে যাওয়া হারমোনিয়ামটি আমি নিজেও দেখেছি।

আমাদের সারা বাড়ীতে তৎকালে কতগুলো বিশেষ মাস্তলিক লোকাচার অনুষ্ঠিত হতে দেখতাম। যেমন প্রতিদিন সাত- সকালে ঘরের দরজার চৌকাঠের সামনে-ও পেছনে সদ্য গোবর- জল ছিটিয়ে লেপন করে দেয়া, সারা ঘরে স্বর্ণ রৌপ্য ডোবানো জল ছিটিয়ে ঘরকে পরিশুদ্ধ করা, ঘরের দরজায় শনি- মঙ্গল বারের খালি বোতলে জল ভর্তি করে পত্র পল্লবের ঘট তোলা, সন্ধ্যায় বাড়ীর প্রত্যেক দরজায় পিলসুজ অথবা যে কোন প্রদীপ জালিয়ে দেয়া। ইত্যাকার সব মাস্তলিক ক্রিয়া কর্মের অনুষ্ঠান হতো ধর্মজ্ঞানে ও পবিত্রতা জ্ঞানে ঘর ও গৃহস্থের মঙ্গল এবং আয় উন্নতি কামনায়।

আমার বাবা দু’জন সন্ন্যাসী গোছের নামকরা হিন্দু ডাক্তারের পরম অনুরাগী ছিলেন। তারা ছিলেন গাঁজা নামক সিদ্ধি সেবী। অতএব, শিষ্য হিসেবে আমার বাবাও ছিলেন সেই সিদ্ধির উপাসক। ছোট বেলায় বাবার সাথে বহুবার তাদের আখড়ায় যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে। সিদ্ধি সেবী আখড়ার সভ্যদের মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের ডাক্তার, ব্যবসায়ী, বাস ড্রাইভার, এমকি রিক্সাচালক, কুলি, ফকির পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যারা সঙ্কম তারা প্রত্যেকেই সামর্থ্য মতো সিদ্ধির পুটলী নিয়ে হাজির হতেন, সিদ্ধি সেবনে। কিন্তু প্রত্যেকেরই ছিল সম অধিকার। সেবনের পর নেশায় বুদ্ধ হয়ে সকলেই এক যোগে খোল- করতাল নিয়ে নানা আধ্যাত্মিক ভাবমূলক গানের আসর জমাতে। আমার বাবা প্রতি বাজার বারে দোকান বন্ধ করে সেই আসরে যোগ দিতেন। আর গভীর রাতে বাড়ীতে এসে মাকে মাঝে মধ্যে বকাবকি করতেন, খুবই জ্বালাতন করতেন। কিন্তু ঘরের বাইরে কারো সাথে কোন অন্যায় বা উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, জীবনে কোন দিন তিনি করেননি। বাবার গভীর রাতে ফেরার পথে এক ঘটনার কথা বলি। সেদিন পিট পিট করে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ তো মেঘে ঢাকা, তদুপরি কৃষ্ণপঙ্কের রাত্রি। বুঝতেই পারছেন কেমন ঘন ঘোর অন্ধকার। পশ্চিমধ্যে এক বিরাট বটগাছ ছিল, নাম এগারো মাইলের মাথা। নেশায় বুদ্ধ হয়ে বাবা ক্রমে পৌঁছলেন সেই গাছ তলায়। সেই ঘোর অন্ধকার রাতে ও নাকি চমক মারছিল গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা লোকটির হাতের উন্মুক্ত তরবারিটি। সে বাবাকে খবরদার। দাঁড়াও। বলে হুকুম দিল। বাবা নাকি তাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হননি। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। আক্রমণ উদ্যত লোকটি বললেন- আমি তোমার জন্যেই এই নির্জন রাতে অপেক্ষা করছি। এ মুহূর্তে তোমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিলে কেউ কোন দিন জানতে পারবে না কে করেছে। তুমি কেন আমার ঘর আগুনে পুড়িয়ে ছাঁই করে দিলে, তা আগে বল।

বাবার বুঝতে বাকী রইলনা তিনি যে তারই সৈনিক কাকা- যিনি এখন রেজুনে আছেন। বাড়ী হতে সন্দেহ মূলক পত্র দিয়ে জানানো হয়েছিল আমার বাবাই নাকি তাদের ঘরে আগুন দিয়েছে। কাকার আক্রোশ পূর্ণ প্রশ্নে বাবা সেদিন ধর্মকে স্মরণ করে বলেছিলেন- আপনি জানেন না, আমিও জানিনা কে এই আগুন দিয়েছে। আমার জীবন আপনার হাতে। যদি আমার পক্ষে ধর্ম থাকে সেই ধর্মই আমাকে রক্ষা করবে। কি জানি হঠাৎ সেই কাকা বাবাকে বুকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে ফেলেছিলেন। বললেন তুমি আমার ভাইপো। আমার ক্ষতি কর বা না-ই কর, তোমাকে আমি অন্তর থেকে ক্ষমা করলাম। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করো এই ঘটনা আমরণ কেউ যেন জানতে না পারে। বাবা সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু রক্ষা করেননি সেই কাকা। চরিত্রের দিক থেকে বাবা ছিলেন তেজস্বী, অথচ ভাবুক স্বভাবের। বাবার তেজস্বিতা জীবনে বহুবার সদর্থ-অনর্থ দু'য়েরই কারণ হয়েছে। এই তেজী স্বভাবের জন্যই তাকে চারটি বছর ধরে ১২টি মামলার ঘানি টানতে হয়েছিল। আমার পিতার এই তেজস্বীতাই অন্যায়ে কাকে কোন দিন মাথা নোয়াতে দেয়নি তাঁকে। একবার তিনি পাহাড়ে গিয়ে ছিলেন ঘরের জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের প্রয়োজনে। স্থানীয় এক মুসলিম, তিনি পাহাড়ের যে অংশের মালিক নহে, শুধু দখলদার; লোকটি শুধু বাঁধা দিলেন না, অকথ্য ভাষায় গাল-মন্দও শুরু করলেন। এক পর্যায়ে বাবার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। তিনি হঠাৎ করে বাঁপিয়ে পড়লেন শক্তিমান মুসলিম লোকটির উপর। ভূমির উপর ধরাশায়ী করে বুকের উপরে চেপে বসে ধারালো দাও উঁচিয়ে ধরলেন ঘাড় থেকে গর্দান পৃথক করে দিতে। কাতর কণ্ঠে প্রাণ ভিক্ষা চাইল সেই মুসলিম লোকটি। বাবা ছেড়ে দিলেন তারে। বুকে জড়িয়ে ধরে ধর্মের ভাই ডাকাডাকি হলো উভয়ের মধ্যে। মানুষের মনের তল নেই। দুর্গম রহস্যময়ী এই মন। আমরণ দেখলাম জন্মের ভায়ের চেয়ে ও এ দুই ধর্মের ভায়ের মধ্যে কী অসম্ভব হৃদযাতা। কেমন প্রাণের টান ছিল একে অন্যের প্রতি। বাবা ছিলেন কর্মনিষ্ঠ, উপায় কুশলী এবং নানা শিল্পশৃঙ্খলের অধিকারী। আলস্যের মধ্যে সময় কাটানো তাঁর ধাঁতে ছিলনা। তাঁর কুঠির শিল্পের প্রতিভাও ছিল চমৎকার। বাড়ীতে প্রয়োজনীয় আসবাব পত্রের প্রায়ই তাঁর নিজেই হাতের। বাঁশ বেতের কাজে বাবা ছিলেন গ্রামে নাম করা। তাঁর নিপুন হাতে তৈরী বাঁশ বেতের ঝুড়ি বাজারে নিতে হতো না, বাড়ী থেকেই লোকে চড়া দামে নিয়ে যেতো।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনের প্রতি বাবার আকর্ষণ সত্যিই প্রশংসনীয় ছিল। বাড়ীর আশে পাশে ঘোঁপ ঝাড় বা ময়লা আবর্জনা রাখা, যেখানে সেখানে মল-মুত্র ত্যাগ এসবের প্রতি তাঁর দারুণ বিরক্তি ছিল। তিনি কারো মুখাপেক্ষী না থেকে নিজেই এসব পরিচ্ছন্নতায় উদ্যোগ গ্রহণ করতেন। গ্রামীণ জীবনে ধনী দরিদ্র সকলেই তখনো খোলা পায়খানায় অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু, আমার পিতা কাঁচা গর্তের উপর ছাউনি ও মাটি দিয়ে ঢাকনার ব্যবস্থা এমন ভাবে করতেন যে, যেন তা

পায়খানা নয় উনুনের চুল্লী। পৈতৃক বাড়ী- ভিটেটুকু পর্যন্ত ঋণের দায়ে দাদার আমলে জমিদার আত্মসাৎ করে নিয়েছিল। তাই, পরিবার রক্ষায় মাও বাবাকে সারা জীবন ক্ষুদ্র ব্যবসার শারিরীক শ্রম- নির্ভর থাকতে হয়েছিল। হিন্দু সন্ন্যাসীদের ভাবের জোয়ারে পড়ে, বাবা মাঝে মধ্যে এতো সংসার উদাসী হয়ে পড়তেন যে, তখন মাকে হিমসিম খেয়ে যেতে হতো সংসারের তাল সামলাতে। শুনেছি আমার বাবা কোন কোন সময় হঠাৎ করে গোপনে চলে যেতেন বহুদূরে সীতাকুন্ডতে হিন্দু সন্ন্যাসীর আরণ্যিক আশ্রম শংকর মঠে। একবার গেলে মাসাধিক কাল পড়ে থাকতেন সেখানে। তখন মা-কে অনেক কষ্টে খুঁজে বের করে পিতাকে নিয়ে আসতে হতো। এভাবে সংসার যাত্রায় বাবা দ্রুত উত্থান পতন ঘটাতেন। বাবার এ খেয়ালী আচরণে মা-কে বহুবার দুঃখ করে বলতে শুনেছি- তোমার বাবা যদি একটু মনযোগী হতেন তাহলে প্রতি বছরই কয়েক বিঘে জমি আমরা ক্রয় করতে পারতাম সহজে। সংসারী হয়ে ও বাবার বিরাগী ভূমিকায় আমাদের পরিবারটিতে মা-বাবার এতো সদগুণ, এত শ্রম সত্ত্বেও কোন দিন নিম্ন মধ্য বিস্তারের পর্যায় থেকে উপরে উঠতে পারেনি তাঁরা। তবে সংসারের চড়াই উত্থরাই অভিযাত্রায় কোন দিন অভাবের তাড়নায় বাবা-মাকে কারো কাছে ঋণের জন্যে হাত পাতেতে দেখিনি। স্বামী- স্ত্রী উভয়ের কর্মোদ্যমে এক প্রকার স্বাধীন জীবনের আশ্বাদে ভরা ছিল তাঁদের জীবন। বাবার পৈতৃক নাম যতীন্দ্রের- এখানেই কি সার্থকতা?

আমার জীবনে শৈশবের ধর্মীয় বাতাবরণের কিছু পরিচয় ইতিপূর্বে তুলে ধরা হয়েছে। সমগ্র ছবিটা আঁকতে গেলে আরো কিছু উপাদান হাজির করা দরকার। তার জন্যেই বলা। আমাদের বিহারে দেখতাম শ্রীলংকা হতে সুশিক্ষা প্রাপ্ত বিহারাধ্যক্ষ উপসংঘরাজ ভদন্ত গুণালংকার মহাস্থবির মহোদয় আশ্রাণ চেষ্টা করছেন গ্রাম থেকে অবৌদ্ধ ধ্যান ধারণা দূর করে বৌদ্ধ কৃষ্টি সংস্কৃতির প্রবর্তন করতে। তিনি, উপোসথ বা অষ্টাঙ্গ সংযম ব্রত ধারীদের পরিবারে কার্তিক ভাত পূজার পরিবর্তে প্রবর্তন করালেন বুদ্ধের উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য ভাত পূজার আয়োজন। এই পাশ্চাত্য ভাতের মধ্যে কার্তিক ভাতের সব উপকরণই থাকতো। কেবল ব্যতিক্রম হতো আশ্বিনে রাক্ষে কার্তিকে খায়, যে বর মাগে সে বর পায়- এই ব্রাহ্মণ উক্তিটির ধ্যান ধারণা বিসর্জন দিয়ে পূর্বদিন রাক্ষে ভাত রান্না করে পরের দিনে পাশ্চাত্য ভাত দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করা ও নিজেরা আমোদ উৎসব করে খাওয়া। বিহারাধ্যক্ষ মহোদয় আশ্রাণ পূর্ণিমা ও আশ্বিনী পূর্ণিমার দিনে অর্থাৎ ছোট ছাদাং এবং বড় ছাদাং- এর সময়ে লক্ষ্মী পূজা বা স্বরস্বতী পূজা জাতীয় কোন পূজার আয়োজন করতে দিতেন না। শনি বারে শনি পূজা, মায়ের খোলায় পান-তেল পূজা ইত্যাদির সমালোচনাও করতেন। কিন্তু, তাঁর এই একক ক্ষুদ্র প্রয়াস একেবারে ব্যর্থ না হলেও গ্রামের ব্রাহ্মণ পৌরণিক ও তান্ত্রিক সার্বিক বাতাবরণকে তেমন কিছুই করতে যে পারেননি, আমার শৈশব ধর্মচার থেকে তা সহজেই অনুমেয়।

বাবার বুঝতে বাকী রইলনা তিনি যে তারই সৈনিক কাকা- যিনি এখন রেজুনে আছেন। বাড়ী হতে সন্দেহ মূলক পত্র দিয়ে জানানো হয়েছিল আমার বাবাই নাকি তাদের ঘরে আগুন দিয়েছে। কাকার আক্রোশ পূর্ণ প্রশ্নে বাবা সেদিন ধর্মকে স্মরণ করে বলেছিলেন- আপনি জানান না, আমিও জানিনা কে এই আগুন দিয়েছে। আমার জীবন আপনার হাতে। যদি আমার পক্ষে ধর্ম থাকে সেই ধর্মই আমাকে রক্ষা করবে। কি জানি হঠাৎ সেই কাকা বাবাকে বুকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে ফেলেছিলেন। বললেন তুমি আমার ভাইপো। আমার ক্ষতি কর বা না-ই কর, তোমাকে আমি অন্তর থেকে ক্ষমা করলাম। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করো এই ঘটনা আমরণ কেউ যেন জানতে না পারে। বাবা সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু রক্ষা করেননি সেই কাকা। চরিত্রের দিক থেকে বাবা ছিলেন তেজস্বী, অথচ ভাবুক স্বভাবের। বাবার তেজস্বিতা জীবনে বহুবার সদর্থ-অনর্থ দু'য়েরই কারণ হয়েছে। এই তেজী স্বভাবের জন্যেই তাকে চারটি বছর ধরে ১২টি মামলার ঘনি টানতে হয়েছিল। আমার পিতার এই তেজস্বীতাই অন্যায়ের কাছে কোন দিন মাথা নোয়াতে দেয়নি তাঁকে। একবার তিনি পাহাড়ে গিয়ে ছিলেন ঘরের জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের প্রয়োজনে। স্থানীয় এক মুসলিম, তিনি পাহাড়ের যে অংশের মালিক নহে, শুধু দখলদার; লোকটি শুধু বাঁধা দিলেন না, অকথ্য ভাষায় গাল-মন্দও শুরু করলেন। এক পর্যায়ে বাবার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। তিনি হঠাৎ করে বাঁপিয়ে পড়লেন শক্তিমান মুসলিম লোকটির উপর। ভূমির উপর ধরাশায়ী করে বুকের উপরে চেপে বসে ধারালো দাও উঁচিয়ে ধরলেন ঘাড় থেকে গর্দান পৃথক করে দিতে। কাতর কণ্ঠে প্রাণ ভিক্ষা চাইল সেই মুসলিম লোকটি। বাবা ছেড়ে দিলেন তারে। বুকে জড়িয়ে ধরে ধর্মের ভাই ডাকাডাকি হলো উভয়ের মধ্যে। মানুষের মনের তল নেই। দুর্গম রহস্যময়ী এই মন। আমরণ দেখলাম জন্মের ভায়ের চেয়ে ও এ দুই ধর্মের ভায়ের মধ্যে কী অসম্ভব হৃদযাতা। কেমন প্রাণের টান ছিল একে অন্যের প্রতি। বাবা ছিলেন কর্মনিষ্ঠ, উপায় কুশলী এবং নানা শিল্পশৃঙ্খলের অধিকারী। আলস্যের মধ্যে সময় কাটানো তাঁর ধাঁতে ছিলনা। তাঁর কুঠির শিল্পের প্রতিভাও ছিল চমৎকার। বাড়ীতে প্রয়োজনীয় আসবাব পত্রের প্রায়ই তাঁর নিজের হাতের। বাঁশ বেতের কাজে বাবা ছিলেন গ্রামে নাম করা। তাঁর নিপুন হাতে তৈরী বাঁশ বেতের ঝুড়ি বাজারে নিতে হতো না, বাড়ী থেকেই লোকে চড়া দামে নিয়ে যেতো।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনের প্রতি বাবার আকর্ষণ সত্যিই প্রশংসনীয় ছিল। বাড়ীর আশে পাশে ঘোঁপ ঝাড় বা ময়লা আবর্জনা রাখা, যেখানে সেখানে মল-মুত্র ত্যাগ এসবের প্রতি তাঁর দারুণ বিরক্তি ছিল। তিনি কারো মুখাপেক্ষী না থেকে নিজেই এসব পরিচ্ছন্নতায় উদ্যোগ গ্রহণ করতেন। গ্রামীণ জীবনে ধনী দরিদ্র সকলেই তখনো খোলা পায়খানায় অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু, আমার পিতা কাঁচা গর্তের উপর ছাউনি ও মাটি দিয়ে ঢাকনার ব্যবস্থা এমন ভাবে করতেন যে, যেন তা

পায়খানা নয় উনুনের চুল্লী। পৈতৃক বাড়ী- ভিটেটুকু পর্যন্ত ঋণের দায়ে দাদার আমলে জমিদার আত্মসাৎ করে নিয়েছিল। তাই, পরিবার রক্ষায় মাও বাবাকে সারা জীবন ক্ষুদ্র ব্যবসার শারিরীক শ্রম- নির্ভর থাকতে হয়েছিল। হিন্দু সন্ন্যাসীদের ভাবের জোয়ারে পড়ে, বাবা মাঝে মধ্যে এতো সংসার উদাসী হয়ে পড়তেন যে, তখন মাকে হিমসিম খেয়ে যেতে হতো সংসারের তাল সামলাতে। শুনেছি আমার বাবা কোন কোন সময় হঠাৎ করে গোপনে চলে যেতেন বহুদূরে সীতাকুন্ডতে হিন্দু সন্ন্যাসীর আরণ্যিক আশ্রম শংকর মঠে। একবার গেলে মাসাধিক কাল পড়ে থাকতেন সেখানে। তখন মা-কে অনেক কষ্টে খুঁজে বের করে পিতাকে নিয়ে আসতে হতো। এভাবে সংসার যাওয়া বাবা দ্রুত উত্থান পতন ঘটাতেন। বাবার এ খেয়ালী আচরণে মা-কে বহুবার দুঃখ করে বলতে শুনেছি- তোমার বাবা যদি একটু মনযোগী হতেন তাহলে প্রতি বছরই কয়েক বিঘে জমি আমরা ক্রয় করতে পারতাম সহজে। সংসারী হয়ে ও বাবার বিরাগী ভূমিকায় আমাদের পরিবারটিতে মা-বাবার এতো সদগুণ, এত শ্রম সত্ত্বেও কোন দিন নিম্ন মধ্য বিস্তার পর্যায় থেকে উপরে উঠতে পারেনি তাঁরা। তবে সংসারের চড়াই উত্থরাই অভিযাত্রায় কোন দিন অভাবের তাড়নায় বাবা-মাকে কারো কাছে ঋণের জন্যে হাত পাতে দেখিনি। স্বামী- স্ত্রী উভয়ের কর্মোদ্যমে এক প্রকার স্বাধীন জীবনের আশ্বাদে ভরা ছিল তাঁদের জীবন। বাবার পৈতৃক নাম যতীন্দ্রের- এখানেই কি সার্থকতা?

আমার জীবনে শৈশবের ধর্মীয় বাতাবরণের কিছু পরিচয় ইতিপূর্বে তুলে ধরা হয়েছে। সমগ্র ছবিটা আঁকতে গেলে আরো কিছু উপাদান হাজির করা দরকার। তার জন্যেই বলা। আমাদের বিহারে দেখতাম শ্রীলংকা হতে সুশিক্ষা প্রাপ্ত বিহারাধ্যক্ষ উপসংঘরাজ ভদন্ত গুণালংকার মহাস্থবির মহোদয় আশ্রাণ চেষ্টা করছেন গ্রাম থেকে অবৌদ্ধ ধ্যান ধারণা দূর করে বৌদ্ধ কৃষ্টি সংস্কৃতির প্রবর্তন করতে। তিনি, উপোসথ বা অষ্টাঙ্গ সংযম ব্রত ধারীদের পরিবারে কার্তিক ভাত পূজার পরিবর্তে প্রবর্তন করালেন বুদ্ধের উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য ভাত পূজার আয়োজন। এই পাশ্চাত্য ভাতের মধ্যে কার্তিক ভাতের সব উপকরণই থাকতো। কেবল ব্যতিক্রম হতো আশ্বিনে রাক্ষে কার্তিকে খায়, যে বর মাগে সে বর পায়- এই ব্রাহ্মণ উক্তিটির ধ্যান ধারণা বিসর্জন দিয়ে পূর্বদিন রাক্ষে ভাত রান্না করে পরের দিনে পাশ্চাত্য ভাত দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করা ও নিজেরা আমোদ উৎসব করে খাওয়া। বিহারাধ্যক্ষ মহোদয় আশ্রাণ পূর্ণিমা ও আশ্বিনী পূর্ণিমার দিনে অর্থাৎ ছোট ছাদাং এবং বড় ছাদাং- এর সময়ে লক্ষ্মী পূজা বা স্বরস্বতী পূজা জাতীয় কোন পূজার আয়োজন করতে দিতেন না। শনি বারে শনি পূজা, মায়ের খোলায় পান-তেল পূজা ইত্যাদির সমালোচনাও করতেন। কিন্তু, তাঁর এই একক ক্ষুদ্র প্রয়াস একেবারে ব্যর্থ না হলেও গ্রামের ব্রাহ্মণ পৌরনিক ও তান্ত্রিক সার্বিক বাতাবরণকে তেমন কিছুই করতে যে পারেননি, আমার শৈশব ধর্মচার থেকে তা সহজেই অনুমেয়।

বাড়ীস্থ সকল শিশু কিশোরগণ যারা বিদ্যালয়গামী আমরা সকলেই শারদীয় তিথিতে পরম ভক্তি সহকারে স্বরস্বতী পূজার আয়োজন করতাম। বিদ্যা দেবীর সন্তোষ বিধানের মাধ্যমে বিদ্যান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই ছিল। কিন্তু কাঁটা দিয়ে গোঁথে লবণ বিহীন ছোট্ট চিতল পিঠাকে এক গালে খাওয়ার আমোদ উল্লাসের আকর্ষণটাই ছিল সবচেয়ে বেশী। আমি তখন দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। সেবার সকলের সম্মতি প্রস্তুতবে আমাকেই পূজার মন্ত্র মুখস্থ করে পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। তারপর থেকে আরো বহুবার সে দায়িত্ব পালন করেছি নিষ্ঠার সাথে। মুখস্থ করা মন্ত্রটি এখনো নির্ভেজাল মনে আছে- “ তং তং স্বরস্বতী নিত্যং নির্মলা বগ্নুঃ কর্ণে বিভূষিত কুন্ডলা কর্ণ । শিরজটা আর গজমতি হার, দেহি স্বরস্বতি বিদ্যারভার ।

জয় জয় দেবী স্বর স্বর সারঃ,

কূচ যুগ শোভিত মুক্তার হার ।

জয় জয় দেবী সর সর সারে;

ভগবতী ভারতী দেবী নমঃস্তুতে।”

আমাদের ঘরে বাবা খুব ভালো জাতের গাভী পোষতেন দুধ খাওয়ার জন্যে। তিনি দুধ ও ঘি এর খুব ভক্ত। গাভীর বাছুর হলে প্রায় সপ্তাহ দু’সপ্তাহ বাছুরকে পূর্ণ স্বাধীনতায় মায়ের দুধ খেতে দিতেন। প্রথম যে দিন দুধ দোহন করা হতো সেই প্রথম দিনের সমস্ত দুধ আমার হাতে দিয়ে বলতেন প্রথমে বুদ্ধ মন্দিরে বোধি গাছের গোড়ায় কিছু ঢালবে; তার পরে সেবা খোলায় মা মগধেশ্বরীর উদ্দেশ্যে কিছু দেবে, তার পরে যাবে মিঠাছড়ায়। ঐ ছড়ায় স্রোতের দিকে দাঁড়িয়ে কিছু দুধ ঢালবে। তার পরে নিয়ে যাবে বাজারের কালি মন্দিরে। মন্দিরের পুরোহিত ব্রাহ্মণের হাতে সব দুধ দিয়ে মা কালীর পূজা ও নিজেরা খাওয়ার জন্যে অনুরোধ জানাবে। মনে, রাখবে যেখানেই দুধ নিয়ে যাবে সেখানেই একাগ্রমনে ভক্তিভরে প্রণাম করে তোমাদের গাভীর দুধ যেন বৃদ্ধি হয়, গাভী ও বাছুর যেন সুস্থ থাকে সেই প্রার্থনা করবে। পিতার অজ্ঞায় সব জায়গায় গিয়ে একাগ্রমনে প্রার্থনা জানাতে কোন অসুবিধে হতো না। কিন্তু, উগ্রচন্ডী, ভীষণাকৃতির হাটহাজারী বাজারের কালী মূর্তির সামনে কিছুতেই উপড়ে হতে পারতাম না। ভয়ে, আতঙ্কে অতিকষ্টে, অতি সন্তর্পনে বারান্দা হতেই প্রণাম জানিয়ে চলে আসতাম।

বাড়ীর গাছে কাঁঠাল, আম, পেঁপে নতুন ফল পাঁকলেই একই ভাবে পূজার জন্যে প্রেরিত হয়ে বাড়ীতে খাওয়া চলতো। পুরনো বাংলা বর্ষকে বিদায় এবং নব বর্ষকে স্বাগত জানাতে সেই চৈত্র সংক্রান্তি উৎসবের অধীর অপেক্ষায় থাকতাম আমরা। তখন থেকেই সারা গ্রাম ব্যাপী বিনি ধানের খই ফুটানোর শব্দ আর গ্রামের আকাশ-বাতাস ভরে উঠতো তার সুগন্ধ। সারাদিন ঘুরে ঘুরে বিষকাটালী, কেয়াপাতা, বেতপাতা, ভাদালী গাছ (কুস্তামুতি) প্রভৃতি সংগ্রহ করতাম জাগু দেওয়ার জন্যে (ভোরে ও সন্ধ্যায় আগুনের ধোয়া উড়ানো)। সে কী আনন্দ। “জাগু জা-গু জাগু (জমা

হও) আর (মোদের) ঘরে জাগ। অঙ্কল (সকল) ঘরের টেয়া পইসা (টাকা- পয়সা), ধন-সম্পত্তি (সম্পত্তি) আর ঘরত জাগ (আমার ঘরে জমা হউক)। আর ঘরের ব্যারাম-সাদি (রোগ-ব্যাদি), আপদ- বালাই হাত দইজ্জা (সাত দরিয়া) পারই যাক্ (পার হয়ে যাক্)। এভাবে অনেকগুণ হল্পা করার ব্যবস্থা হতো ২/৩ দিন ধরে। সমাপ্তির আগের দিন অর্থাৎ চৈত্র মাসের শেষ দিনে খুব ভোরে উঠে বিশেষ কয়টি ফুল কুড়াতে বেরিয়ে পড়তাম। এফুল গুলো সাধারণতঃ চৈত্র মাসের শেষের দিকেই ফোটে। যেমন মইষা ফুল, বিউ ফুল, নিম ফুল, লাম্বালা (লম্বামালা মাথার উপযোগী ক্ষুদ্র পদ্ম কলি সদৃশ) ফুল ইত্যাদি। নিকটবর্তী পশ্চিমের পাহাড় সংলগ্ন রাজবাইজ্যা (বর্তমান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান) হতে কার আগে কে কত বেশী ফুল সংগ্রহ করতে পারে এ নিয়ে কী প্রতিযোগিতাই না চলতো আমাদের। সকালে ফুল সংগ্রহ আর মধ্যাহ্ন ভোজ শেষ করেই বসে যেতাম ফুলের বিচিত্র মালা তৈরী আর গৃহের প্রতিটি দরজা জানালায় সে সব দিয়ে সজ্জিত করতে। ঘরের গৃহপালিত পশুদের গলায় এসব মালা পরানো হতো পরবর্তী দিনে। নববর্ষের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখ। খুব ভোরে উঠে লঠন নিয়েই বেরিয়ে পড়তাম নয় অথবা সাত পুকুরের জল সংগ্রহ করতে। সংগৃহীত জলে মেশানো হতো ঘিলার গোটা ও হলুদ বাটানা। তার পর সোনা-রূপা ডুবানো হতো ঐ জলে। সে জলের সাথে পুকুরের জল মেশায়ে প্রয়োজন মতো বৃদ্ধি করা হতো। প্রথমে বাড়ীর সমস্ত ঘরে বাইরে উক্ত মঙ্গল জল ছিটানো হতো স্নান করা হতো সেই জল দিয়ে। পরে বয়োজ্যেষ্ঠদের পা ধুয়ে দিয়ে প্রণাম করে আশীর্বাদ গ্রহণ করে চলে যেতাম মাঠে। সাথে নিতাম মালসজ্জিত গরুগুলো মাঠের মাঝখানে কোন বড়ো পুকুরের ধারে। প্রথমে অনুষ্ঠিত হতো গরুর লড়াই। উৎসাহী ছেলেরা আয়োজন করতো দৌড়, ঝাঁপ, সাতার কাটা, মোরগ লড়াই, সূচে সুতো পরানো, বিস্কিট ভক্ষণ, পাতিল ভাঙ্গা, চেয়ারে বসা, অঙ্ক কষা- ইত্যাদি আরো কত প্রতিযোগিতার আয়োজন। গরু গুলোকে পরে স্নান করানো হতো মাথায় ও গায়ে কাঁচা হলুদ মিশ্রিত ঘিলা- বাটনা মেখে দিয়ে। আমরা নিজেরা ও স্নান করতাম ঐ মিশ্রিত গুলো দিয়ে, সারা গায়ের রং উজ্জ্বল হবে, চর্ম রোগ কখনো হবে না এই পরম বিশ্বাসে। ভোর থেকে পূর্বাহ্ন পর্যন্ত চৈত্র সংক্রান্তি উৎসবের এখানেই শেষ নয়। মাঠ থেকে ফিরে এসেই বেরিয়ে পড়তাম লাবণ আর পাঁচন তরকারী (অনেক প্রকারের ঔষধ জাতীয় শাক-সবজীর মিশ্রণ বিশেষ) খাওয়ার আমন্ত্রণে। একবাড়ী থেকে অন্য বাড়ীতে দেয়া নেয়া আর খাওয়ার পালা চলতো রাতের ভোজেন পর্যন্ত। আমোদ উল্লাস বাড়ানোর প্রয়াসে কিশোর যুবকেরা নানা সংসেজে খোল- করতাল বাজিয়ে, নেচে- গেয়ে, গ্রামময় ঘুরে খই, লাবণ সংগ্রহ করতো। আর উল্লাস করে করে নিজেরা ও খেতো অন্যকেও বিলাতো। নববর্ষের এই দিনে প্রবীণেরা অনেকেই খৈ লাবণ আর পাঁচন নিয়ে খুব সকাল থেকেই বিহারে যেতেন বুদ্ধ পূজা ও ভিক্ষু-শ্রমণদেরকে দানের জন্যে।

সকালে খেলার প্রতিযোগিতা, আর বিকেলে কবিতা, ছড়া, কঁমিক, গান ইত্যাদির প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে চৈত্র সংক্রান্তীর উৎসবের শেষ হতো সন্ধ্যায়- জাগ্ জা-গ্ জাগ্ ধ্বনির মাধ্যমে। আহা! কী মধুর সেই ফেলে আসা শৈশব স্মৃতি গুলো।

গ্রামের অন্যান্য বাড়ীগুলোর ন্যায় আমাদের বাড়ীতে ও লক্ষ্মী পূজা এবং শনি পূজার আয়োজন হতে দেখেছি, তবে কার্তিক পূজার নয়। আমার শৈশবে মা-বাবাকে কোন দিন উপোসথ শীল পালন করতে দেখিনি। তবে যেবার বাড়ীতে ভিক্ষু আমন্ত্রণ করা হতো সেবার খুব ভক্তি শ্রদ্ধা ভরে সূত্র পাঠের আয়োজন অবশ্যই থাকতো। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের বাইরে আমার বাবাকে বৈরাগীদের গানের প্রতি সবিশেষ অনুরাগী দেখতাম। কয়েক জন নিদ্ধিষ্ট বৈরাগী গ্রামে এলে অবশ্যই আমাদের বাড়ীতে অনেকগুলি গান গাইতেন এবং বাবা ও বিশেষ সমাদর দেখাতেন। আমাদের বাড়ীতে লক্ষ্মী ও শনি পূজার আয়োজন যখন হতো তখন পূজার মহনীয়তার চেয়ে প্রসাদটো কখন পাবো, সেটার দিকেই আকর্ষণ থাকতো খুব বেশী।

মা মগধেশ্বরীর পূজার উদ্দেশ্যে মায়ের খোলায় পান- তেল দানের অনুষ্ঠানে অনেকবার যোগ দিয়েছি। লক্ষ্মী পূজার ন্যায় সেখানে ও চাল, গুড়, কলা, নারকেল মিশ্রিত সুস্বাদু প্রসাদ পাওয়াটাই ছিল বিশেষ আকর্ষণ। এ পূজা কার্তিক, শনি ইত্যাদি পূজার ন্যায় মানত হিসেবেই প্রদান করা হতো। আগে নাকি এতে পাঠা অথবা মহিষ বলিদানের প্রথা ছিল। কালক্রমে তা উঠে গিয়ে আমাদের সময়ে ডিম ও মাঝে মধ্যে মোরগ, কবুতর ছেড়ে দিতে দেখেছি। একান্ত বিশ্বাস ছিল, মানত কারীর আশা পূর্ণ হবে তখনই, যখন হু লু ধ্বনির সাথে সাথে কাকজাতীয় কোন পক্ষী এসে সজ্জিত পূজা হতে ডিম বা পূজার যে কোন উপকরণ তুলে নেওয়া হবে। তৎকালীন বৌদ্ধ সমাজের ধর্মীয় পরিমন্ডলটাই ছিল এ ধরনের পাঁচ মেশালী। সেই ১৮৬৪ ইংরেজী হতে ১৯৯৪ ইংরেজী, পুরো ১৩০টি বছরের ব্যবধান আজ। এ সমাজে খাঁটি বৌদ্ধাচার প্রবর্তনের এ যাবত অনেক প্রয়াসের পরে ও অদ্যাবধি কতটুকুই বা সম্ভব হয়েছে, তা ভাববার বিষয় বৈকি।

শৈশবের এই দীর্ঘ স্মৃতি চারণে এবার কিছু আত্ম চিত্রাঙ্কনে আসা যাক। এ ক্ষেত্রে আমার খাওয়ার প্রবল প্রবৃত্তির কথাটাই বেশী মনে জাগে। বাড়ীতে সব সময়ে প্রচুর খাওয়ার আয়োজন থাকতো এমনটি বলার উপায় ছিল না। কারণ! বাবা প্রায় প্রতিদিন বাজারে গেলেও ঘরের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্যে মাসিক এবং বার্ষিক বরাদ্দের তালিকায় থাকতো বেশী। লবণ, ডাল, তেল- এগুলোর জন্যে মাসিক বরাদ্দ। ধান, কলাই, হলুদ, মরিচের ষ্টক থাকতো সারা বছরের। বাড়ীর উৎপাদিত শাক- সবজী এবং গোলা ভরা নানা জাতের গুটকি মাছ তো আছেই সারাটা বছরের তরকারী। ঘরে দুধও ডিম থাকতো সব সময়। বাজার হতে কাঁচা মাংস, মাছ টুকুই কেবল আনতো। সন্তানদের জন্যে ফলাহার বলতে যা বুঝায় বছরের নতুন ফল

হিসেবে প্রথম প্রথম বেশ কিছু দিন খাওয়ানো হতো, তার পরেই বন্ধ। মোয়া, মুড়কি ছিল মাঝে মাঝে। বাড়ীতে চা এর কোন প্রচলন ছিলই না। সকালে পাশ্চাত্য ভাত, দুপুরে ও রাতে গরম ভাত এই ছিল আমাদের জন্যে রুটিন বাঁধা। কোন উৎসব, পার্বণ বা অতিথি অভ্যাগতের জন্যেই কেবল খাদ্যের বিশেষ আয়োজন হতো। আর আয়োজন হতো আমার যাবার কোন সময় অসুস্থ হয়ে পড়লে। তখন রুচিকর নানা উপাদেয় খাদ্য বিশেষ করে সুজির হালুয়া, দুধে কিচমিচে ভরা মিষ্টান্ন-এসব তৈরী হতো। ভাবলে ও হাসি পায় আমি মনে মনে বাবার ন্যায় অসুস্থতা কামনা করতাম কেবল ঐ খাদ্য পাওয়ার আশায়। টুক ও মিষ্টির প্রতি আমার দুর্বলতা সাংঘাতিক রকমেরই ছিল। মা আপদ বিপদের জন্যে তেঁতুলের দিনে পাকা তেতুল শুকায়ে বড় বড় কাঁচের পাখে রাখতেন লবণ মিশ্রিত করে। বড়ই এর দিনে অনেক বড়ই শুকায়ে মাটির কলসী ভরে রাখতেন চৈত্র সংক্রান্তির লাবন, আর মিষ্টাঞ্চল তৈরীর জন্যে। আমার উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে নাগালের বাইরে রাখার জন্যে ছাদের বিমের হকের সাথেই ঝুলিয়ে রাখতে হতো এগুলো। কিন্তু, তাতে ও রেহাই পাওয়া যেতনা। আমি চেয়ারের উপর চৌকো পিঁড়ি বসিয়ে অতি সহজেই তার নাগাল পেতাম। আর প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার সময় এবং স্কুল থেকে ফিরে এসে কখনো তেতুল, কখনো বড়ই মুটি মুটি পকেটে ভরে বাড়ী হতে দৌড়ে পালাতাম। প্রয়োজনের সময়ে মা দেখতেন সব কিছুই অর্ধেক শেষ। তখন বকুনি দিতেন আমাকেই, অন্য কাউকে নয়। অবশ্য এজন্যে কখনো মার খাইনি মায়ের হাতে। আগেও বলেছি গাভীর দুধ বাড়ানোর জন্যে বাবা বড় টিন ভরা, পোঁড়া-গুড় নিয়ে আসতেন গাভীকে খেল কুড়ার সাথে খাওয়াতে। প্রতিদিন ঐটিন থেকে চিড় মিঠা তুলে তুলে কয়েকটি গুলি পাকিয়ে রাখতাম। স্কুলের পথে কিছু নিজে খেতাম, কিছু সাথীদের দিতাম। অনেক সময় পথে শেষ করতে না পেরে কাগজ মুড়িয়ে রেল লাইনে পাথর চাপা দিয়ে চিহ্নিত করে রাখতাম স্কুল ছুটির পর খাওয়ার উদ্দেশ্যে। প্রায় সময় দেখতাম হয়তো পিঁপড়ায় ছেয়ে গেছে নতুবা উদাও হয়ে গেছে।

আমার লেখা পড়া ও বিদ্যালয় জীবনের অনেক শৈশব স্মৃতিই মনে এখনো প্রোজ্জ্বল। আমাকে বর্ণ জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার জন্যে প্রথম হাতে- খড়ি হওয়ার কথা ছিল মষ্টার যতীন বাবুর হাতে। কারণ তিনিই ছিলেন আমার মেঝদা ভূপতি এবং ছোটদা অজিত এ দু' জনের গৃহ শিক্ষক। কিন্তু, যে মোড়লের বাড়ীতে আমার মেঝদাকে ভীষন মার ধোর করা হয়েছিল সে ঘটনার পূর্বাভাস তিনি নিজে পেয়েও কি কারণে আমার বাব-মা বা দাদাকে সাবধান করে দেননি। সেই থেকে উক্ত গৃহশিক্ষকের সাথে আমার মা বাবার আর কোন সম্পর্কই ছিলনা। আমার কাকাতু ভাই মানিকদা তখন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তাঁর মাধ্যমে ও হাতে খড়ি হতে পারতো আমার। তাদের সাথে সুসম্পর্ক না থাকাতো, তা- ও হলো না। অতএব, বাবা নিজেই বর্ণবোধ ও শ্রেট নিয়ে আমাকে হাতে খড়ি দিতে বসলেন। দিন কয় না যেতেই বিরক্ত হয়ে

উঠলেন। উদ্দাম ঘুরে বেড়ানো, খেলা নিয়ে মেতে থাকা মনটিকে কিছুতেই কালো অক্ষর গুলোর উপর বসাতে পারছেন না তিনি। একদিন সকালে বাবা তাঁর প্রার্থনার আসনের পাশে বসিয়ে পড়াচ্ছিলেন। অক্ষর চিনতে বার বার ভুল করার কারণে হঠাৎ রেগে গিয়ে সম্মুখস্থ ছাতা সিক্ দিয়ে শুধু মাত্র মাথায় এমন মার শুরু করলেন যে, আমি বেহুস হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলাম। মা রান্না ঘর থেকে দৌড়ে এসে আমাকে সজোরে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন বাবার হাত থেকে। আর পড়াতে দিলেন না বাবাকে। সে দিনই বিকেলে মা বৈকুণ্ঠের বৌ নামে এক গৃহ বধুকে ঠিক করে আসলেন আমাকে পড়ানোর জন্যে। আমার সেই শিক্ষায়িত্রী ছিলেন গৃহস্থালী কাজে অসম্ভব মজুর। কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমাকে পড়াতে বটে, কিন্তু দেখা গেল কোন অগ্রগতিই আমার হচ্ছে না। মায়ের অক্ষর জ্ঞান মোটেই ছিল না। কিন্তু সম্ভানের লেখাপড়ায় ছিলেন অসম্ভব আগ্রহী সজাগ আর অবস্থা বুঝতে পেরে তিনি চৌধুরী বাড়ীর প্রীতি ভূষণ চৌধুরীর স্ত্রীকে ঠিক করলেন আমাকে পড়ানোর জন্যে। এই শিক্ষায়িত্রীর কাছে বেশ কিছু দিন পড়লাম। সেখানেও আমার অগ্রগতি সম্ভোষজনক নয় দেখে মা ভীষণ উদ্ভিগ্ন হয়ে পড়লেন। অবশেষে সমস্ত মান অভিমান বিসর্জন দিয়ে সেই পুরনো গৃহ শিক্ষক যতীন্দ্র বাবুর নিকট মা গেলেন। তাঁকে আমার দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে রাজি করালেন। একদিন সকালে আমাকে নিয়ে মা গেলেন শিক্ষক মহোদয় যেখানে থাকতেন সেই পৈয়ারসিদের বাড়ীতে। মাষ্টার মহোদয় আমাকে কি ভাবে গ্রহণ করেছিলেন সে স্মৃতি আমার নেই। কিভাবে কতদিনে তিনি আমাকে বর্ণবোধ থেকে রামসুন্দর বসাকের বাল্যশিক্ষায় উত্তীর্ণ করালেন তার কোন স্মৃতিই আমার মনে তেমন দাগ কাটেনি। শুধু এটুকুই মনে আছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছর ধরে কেবল শ্রেট, কলাপাতা ইত্যাদির উপর লিখেই চলেছি। কত শ্রেট ভেঙ্গেছি, কত পেন্সিল হারিয়েছি, কত বাল্য শিক্ষা নিঃশেষ করেছি করেছি তার সংখ্যা- সীমা নেই। নিরাস যজ্ঞাদায়ক সেই শৈশব শিক্ষার স্মৃতি যতই ভুলে থাকতে পারি ততই যেন শান্তি। আমার মনে আছে বয়স বেড়ে যাচ্ছে, অথচ বাল্য শিক্ষা শেষ করতে পারছি না। শেষ পর্যন্ত প্রাইমারী স্কুলের প্রথম শ্রেণীর সুন্দর রঙিন ঝক ঝকে আকর্ষণীয় কচি কথা বইটি আমার হাতে দিয়ে একদিন নিকটবর্তী বোর্ড স্কুলে ভর্তি করায়ে দেয়া হলো। ঐ কচি কথা আমি এক দিনেই শেষ করে দিলাম। ফলে প্রথম শ্রেণীতে নয় সরাসরি দ্বিতীয় শ্রেণীতেই আমাকে ভর্তি করায়ে দেয়া হলো। স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়লেও গৃহশিক্ষকের নিকট সেই বিষাক্ত বাল্য শিক্ষা, ধরাপাত এবং ইংরেজী A B C বই এর আলাদা পাঠ দান পুরো বছরটাই চালাতে হলো। স্কুলে যাওয়ার পর থেকে লেখাপড়ায় আমার উদ্যম উৎসাহ যেন বিগুন হয়ে উঠেছে। সমগ্র বাল্য শিক্ষা বানান সহ মুখস্ত করে ফেললাম, ধরাপাতের নামতা সব মুখস্থ হয়ে গেল। ইংরেজীর এ বি তে এন্, এ সি, তে এ্যক্, ইত্যাদি শব্দ গঠন প্রণালীও আয়ত্বে এসে গেল অল্পদিনেই। সেবার দ্বিতীয় শ্রেণীর

পরীক্ষায় যুগ্ম প্রথম স্থান অধিকার করলাম। এভাবেই বিশেষ উৎসাহের সাথে আমার স্কুল জীবনের সূচনা হলো।

স্কুল জীবনে আমি একমাত্র অংক ছাড়া আর সব বিষয়ে অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় বরাবরই দিয়ে এসেছি। কোন বিষয়ে আমাকে নোট বই এর দ্বারস্থ হতে হয়নি সেকেন্ডারী স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা পর্যন্ত। দুইকি তিন বার পড়েই যে কোন কিছু মুখস্থ করতে পারতাম। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত আমার এ ক্ষমতা পুরোদমেই ছিল। কিন্তু এই পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালেই দুর্ভাগ্য ক্রমে মমতাজ মাস্টার নামে আমার এক প্রিয় শিক্ষকের অভিশাপে অভিশপ্ত হই। সেই থেকেই আমার মেধা শক্তি ও ক্রমশঃ হ্রাস পেতে শুরু করে বলে আমার ধারণা। তবে, এই মেধাশক্তি হ্রাস বা পরবর্তী পরীক্ষাগুলোতে ভালো ফল না করার পেছনে আমার পারিবারিক বিপর্যয় ও কম দায়ী ছিলনা। ক্রমে তার উল্লেখ করছি—

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমাদের পঞ্চম শ্রেণীর ইংরেজী শিক্ষক ছিলেন মমতাজ নামে এক ধর্মপ্রাণ মুসলিম ব্যক্তি। জাতে মৌলবী না হলেও মৌলানা সাহেবের মতোই তার চলন বলন। স্কুলে নামাজ পড়ার সময় দেখতাম তাঁর সর্ব শরীর কম্পিত হতো, চোখে জল আসতো। ঠিক এমনি স্বধর্ম অনুরাগী ছিলেন তিনি। আমি ক্লাশে ইংরেজী ভালো পারতাম- তাই তিনি আমাকে অনেকটা স্নেহ দৃষ্টিতে দেখতেন। তাঁর অনেক কাজ আমাকে দিয়ে করাতেন। স্কুলের বার্ষিক সভায় আমাকে দিয়ে ইংরেজী কবিতাদি আবৃত্তি করাতেন। এক দিন আমারই ক্লাশের আবদুল হক নামে এক মুসলিম ছাত্রের সাথে স্কুলের মাঠে খেলছিলাম। এক পর্যায়ে ছেলেটিকে নিয়ে তামসা করার মতলবে বললাম- তুমি নামাজ কিভাবে পড়তে হয় দেখাও দেখি? ইতি পূর্বে কারো মুখে শুনেছি যে বার্মায় মুসলমানেরা পথে নামাজ পড়তে বসলে বর্মীরা তাদের পাছা দুহাতে উল্টায়ে দেয়। তাই আমার মনেও এলো কু মতলব। আমাকে নামাজের রীতিটা দেখানোর জন্যে যেই মাত্র আব্দুল হক উপুড় হয়ে সেজদা দিচ্ছিল, তখন তাকে হাত দিয়ে সোজা উল্টায়ে দিলাম। এতে সে আমার উপর ভীষণ রেগে গেলো এবং আমার যেই প্রিয় ইংরেজী শিক্ষকের নিকটই নালিশ করলো। শিক্ষক সাহেব আমার ছেলে মানসিকতাকে বিবেচনা না করে, অমার্জনীয় অপরাধ হিসেবেই তা গ্রহণ করলেন। কয়েকটা বেত হাতে নিয়ে বেদড়ক পিটুনি দিলেন আমাকে। সামান্য ছোট্ট অপরাধের জন্যে এমন মার খাবো এবং যিনি আমাকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসেন তিনি এমন শাস্তি দিতে পারেন- তা আমি কিছুতেই সহজে মেনে নিতে পারিনি। খুব সম্ভব এর পর থেকে উনার প্রতি আমার ভক্তি শ্রদ্ধা বলতে আর কিছুই ছিলনা। এতে আমার কোন অজ্ঞাত আচরণে তিনি নিশ্চয় মনোকষ্ট পেয়ে থাকবেন। তাই একদিন তিনি স্পষ্টই বললেন- এই ছেলেটা বরবাদ যাবে। এবং সত্যিই সেবার পঞ্চম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় আমার স্থান হয়ে গেল- ৬/৭ জনের পরে। এই ক্ষোভে আমি আর ঐ স্কুলে থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট টা পর্যন্ত নিতে যাইনি।

পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালেই আমাদের ঘরে চুরি হয়েছিল। যদি জাগ্রত অবস্থায় এই চুরি হতো, তবে একে ডাকাতি বললেও অত্যাক্তি হতো না। রাতটি ছিল গ্রীষ্ম কালীন কৃষ্ণ পক্ষের। তৎকালে গ্রীষ্মের রাতে লোকে ঘরের দরজা- জানালা খোলা রেখেই অনেক সময় ঘুমাতেন রাতের শীতল বাতাস উপভোগ করার জন্যে। এর আগের রাতে আমাদের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আমার পিসতু বোনের বিয়ের অনুষ্ঠান। ফলে বাড়ীর সকলেই গত রাত ভর ছিলেন নিদ্রাহীন। বিয়ে অনুষ্ঠানের সমস্ত ক্লান্তি নিয়েই পরের দিন রাতে ঘরের দরজা খোলা রেখে সকলে গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়েছিলেন। গভীর রাতের শেষ ভাগে চোর ঢুকলো ঘরে। সংখ্যায় তারা ১০/১৫ জনের কম হবে না। যদি তা না হতো ৪/৫ জনের পক্ষে কখনো সম্ভব হতো না আমাদের মাল বোঝাই ভীষণ ভারী বার্মার তৈরী সিন্ধুকটিকে অর্ধ মাইল দূরে এক দিঘীর পাড়ে নিয়ে গিয়ে ভাঙতে।

সিন্ধুকের মধ্যে সোনার গয়না ছিল অনেক। নতুন ভিটায় বাড়ী করবে অচিরেই। তাই, সমস্ত জমা কৃত টাকাও ছিল ঐ সিন্ধুকে। আট আনার একটা মুদ্রা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি পরিত্যাক্ত ঐ সিন্ধুকে। বাড়ীতে চাউলের ড্রাম ভরা চাল, মরিচের ড্রাম ভরা মরিচ, বস্তা ভরা গুটকি সহ যাবতীয় আসবাবপত্র, কাপড় চোপড় কিছুই অবশিষ্ট রাখিনি। সারা ঘরটাই শূন্য করে দিল একরাতে। যেন লুটতরাজের কবলে পড়েছে বাড়ীটি। বিলম্বিত সকালে ঘুম যখন ভাঙলো, তখন বাবা- মার বুঝতে সময় লেগেছিল কি থেকে কি হয়েছে। উভয়ে নিখর পাথর হয়ে বসেছিলেন অনেকক্ষণ। পরে সে- কি করুন আর্তনাদ। বুদ্ধ মন্দিরের ভণ্ডে গুণালংকার মহাস্থবির আসলেন, শান্তনা দানের জন্যে। ঐ রাত আমি বাড়ীতে ছিলাম না। চিরাচরিত নিয়মে গৃহশিক্ষকের অবস্থান বাড়ীতেই প্রত্যেকদিন সাক্ষ্য আহারের পর চলে গিয়ে ছিলাম। সংবাদ পেয়ে আমিও দৌড়ে আসলাম। মা- বাবার করুণ আর্তনাদে আমিও স্থির থাকতে পারলাম না। সেই থেকে ঘন- ঘোর দুর্দিন আবার শুরু হলো আমাদের। মাস খানেকের মাথায় বাবা অনেক বার আত্ম হত্যা করতে চাইলেন। আমার লেখাপড়া বন্ধ। বাবার পাশে রাতে ঘুমোতাম। একবার ভোর রাতে বাবা হঠাৎ বিছানা হতে উঠে দ্রুত ঘরের বাইরে যেতে, আমার ও ঘুম ভেঙ্গে গেলো। কে যেন বললো তোমার বাবা মরতে যাচ্ছে। কাল বিলম্ব না করে আমিও ছুটলাম বাবার পেছনে হাউ মাউ কান্না আর চিৎকার করে করে। ওদিকে রেলগাড়ী আগমনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমার চিৎকারে তখন পাড়ার অনেকেই জেগে গেছে। আমিও আমার পশু ছোটদা অজিত ছাড়া বাড়ীতে আর তৃতীয় কোন পুরুষ ব্যক্তি ছিলনা। বড়দা পৃথক হয়ে পুরনো বাড়ীতেই আছেন। মেঝদা ভারতে। ভাগ্যিস মেঝদি লেদুর জামাই খবরটা সহসা জানতে পেরেছিলেন। তিনি মাঠের কোণাকোনি দৌড়ে গিয়ে ট্রেনে ঝাঁপ দেয়ার পূর্ব মূহর্তেই বাবাকে ঝাঁপটে ধরলেন।

মানুষের দুর্দিনে মৌখিক শান্তনা দেয়ার মতো শুভানুধ্যায়ীর অভাব হয়তো হয়না। কিন্তু বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার শক্তি সাহস আর উপায়ের যোগানদার খুবই বিরল এ পৃথিবীতে। আমাদের বাড়ীতে রান্না করে খাওয়ার শক্তি সামর্থ্য ও ছিলনা কিছু দিন। আত্মীয় স্বজনেরাই খাওয়ালো। নতুন করে ব্যবসা শুরু করবেন এমন শক্তি ও পিতার আর নাই। কী করবেন। বাঁচার উপায় কী? মা- বাবা চারদিকে তখন হতাশার অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। ঠিক এমনি ঘোর দুর্যোগের দিনে হামদু মিঞা নামে এক প্রতিবেশী মুসলিম আমার বাবা- মা এর কাছে প্রস্তাব নিয়ে আসলেন বর্গা জমিতে চাষ করার। যে পরিবারে জমিদারের কবলে পড়ে অনেক বছর আগেই চাষ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, চাষের কোন উপকরণই যাদের ঘরে নেই, কি করে তা সম্ভব হবে? নীরব প্রশ্নের ফ্যাল দৃষ্টিতে বাবা- মা দু'জনেই তাকালেন ঐ শুভানুধ্যায়ীর দিকে। প্রস্তাবকারী তাদের এই নীরব জিজ্ঞাসার উত্তর দিলেন সহজেই। হাল- গরু, ধানের বীজ, জমি সবকিছুর ব্যবস্থা আমিই করবো কিছুর চিন্তা করতে হবে না চাচা। এই দুর্দিনে এতো বড় আশ্বাসের পরেও প্রশ্ন রয়ে গেল। বাবা- মা দু'জনেরই দেহের ও মনের বল বলতে কিছুই নেই। মা দিবা- রাত অশ্রু বিসর্জন করতে করতে দৃষ্টি শক্তি ও প্রায় হারিয়ে বসেছেন। মরণাপন্ন শয্যাশায়ী ও হয়েছিলেন মা। এখন একটু ভালোর দিকে। বাবা দৈহিক সুস্থ থাকলে ও মানসিক ভারসাম্য এখনো ফিরে আসেনি পুরোপুরি। এমতাস্থায় বড়োদা এবার এগিয়ে আসলেন। তিনি স্বেচ্ছায় পুরনোবাড়ীতে তালা দিয়ে সস্ত্রীক চলে আসলেন বাবা- মাকে রক্ষার জন্যে। বহুকাল পর আবার মিলনের আনন্দ জোয়ার আসলো বাড়ীতে। বড়ো ভাই সদৃশঃ হামদুমিঞার সহায়তায় বাবাকে সাথে নিয়ে বড়োদা চাষে নামলেন। বড়োদা আসাতে বাবা- মার মনোবল ক্রমে ফিরে আসতে লাগলো। খুব ভালো ফসল হলো শুরুতেই। প্রথম ফসল ঘরে আনতে না আনতেই হঠাৎ করে বড়োদা আবার চলে গেলেন পুরনো বাড়ীতে।

তখন আমি হাটহাজারী পার্বতী উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলাম, পিসতু ভাই রণধীরদার সহায়তায়। স্কুলটি প্রায় দুই মাইল দূরত্বে। হেঁটেই যাওয়া আসা করতে হতো। একদিকে পড়ার চাপ, অপর দিকে বাড়ীতে কাজের চাপ। এ দু'দিক সামাল দেয়া আমার মতো ছেলের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। খুব ভোরে উঠেই বাবার সাথে হাল নিয়ে মাঠে যেতে হতো। কারণ আমাদের হালের গরু গুলো রোদের তাপ একটু বাড়লেই জোঁয়াল ভেঙ্গে বাড়ীতে ছুট মারতো। ঘুম জড়ানো চোখে মাঠে পথ চলতে গিয়ে কতবারই যে আল্ থেকে পড়ে গেছি, ইয়স্তা নেই। বাবাকে হাল জুড়ে দিয়ে আমাকে যেতে হতো গরুর জন্যে কাঁচা ঘাস সংগ্রহ করতে পাহাড়ের ধারে। সেই আবছা আলো আধাঁরিতে কোন ডর-ভয় ছিলনা আমার মনে। নির্জন পাহাড়ী জমি হতে সেই একা ছোট্ট একটি ছেলে গরুর ঘাস সংগ্রহ করছে কী এক অদম্য সাহসে। কী তার এই সাহসের উৎস? “জীবনে আমাকে অনেক বড়ো

হতে হবে, তার জন্যে যে কোন কষ্টকে হাসি মুখে বরণ করতে হবে।” এই স্বপ্নই সেদিন আমার সারা দেহ-মন জুড়ে থাকতো সারাঙ্কণ। লোকে পাহাড়ের দিকে হাল-গরু নিয়ে আসার মুখেই আমি ঘাস সংগ্রহ করে বাবার হালের গোড়ায় এসে উপস্থিত হতাম। ছোট বোন কণিকা বা ছোটদি কমলা ততক্ষণে বাবার জন্যে পাশ্চাত্য নিয়ে হাজির। মাথা ও কাঁধ থেকে ঘাসের বোঝা নামিয়ে আমি বাবার হাল ধরতাম। পাশ্চাত্য খেয়ে তামাক সেবনের পর আবার তিনি হাল ধরলেন, আমি কিছু খেয়ে জমির কোনা আর আলের গোড়ায় কৌদাল দিয়ে চালায়ে নাঙল যায়না এমন জায়গা গুলো উল্টায়ে দিতাম। এ কাজ শেষ করে বাড়ীতে চলে এসে ঝুপ করে পুকুরে গিয়ে পড়তাম। অল্পক্ষণ পরেই সামান্য কিছু খেয়ে, বেলা ৯ টার দিকে রওনা দিতে হতো দশটার স্কুলে। ক্লাসে বসে বসেই শোনা ও দেখার মাধ্যমেই লেখাপড়া যা আয়ত্ব হতো; তার পর বই হাতে নেয়ার তেমন সুযোগ কোথায়? বিকাল ৪ টায় স্কুল শেষ করে ৫ টায় বাড়ী পৌঁছাতাম। কিছু খেয়ে আবার মাঠে ছুটে যেতে হতো। সাথে গরু, অথবা ঘাসের খাঁচা, নতুবা কৌদালি। এ ভাবে কাজে ডুবে থাকতাম সন্ধ্যা পর্যন্ত। সন্ধ্যায় ঘরে এসে একটু বই খোলার সুযোগ হতো। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে অষ্টম স্থানে পরীক্ষার ফল হলো। সপ্তম শ্রেণীর পাঠ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই সেই অক্ষর জ্ঞান থেকে অদ্যাবধি শিক্ষাদাতা সেই গৃহশিক্ষক মাষ্টার যতীন্দ্র নিজের শারিরীক অসুস্থতা এবং বীজগণিতে তাঁর অক্ষমতা দেখিয়ে আমাকে বিদায় করে দিলেন। তাঁর সান্নিধ্য থেকে আমাকে সে দিনের বিদায়ে আমি যেন পিতা-মাতার অভয় আশ্রয় হতেই চ্যুত হলাম। মা- বাবার মৃত্যু তুল্য শোক ও অসহায়ত্ব অনুভব করেছিলাম সেদিন।

আমার জন্ম দাতার নাম ‘যতীন্দ্র’। আর একই নামের জ্ঞান দাতা এই শিক্ষককে ভিত্তি করেই আমার জীবনের শিক্ষার ভিত্তি। শৈশব ও কৈশোরের শিক্ষা জীবনের কত আনন্দ অক্ষর স্মৃতি ভরে আছে এই শিক্ষক মৃতিটিকে ঘিরে। চিরকুমার আমরণ শিক্ষাব্রতী এ জীবনটির উপর আমার ঋণ স্বীকারের ভাষা আমার নেই। এই মহাজীবনটির নিজামপুর পরগণার সীতাকুণ্ড গ্রামে মামার বাড়ীতে থেকে সীতাকুণ্ড উচ্চ বিদ্যালয়ে। কৈশোর জীবনে মা- বাবা হারিয়ে অভাবের তাড়নায় জীবন রক্ষার তাগিদে পড়েছিলেন। স্বাম্য জোবরাতে বিয়ে দেয়া একমাত্র বোন মালতীর মায়ে র আশ্রয়ে-ই থাকতেন তিনি। স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নের সুযোগ পেয়েছিলেন মা- বাবা জীবিত কালে। তেতাল্লিশের মহাদুর্ভিক্ষে মা-বাবা হারিয়ে অধ্যয়ন বন্ধ করে কিছুকাল ঘোরা ফেরা করে কাটালেন কর্তব্য স্থির করার জন্যে। আরো কিছু পড়াশোনা করতে চেয়েছিলেন দিদির আশ্রয়ে। কিন্তু দরিদ্র দিদির পক্ষে ভাইয়ের এ আশা মেটানো সম্ভব হয়নি। স্বাস্থ্যের দিক থেকে দুর্বল হলেও, অগত্যা, বোনের জামাতার সাথে সামুদ্রিক মৎস্য জীবিকায় অংশ গ্রহণ করলেন। আমাদের গ্রামের প্রায় পরিবার এই দুষ্কর ব্যবসার সাথে জড়িত হলেন। অনেকেই করতেন। গ্রামের পশ্চিমে এগারো মাইল ব্যাপী পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে সমুদ্রের জেলেদের নিকট থেকে

স্বল্পমূল্যে মাছ সংগ্রহ করা, আর ৬/৭ ঘণ্টার মধ্যে সেই মাছ কাঁধে করে হাটহাজারী মদন হাট, ইসলামী হাট এই তিন বাজারে বিক্রি করা; সেই বিক্রির মুনফা থেকে ঘরে চাল- ডাল এনে পরিবার রক্ষা; এক ভীষণ জীবন- জীবিকা! সেকালে চার পাঁচ টাকা মাত্র পুঁজির বিনিময়ে নগদ এই ব্যবসাটি শক্তিমানদের কাছেই কেবল লোভনীয় ছিল। কিন্তু দুর্বল স্বাস্থ্যের এই কিশোরটির ধাতে তা বেশী দিন সইলো না। লেখাপড়া জানা এক কিশোরের এ দুর্গতি দেখে, আমার বাবা উদ্যোগী হলেন তাঁকে শিক্ষকতার কাজে লাগাতে। গ্রামের আরো গুটিকয় শিক্ষানুরাগীর সাথে পরামর্শ ক্রমে গ্রামের বিহারে রাতের বেলায় বয়স্কদের শিক্ষা দান এবং দিনের বেলায় সকালে শিশুদের ছেলেদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব দিলেন তাঁকে। তাঁর কোন নির্ধারিত পারিশ্রমিক ছিল না। পালাক্রমে শিক্ষার্থীদের বাড়ীতে খেতে যাওয়া এবং প্রয়োজনে হাত খরচ হিসেবে কিছু চাঁদা তুলে দেওয়া, এই ছিল বিধি ব্যবস্থা। মোটামুটি বেঁচে থাকার এ ব্যবস্থাটা ও তাঁর মন্দ বলে মনে হলো না প্রণান্তকর মতস্য জীবিকার চেয়ে। সেই থেকে নিবিষ্ট চিন্তে আমরণ জীবন ব্রত হিসেবে গ্রহণ করলেন তিনি শিক্ষকতাকে।

আমার গ্রামের শিক্ষার অগ্রগতির মূলে এই নিবেদিত জীবনটির অবদান এক ব্যাপক অংশ জুড়ে আছে। বলতে গেলে তার আলোয় আলো প্রাপ্তরাই জোবরা গ্রামকে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে পরিচ্ছন্ন করেছেন। আজ জোবরা গ্রামের দিকে তাকালে শিক্ষিত বলতে যাদের বুঝায় প্রায় সকলেই তাঁর হাতে গড়া সম্ভান। সেই চিরকুমার আমরণ শিক্ষাব্রতী যতীন্দ্র মাষ্টারের ইংরেজী, বাংলা ও পাটি গণিতে দক্ষতা ছিল অসাধারণ। মেট্রিক পর্যন্ত তিনি ছাত্রদের পড়াতে পারতেন এ- তিন বিষয়ে। কিন্তু তার চক্ষুশূল ছিল বীজ গণিত। বিষয়টা শিক্ষার চেষ্টা করেছেন কিনা জানিনা, কিন্তু যেদিন তিনি আমাকে সেই বীজগণিতের অজুহাতে বিদায় দিচ্ছিলেন সে দিন আমাকে আশ্বস্ত করেছিলেন তার অসুস্থতা সেরে উঠলে অচিরেই বিষয়টি শিক্ষা করে আমাকে আবার পড়াবেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এমন আশ্বাস কেন তিনি আমাকে দিলেন এর মর্ম এখনো আমার বোধগম্য নহে। কবিরাজী মতে তিনি রসায়ন নামে একটি চিকিৎসার আশ্রয় নিলেন রোগ সারানোর জন্যে গুমানমর্দনের গুজা বৈদ্য নামে এক গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে। সুস্থ হয়ে আমাকে পড়াবেন এ আশ্বাস ও দিলেন। কিন্তু, কে জানতো এ মরণ ব্যাধির, মরণ-চিকিৎসা তাঁকে আর কখনো আমাদের কাছে ফিরে আসতে দেবে না। শুনেছিলাম তিনি পানি দাও, পানি দাও, করে করে এক সময় স্বমূত্র পান করেই আপন জীবন দীপটি নিভিয়ে দিলেন। রসায়ন চিকিৎসার অজুহাতে এক গ্লাস পানিও বৈদ্য তাঁকে পান করতে দিল না। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আমি বার কয়েক দেখা করতে চেয়েছিলাম। কেহ আমাকে একটি বারও দেখা করতে দিল না। দিলেই বা কি করতে পারতাম। আমিও তো আর এক অসহায় সম্ভান তাঁর। স্কুল থেকে এসে একদিন তাঁর অকাল মৃত্যুর সংবাদ যখন পেলাম, তখন

ক্ষোভে দুঃখে আমার বুক ফেটে যেতে চাই- ছিলো। আমার ক্ষোভ ছিল যারা তাঁর হাতে গড়ে উঠে জীবনে তখন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে সেই উদাসীনদের প্রতি। এক মহামূল্য নিবেদিত জীবন, অযত্ন অবহেলায় এ ভাবে হারিয়ে গেলো। এ প্রশ্নটি আমার সেই কিশোর বিবেক কে যে ভাবে সেদিন ক্ষত বিক্ষত করেছে- তার রক্তক্ষরণ এখনো থামেনি।

আমার জীবনের শিক্ষার ভিত্তি রচয়িতা সেই গৃহশিক্ষকটি নিয়ে কিছু লিখতে গিয়ে স্মৃতির রাজ্যে এতো কিছু একত্রে ভিড় জমিয়েছে আজ, কোনটাই যে আর তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে না।

অংকে যিনি দক্ষ, তিনিই তাঁর এক অন্তিম শিষ্যকে এতো চেষ্টা করেও অংক শেখাতে পারলেন না। তাই একদিন দুঃখ করে আমাকে বললেন, তুমি জীবনে কখনো অংক শাস্ত্রে অধ্যয়ন করবে না। এ শাস্ত্রে তোমার সাফল্য আসবেনা। ভবিষ্যদ্বাণী দানকারী আমার সেই শিক্ষক বেঁচে ছিলেন না, যখন আমি অষ্টম শ্রেণী অতিক্রম করে নবম শ্রেণীতে তাঁর কথা মনে রেখেই মানবিক বিভাগের সমস্ত পাঠ্য বই কিনে আনলাম। কিন্তু বিধি বাম, আমার পিসতু ভাই রণধীরদা পুলিশ বিভাগে চাকুরী করতেন তখন কুমিল্লায়। ছুটিতে বাড়ী এসে যেই মাত্র জানতে পারলেন আমি মানবিক বিভাগের বই নিয়ে এসেছি, তিনি ডাকলেন আমাকে। বই গুলো আনতে বললেন। বই আনলাম। জিজ্ঞাসা করলেন কে তোমাকে এ পরামর্শ দিয়েছে। বললাম, আমি নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কারণ আমি অংক পারি না। অংকে বার বার ফেল করছি। আর যাই কোথায়। কপু করে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন গাছ তলায়। গাছের সরু- শক্ত ঢাল ভেঙ্গে নিয়ে সে কি বেদম মার। পিঠ ছিঁড়ে রক্ত বেরিয়ে আসলো। গায়ের গেঞ্জি খুলে নিয়ে নিজে কেরোসিন লেপন করছিলেন সেই আঘাত চিহ্ন গুলোতে। আমার বাবা- মা একে বারে নীরব। বাবার কাছে নিয়ে গেলেন। বললেন, তাকে এক্ষুণি স্কুলে নিয়ে যাচ্ছি। অবশ্যই বিজ্ঞান বিভাগে তাকে পড়তে হবে। লাইব্রেরী থেকে কেনা বইগুলো ফেরত দিয়ে বিজ্ঞান বিভাগের বইগুলো নিয়ে দিলেন। স্কুলের বি, এস, সি শিক্ষক ছিলেন বাবু দেব প্রসাদ মজুমদার। তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে অংকে প্রাইভেট পড়ানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। বলতে কি, মাসিক ২০ টাকায় বেশ কয়েক মাস প্রাইভেট পড়ার পরও অরুচিকর এই ইলেকটিভ ম্যাথ এর কিছুই আমার মাথায় ঢুকেনি। এই বিজ্ঞান বিভাগে এস, এস, সি (মেট্রিক) পাশ করতে গিয়ে আমার ভরা ডুবি কতটুকু হয়েছিল, সে কথা পরে বলবো। তবে এ কথা ঠিক, আমার শিক্ষাগুরু ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়নি। আমার এই শিক্ষা গুরু তিনি কেবল শিক্ষক মাত্র ছিলেন না; একা ধারে তিনি নাট্যকার এবং নাট্য পরিচালক ও বটে। তার রচিত অনেক নাটক প্রতি বছরই নিজের পরিচালনায় অভিনীত হতো আমাদের গ্রামে ও প্রতিবেশী মুসলিম গ্রামে। যখনই তিনি আনমনা হয়ে যেতেন, তখন দেখা যেতো পথ চলতে চলতে, কাজ করতে করতে নাটকের সংলাপ গুলো আপনাতাই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে

আসছে। নাটকের স্বরচিত 'বিবেক' এর গানের কলি গুণ গুণ করে সারাঞ্চণ তিনি গেয়েই চলতেন। দুঃখের বিষয় তাঁর কোন পান্ডুলিপিই রক্ষা করা হয়নি।

তিনি একজন দরদী গৃহ চিকিৎসক ছিলেন। হোমিওপ্যাথী গ্রন্থ ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। শিক্ষকতা করে তাঁর যৎ সামান্য যে অর্থ উপার্জন হতো তা নিজের বেশ ভূষার জন্যে কখনো ব্যয় করেছেন বলে মনে হয় না। ঔষধ কিনে বিনামূল্যে বিতরণের মাধ্যমেই বেশীর ভাগ ব্যয় হয়ে যেত। নিজে অতি অল্পদামের দু'খানা লুঙ্গি, ১টি শাট ও ১টি গেঞ্জী দিয়ে সারাটা বছর অতিব্রত করতেন। অথচ, যে বাড়ীতে তিনি থাকতেন সে বাড়ীর ছেলে মেয়েদের কতো বার শাড়ী, ব্লাউজ, জামা কিনে দিতে দেখেছি। বাঁশ-বেতের হস্ত শিল্পে ও ছিলেন তিনি পারদর্শী। যে বাড়ীতে থাকতেন, সে পৈয়ারসিকদের বাড়ীর প্রত্যেকটা পরিবারে বাঁশ-বেত সামগ্রীর সব প্রয়োজন তিনি মেটাতেন বিনা পারিশ্রমিকে। এমন গৃহ বন্ধু আর দ্বিতীয়টি আমার চোখে পড়েনি। পালক্রমে যে বাড়ীতে যে সময় খাওয়ার কথা, কোন কোন দিন তারা রান্না তৈরী করে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে আছেন; কিন্তু মাষ্টারের দেখা নেই। গেলেন কোথায়? দেখাগেল টেবিলের উপর এক মনে অংক কষায় ডুবে আছেন। উত্তরটা কিছুতেই মিলাতে পারছেন না। তাই এই অবস্থা। এ ধরনের সমস্যায় যেদিন পড়তেন সেদিন অংকের সমাধান বের করতে না পারা পর্যন্ত স্নানে বিলম্ব, আহারের বিলম্ব, এমনকি শয়নেও বিলম্ব হয়ে যায়। বস্তুতঃ আহারে, বিহারে, বসনে, ভূষণে, স্নানে, শয়নে, তিনি উদাসীন ছিলেন চিরকাল। অনেকেই অনুরোধ করে ছিলেন বিয়ে করে সংসারী হতে, অথবা প্রব্রজ্যা নিয়ে ভিক্ষু জীবন যাপন করতে। কিন্তু, এ প্রশ্নে কোনদিন তিনি মুখ খোলেননি।

আমার সেই গৃহ শিক্ষকের নিকট পড়তে যেতে কোনদিন আগ্রহের কমতি ছিল না। কিন্তু, যেদিন পড়া আদায় করতে পারতাম-না সেদিন তিনি রাতের নিদ্রাকেও হারাম করে বসে থাকতে তিনি বাধ্য করতেন। তখন বিশ্বাস করুন, অসম্ভব তেঁতো হয়ে উঠতো তাঁর প্রতি সমস্ত অন্তঃকরণ। তখন ঝিমুনির কোলে আত্ম সমর্পন করতে সে-কি কলা কৌশল। স্যারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে টেবিলের উপর থেকে পেন্সিল, কলম, খাতা অথবা বই ফেলে দিতাম টুপ করে টেবিলের তলায়। পরক্ষণেই কুঁড়িয়ে নেয়ার ভান করে মাথা নীচে ঢুকিয়ে সেই যে চোখ বন্ধ করে ঘুমের আশ্বাদন শুরু করতাম আর ওঠার নামটি নেই। স্যার অন্য মনস্ক হলে তো বেশ কিছুক্ষণ ঐ ভাবে ঘুমানো গেলো। যদি তিনি চালাকি বুঝতে পারেন, আর উপায় নেই- পিঠের উপর সাপাং সাপাং দু'চারটি বেত অবশ্যই পরতো। তখন পিঠের দাহণে আর চোখের জলে ঘুম বেটা আপনাতেই ভেসে যেতো। কোন কোন দিন মায়ের সাথে প্রাণ ভরে ঘুমোতে খুবই ইচ্ছে হতো। মা-কে তাতে সহজে রাজি করানো সম্ভব যে নয়, তাতো জানাই ছিল। তবুও অবজমন্ মানতো না। পেটের ব্যথা, মাথা কামড়ি, দস্ত শূল ইত্যাদি নানা ধরনের অজুহাত খোঁজার চেষ্টা করতাম তখন। ঠিক এমনি এক দিনের কথাই

বলি। মা যথারীতি সন্ধ্যায় ভাত খাইয়ে দিয়ে; লেম্পটা জ্বালায়ে হাতে দিয়ে দিলেন। এর অর্থ- এবার চলে যাও মাষ্টারের কাছে। কিন্তু, যাওয়ার ইচ্ছে সেদিন মোটেই ছিল না। কী আর করি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও যাত্রা শুরু করতে হলো। যাচ্ছি আর বুদ্ধি আঁটছি। খুব সহজেই দুর্বুদ্ধি মাথায় এসে গেলো। সামনেই জঙ্গলাকীর্ণ বুদ্ধ মন্দিরের পুকুর পাড়। তার পাশ দিয়েই এ ভর সন্ধ্যায় যেতে হবে। জঙ্গলের নিকট গিয়ে লেম্পটা পথের পাশে ফেলে দিয়ে মা- গো- করে চিৎকার মেরে মারলাম এক দৌড়। হাঁপতে হাঁপতে বাড়ীতে গিয়ে চোখ স্থির করে বললাম, মা- মন্দিরের পুকুর পাড়ের জঙ্গল হতে আমাকে ভুতে ডাক ছিল। আমি আর পড়তে যাব না। ভূত নয়, পড়তে না যাওয়াই মুখ্য- মা নির্ঘাত ধরে নিলেন। অতএব রক্ষা নেই। আমার হাত ধরে বললেন চলো আমার সাথে। শেষাতক্ মা- কে জানাতে চেষ্টা করলাম মনের কথা। তাতে ও তাঁর করুণা হলো না। মাষ্টারের কাছে নিয়ে গিয়ে নালিশ করে দিলেন। এমন নির্ভুর মা আমার। মাষ্টারের আর বিলম্ব সইলো না। তিনি বেত নিয়ে শুরু করলেন মার। মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছেন। মায়ের ও মাষ্টারের প্রতি তখন ক্ষোভের প্রতি শোধ হিসেবেই সোজা প্রস্রাব করেছিলাম পেটে ও ঘরে! আর যায় কোথায়, দূর দূর করে ঘরের বের করে দিলেন আমাকে। আর উপস্থিত সকলে হৌঁ হৌঁ করে হেসে উঠল। মা আমাকে সাথে করে বাড়ী ফিরতে বাধ্য হলেন। তবে বলতে কি, মায়ের বুকে মুখ রেখে মধুর ঘুমের সৌভাগ্য, সে রাতেও আর হয়নি।

যে বাড়ীতে রাত জেগে পড়তে যেতাম, যে বাড়ীটি আমাকে নিজ বাড়ীতে ঘুম যাওয়া হারাম করে দিয়েছিল এই শৈশবে; সে বাড়ীটির নাম পৈয়ারশিদের বাড়ী। ঘুমের কারণে কষ্ট পেলেও, বাড়ীটার প্রতি আকর্ষণের ভাটা কিন্তু কোনদিন পড়েনি। সমবয়স্ক সহপাঠি ছেলে মেয়ে বাড়ীটিতে ছিল বেশ কয়েক জন। তাদের সাথে উঠা-বসা, খেলা- ধুলা, হৈ- চৈ, নাওয়া- খাওয়া, ঘুম যাওয়া কিছুই ঘাটতি ছিলনা। বর্ণ বোধ থেকে এই পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এ দীর্ঘকাল, আমি ছিলাম বলতে গেলে সে বাড়ীরই এক সম্ভান। সে বাড়ীর মা- বাবারা ও আমাকে সত্যি সে ভাবেই গ্রহণ করে ছিলেন। সকালের পাছা ভাত পর্ব সে বাড়ীর যে কোন ঘরে অনিবার্য রূপেই আমার হয়ে যেত। আর কোন সময় রাতের আহারটাও।

মাষ্টারের বেতের বাড়ি কোন কোন সময় আমাদের সকলকেই অসহ্য করে তুলতো। তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আমরা চাকু অথবা ব্রেডের সন্ধান করতাম। মাষ্টার যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বেশ কিছু দূরে সেবা খোলার নিকটবর্তী খারিতে যেতেন, অথবা অন্য কোন উপলক্ষে দীর্ঘক্ষণের জন্যে কক্ষের বাইরে থাকতেন, তখন আমরা মাঝে মাঝে বেত গুলো নিয়ে প্রতিটি গিরায় গিরায় কুলুপ দিয়ে দিতাম। অংকে ভুল করার জন্যে মার খাওয়াটা আমার জন্যে জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধই ছিল। অন্যান্যদের বেলায় প্রায় সব বিষয়ে। বেত হাতে নিয়ে যে মাত্র পিঠে বা হাতে লাগালেন, অমনি পুটুস। একটি গেলেই মাষ্টারের আর বুঝতে বাকী থাকতো না অন্যান্য গুলোর

পরিণতি। কে করেছে এ কাজ? আমরা জানিনা স্যার। মাষ্টারের স্কোভের আগুন তখন সকলের বক্ষেই দুক্- ফুক্ ধরিয়ে দিয়েছে- তার পর প্রত্যেকের হাতেও মাথায় পাইকারী মার। যেখানেই লাগে আগুন ছুটতো যেন প্রতিটি আঘাতে। সে স্মৃতি মনে জাগলে গায়ের লোম কাটা দিয়ে ওঠে এখনো।

জোবরার সূর্য সন্তান গুণালংকার মহাস্থবির। তাঁর রঞ্জিত নামে বাঁশখালী জাত এক সুদর্শন শ্রমণ ছিল। তিনি ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে সূত্র, গাথা, কবিতা, কঁমিক ইত্যাদি শেখায়ে কঠিন চীবর দান সভায় পরিবেশনে খুব উৎসাহী ছিলেন। আমাকে এক কঁমিক অভিনয় শেখালেন তিনি। তা এখনো মুখস্থ আছে। বলবো?-" আমার নাম পাঁচ কড়ি। আমি সারাদিন গফ্‌করি। স্বপুড় বাড়ী আমার মঙ্গলে। শালী আমায় টেনে নিল জঙ্গলে। জঙ্গলে দেখি মস্ত এক সাপ। দিলাম অমনি লাফ। বাপরে বাপ! বাপরে বাপ!" বলে মারতে হয় এক দৌড়। কঠিন চীবর দানোৎসবে ভীষণ অঙ্গ ভঙ্গির শেষে সেদিন আমি পেছন ফিরে সে দৌড়টা এমন কায়দা করে মেরে ছিলাম যে, সকলেই হো হো করে হেসেই খুন। প্রথম অংশ গ্রহণে এই অসাধারণ সাফল্য আমার বুকের পাটা শুধু বাড়ায়নি, সঙ্গী সাথীরা বেশ কিছুদিন ধরে আমাকে দেখলেই "আমার নাম পাঁচ কড়ি" বলেই আবৃত্তি শুরু করে দিত। আমেজ ভরা এই দিনগুলোতে একদিন আমিও আমার রাত জাগা বাড়ীর সাথী প্রশান্তকে নিয়ে বিকেলে খেলছিলাম বাড়ীটির দক্ষিণে পুকুর পাড়ে। পুকুরটির মালিকের কিশোরী কন্যা ও কোন কার্য উপলক্ষে সেখানে ছিল। আমাকে দেখেই 'আমার নাম পাঁচকড়ি....., বলে আবৃত্তি শুরু করে দিল। আমরা দু' বন্ধুর মনে দুষ্ট বুদ্ধি গঁজালো। যখনই সে বলে উঠল "শালী মোরে টেনে নিল জঙ্গলে" - অমনি আমরাও দু' জনে তাকে টানা-টানি শুরু করে দিলাম। তাতে সে ভীত হয়ে হাউ- মাউ কান্না শুরু করে দিল। অবস্থা বেগতিক দেখে দু' জনেই মারলাম দৌড়। পালিয়ে গেলাম মন্দিরের দিকে। তখন মন্দিরের সম্মুখের মাঠে গ্রামের প্রথম নলকুপটি বসানো হচ্ছিল। বহু লোক সে দৃশ্য উপভোগ করছিলেন। আমরা দু' জনও শান্ত সুবোধ ছেলের মতো সে সমাবেশে টুকে পড়লাম।

উনিশ শো ষাট সাল। দেশের উপর দিয়ে অভাবনীয়, অদৃশ্য পূর্ব, ভয়ঙ্কর এক ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেল কার্তিকের এক অমানিশা রাতে। সারা দিন মেঘ আর গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। সন্ধ্যা যতই ঘনিয়ে আসছিল হালকা বাতাস ততই জোরদার হচ্ছিল। অবস্থা ভালো নয় দেখে মা আমাদের তাড়াতাড়ি ভাত খাইয়ে দিলেন। পরে জেনেছিলাম অনেকের সে রাতে আহার জুটেনি। আমাদের খাওয়া ও শেষ আর হঠাৎ করে আসা বাতাসের প্রবল চাপে আমাদের লাকড়ী ঘর গোয়াল ঘর ও রান্না ঘরটা পড়লো বসে। লেম্প- বাতি সবই মুহূর্তে নিভে গেল। ঘুট ঘুটে অন্ধকারে আমাদেরকে সরিয়ে আনা হলো মাটির কেঠো ঘরের বারান্দায়। বহুদিনের পুঞ্জিভূত ছাদের সব ময়লা- আবর্জনা তখন বাতাসের ঝপটায় ঝুর ঝুর করে বারান্দায় পড়ছিল। এগুলো থেকে আমরা

ভাই- বোনদের রক্ষার জন্যে মা কি বাবা সকলের উপরে একটি কাঁথা দিয়ে ঢেকে দিলেন। কিছুক্ষণ, পর বারান্দাও যখন পড়ে যাচ্ছিল তখন মা তাড়াতাড়ি আমাদেরকে যেই মাত্র কোঠা ঘরের দরজার ভেতরে মন্ত্রের মতো টেনে নিয়ে আসলেন অমনি ছাঁদের এক বিরাট মাটির পিলার হস্তার ছেড়েই যেন পড়লো। দেখা গেল আমরা সকলে যেখানে জড়ো হয়ে বসেছিলাম পিলারটা পড়লো ঠিক সেখানেই। মাত্র সেকেন্ডের ব্যবধানে আমরা প্রাণে বেঁচে গেলাম সকল ভাই-বোন। বারান্দা যখন মাটির সাথে লেপটে গেল বাইরে প্রকৃতির অবস্থা কোঠার খোলা দরজা দিয়ে তখন স্পষ্ট দেখার সৌভাগ্য হলো। সৌভাগ্য এ জন্যেই বলছি ঝড়ের তান্ডবলীলা, আর রুদ্র- মূর্তির মুখো মুখি হলাম জীবনে এই প্রথম। আমরা সকলেই কি ঠান্ডায় নাকি ভয়ে গির্ গির্ কাঁপছিলাম। মুখ খোললেই দাঁত টক্ টক্ করে উঠছিল। তবুও বাইরে গাছগুলোর অনিচ্ছা কৃত খাম্চা, খাম্চি, মোচড়া মুচড়ির আত্ননাদ আর আকাশে অদৃশ্য পূর্ব টক টকে লাল মেঘের জলন্ত টুকরো গুলোর তীর বেগে ছুটাছুটির দৃশ্য থেকে চোখ কিছুতেই ফেরাতে পারছিলাম না। তখন কি আমি ভীত- সন্ত্রস্ত, নাকি আনন্দিত; কিছুই অনুভূতির মধ্যে ছিলনা। ডান দিকে আমার বিন্দুলাল কাকার কণ্ঠে আত্ননাদ আর কাতর প্রার্থনার শব্দে শুনতে পারছিলাম, কেবল রাম, লক্ষণ ও সীতাকে ডাকতে। আমার পিতৃ পুরুষদের মধ্যে এখন তিনিই কেবল জীবিত আছেন। অন্যরা সকলেই একে একে চলে গেছেন এখন লোকান্তরে। আমার সেই কাকা এখন জুরা- বার্ষক্যে শয্যাশায়ী। তবে তিনি প্রতি মুহূর্তেই এখন কেবল বুদ্ধ- ধর্ম ও সজ্জের নাম আওড়াচ্ছেন। বহু দিন ধরে তিনি পরম নিষ্ঠার সাথে অষ্টাঙ্গ উপোসথ ব্রত ও পালন করে গেলেন। আমার শৈশবে যে জেঠু মনিকে প্রতিদিন রামায়ণ পড়তে দেখেছি তিনিও মৃত্যুর বেশ কিছু বছর পূর্ব হতে রীতিমতো বিহারে গেছেন এবং উপোসথ ব্রত পালন করেছেন। আমার জন্মনন্দাতা যে পিতা নেশায় বুদ্ধ হয়ে স্বরচিত ভজন আওড়াতেন প্রতি দিন, সে পিতা- পবিত্র ভাবে ভিক্ষু জীবন যাপন করে গেছেন প্রায় ১২/১৩ টি বছর। আমার মা, জ্যোতিমা, কাকীমা সকলের ধর্মীয় জীবনে ও আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল একই সাথে। আর এই পরিবর্তনে আমি বিশ্বাস করি যে, আমার প্রব্রজ্যা জীবনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব কমছিল না। এবার চলমান ঘূর্ণিঝড়ের কথাই বলি। সারা রাত কারো চোখ এক হতে পারেনি ঝড়ের তান্ডব নৃত্যে। ভোরের আকাশে উষার আলোচ্ছটা যতই উজ্জ্বলতর হতে লাগলো রুদ্রচন্ডী তার নৃত্যের গতিবেগ ও সেই সাথে কমিয়ে দিতে লাগলো। যেন বড়ো ক্লাস্ত, বড়ো শ্রান্ত হয়ে গেছে মদন দেবের জন্যে রাতভর সন্তোষ অর্ঘ্য দিতে দিতে। সকাল হলো, ঝড় থামলো। কিন্তু গতদিনের স্মৃতি চিহ্ন বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই। চেনাই যাচ্ছে না কিছু। কারো মুখে শব্দ নেই। শির্বাক পাথর চোখ কেবল ঘুরছে। দেহে যেন কারো প্রাণ নেই। কারো ঘর মাটিতে উপোড় হয়ে নীরব পড়ে আছে, কারো চালা উদাও হয়ে গেছে। গাছ পালা, মাঠের খান সবগুলো যেন আগুনে

পুড়ে গেছে। শুষ্ক ধূসর হয়ে মাটিতে পড়ে গেছে, অথবা দাঁড়িয়ে আছে ভাঙা ডাল পালাহীন গাছ গুলো, মাত্র গত দিনের ঘন সবুজের সমারোহ হারিয়ে। ঘন গাছ পালায় ঘেরা এই গ্রাম, যেখানে এক বাড়ী থেকে অন্যবাড়ী দৃষ্টির সম্পূর্ণ আড়ালে থাকতো- এখন সেই গ্রামকে একটি মাঠ মাত্র মনে হচ্ছে। আশ্চর্য- অদ্ভুত প্রকৃতির এই খেয়ালী শক্তি।

ঝড়ে আমাদের ঠাকুর দাদার তৈরী পুরণো কোঠা ঘরের ছাউনী বলতে আর কিছুই অবশেষ ছিল না। টিনগুলো কিছু গাছের আগায় আটকে আছে। কিছু সামনের পুকুরে ও তার আশে পাশে পাওয়া গেছে দুমড়ানো অবস্থায়। আর কিছুর কোন হদিসই পায়নি। ঘরের মাটির দেয়াল ও দেখা গেল ইদুর আর উই পোকায় প্রায় শেষ করে দিয়েছে। পিতৃব্যদের সকলেই একমত হলো বাড়ীটি ভেঙ্গে ফেলার এবং যার যার অংশে ইচ্ছে মতো ঘর করার। ঠাকুর দাদা মৃত্যুঞ্জয়ের শেষ স্মৃতিচিহ্নের এভাবেই অবসান হলো তাঁর সন্তানদের হাতে।

আমার বাবা দেখলেন এই পৈত্রিক ভিটাতে ভবিষ্যত সন্তানদের স্থান সংকুলান হবে না। তাই তিনি আমার পুত্রহীন মেঝে ঠাকুরদা মুনিন্দ্র প্রিয়ের কন্যাদের থেকে কিছু দানও কিছু ক্রয়ে প্রাপ্ত ভিটায় নিজে স্বান্তরিত হওয়ার সিদ্ধান্তে বড়ো ছেলে অমূল্যকে পৈতৃক ভিটার অংশ দান করে দেন। বাবা- মার সাথে আমরা অপর ভাই বোনেরা জন্ম স্থান ত্যাগ করে নতুন ভিটায় নতুন বাড়ীতে গিয়ে উঠি। আমাদের এই বাড়ী পরিবর্তনের সময়ে মেঝদা ভূপতি ছিলেন ভারতের ত্রিপুরারাজ্যে।

ষাটের এ- ঘূর্ণিঝড়ে আমার বহু বছরের রাতজাগা বাড়ীটা ও ধ্বংস প্রাপ্ত হলো। আমাদের প্রাইভেট অধ্যয়ন চালু রাখার তাগিদে পারুল নামে এক নিম্ন শ্রেণীর সাথী ছাত্রীর বাড়ীতে উঠায়ে নেয়া হলো আমাদের আসর সাময়িক ভাবে। বছরের বেশ কিছু মাস আমরা সে বাড়ীতে সকাল বেলা পড়তে যেতাম, মাষ্টার যতীন্দ্র নামের সেই গৃহ শিক্ষকের কাছে। ঐ নতুন স্থানে অধ্যয়ন চলা কালে একদিন শিক্ষক মহাশয় আসতে দেরী করছিলেন। এমন সময়ে ছাত্রীটি আমাকে একটি ফাউন্টেন পেন এনে দিয়ে বললো- এটা কেন খোলা যায় না, দেখ তো দাদা! কিছুদিন আগে আমার মেঝদা ভারত থেকে এসেছেন। তিনিও একটি ভালো ফাউন্টেন পেন সাথে এনেছিলেন। শুনেছি হাতে গাড়ী ভাড়া না থাকায় তিনি ঐ পেন কোন এক দোকান-দারকে সাময়িক ভাবে দিয়ে টাকা নিয়ে বাড়ীতে উঠেছিলেন। সেই ফাউন্টেন পেন বহুচেষ্টা করে ও খুলতে না পেরে তিনি গরম জলে দিয়ে খুলেছিলেন। কাজটি আমি দেখেছি। অতএব, বিলম্ব না করে মেয়েটিকে বললাম তুমি কিছু জল গরম কর। সে উনুনে আগুন দিয়ে জল গরম করতে লাগলো। আমি ফুটন্ত জলে কলমটি ছেড়ে দিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে অভাবণীয় কান্ড ঘটলো। ছোট কলমটি, বৃহদাকার ধারণ করে একেবারে প্রেসিডেন্ট কলম হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি তুলে নিলাম। আর দেখলাম কলমটি খুললো বটে, তবে আর কিছুতেই চুরিতে টাইট দেয়া যাচ্ছে না। সব জয়েন্ট

ঢিলে হয়ে গেল। মেয়েটি কান্না শুরু করলো। তার বাবাকে বললো, আমি নাকি তার কলমটা নষ্ট করেছি। মেয়েটির বাবা নিবারণ বড়ুয়া সেদিন আমার বাবা-মার জীবিকা ধরে যেভাবে গালা-গাল দিলেন আমার হৃদয়ে তা জ্বলন্ত লোহার দাগের মতো বসে গিয়েছিল। অথচ মদ্যপ সে লোকটিকে কোনদিন উৎকৃষ্ট জীবন যাপন করতে দেখিনি। তার সেদিনের ব্যবহার আমার মনে এমন একটা জেদের জন্ম দিয়েছিল- যা আমাকে শত বাঁধা-বিল্লের মাঝেও জীবনে বড়ো হওয়ার অদম্য শক্তি জুগিয়েছে।

আমরা বুদ্ধ মন্দিরের পাশে নতুন বাড়ীতে আসার কিছু কাল পরেই ঘর চুরি হলো। এ চুরির পেছনে কিছু রহস্য আছে। নতুন বাড়ীতে আসার পরও গুটিকির ব্যবসা জম জমাট ভাবেই চলছিল আমার বাবার। তখন আমাদের পরিবারিক অবস্থা খুব ভালো হয়ে উঠেছে। কারণ মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়েছিল বেশ কিছু আগে। সপ্তাহে দু'বার, মধ্যে মধ্যে তিন বারও শহর হতে মাছের চালান আনতে যেতে হতো বাবারে। একদিন গাড়ীর উপর থেকে ইলিশ মাছের ডিমের টিন নামানোর সময় নীচে থেকে ধরতে গিয়ে তিনি আঘাত পেলেন মাথায়। কি জানি গাড়ীর স্টাফের সাথে কোন ধরনের তর্ক বিতর্ক সেদিন হয়েছে কিনা। বাড়ীতে এসেই মা- কে বললেন- এ কুস্তা ব্যবসা ছেড়ে দেবো। বাবার এক গ্রাম্য বন্ধু এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। তিনি মাঝে মাঝে গরুর দালালি করতেন। বাবাকে নানাভাবে প্রলোভিত করে সেই ব্যবসায় তিনি জড়িত করালেন। প্রতিদিন কত রকমের গরু, কত রকমের ক্রেতার সমাবেশে হঠাৎ আমাদের বাড়ীটা গরুর বাজার হয়ে উঠলো। হাজার হাজার টাকা বাড়ীর সিঁদুক থেকে নিমিষে বের হয়, আর নিমিষে ঢুকে; যেন একটা ব্যাংক। ভালো করে ঘর বাঁধবে এ আশায় অস্থায়ী ঘর বেঁধেছেন কোন রকমে মাথা গোঁজার জন্যে। আর সে ঘর পড়ে গেল ব্যাংকের দশায়। অহিতকামীদের লোলুপ দৃষ্টিতে পড়লো এই ঘরটি। পরিকল্পিত উপায়েই যেন লুট করা হলো তাকে। বাদশাকে ফকির বানিয়ে দিল একটি মাত্র রাতে।

সরল ভাবে সববিছু বলতে দারুণ ইচ্ছে জাগে। 'জীবন' কি। কিভাবে আবর্তিত হতে হতে কোথায় গিয়ে পৌঁছায় এজীবন। তার আদি মধ্য ও অন্তে কোন মিল আছে কিনা- এসব তথ্য আপন পর জীবনটিতে মিলিয়ে দেখার জন্যেই এবং সে তাগিদেই আত্ম-স্মৃতিচারণে এই কলম ধরেছি। বাইরের সংসারে বাবা যখন একা এবং সন্তান হিসেবে সেক্ষেত্রে যথাক্ষিপ্রত সাহায্য করতে সক্ষম, একমাত্র আমি। তাই বাধ্য হয়েই স্কুলের পাশাপাশি বাজারে ও বাবাকে সাহায্য করতে যেতে হতো। স্মরণ রাখা দরকার, আমি যখন তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীতে তখন আমার বাবা গুটিকির ব্যবসাতেই ছিলেন। পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালেই মহাচুরির কবলে পড়ে ব্যবসা বন্ধ করে, চাষে নামতে তিনি বাধ্য হন। বাবাকে সাহায্য করতে বাড়ী থেকে বাটখারা নিয়ে আমাকে বাজারে যেতে হতো। যেদিন বাবা সকালে শহরে গিয়ে সোজা মাছের চালান নিয়ে বাজারে গিয়ে নামতেন, তখন দুপুরের ষাওয়া খেয়ে ঠিক ১টার দিকেই বাজারে রওনা

হয়ে যেতাম। বাজারে তখন আমাদের গ্রাম থেকে সমবয়স্ক আরো অনেকেই যেতো তাদের পিতা পশ্চিম কুলের সামুদ্রিক মৎস্য জীবিকায় ছিলেন বলে। বাজারে পৌঁছে দোকানে বাটখারা রেখে আমরা দল বেঁধে বাজারময় ঘুরে বেড়াতাম; আর এই ঘুরতে গিয়ে কি করতাম জানেন? গুড় হাটা গিয়ে ভিখারীর ছেলের ন্যায় গুড় খুজে খেতাম; পান হাটায় গিয়ে পান এবং সুপারী হাটায় গিয়ে গুড়ো সুপারী খুজে নিয়ে পান সুপারী খেতাম। খুঁজলে যদি কেউ না দিত, ক্রেতার ভান করে দেখতে দেখতে কিছু নিয়ে নিতাম। শুধু তা-ই নহে লোকে বিড়ি খেয়ে ফেলে দেয়া মাত্রই কুড়িয়ে নিজেরা টানতে শুরু করতাম। কী সব অদ্ভুত খেয়াল চেপে যেতো মাথায় তখন ভাবতেই পারিনা। পরিবেশ ঠিক এমনি ভাবে জীবনের স্বরূপ বদলায়।

শৈশবের এই স্মৃতি চারণায় এবার আরেকটু পেছনে ফিরে যাই। খুব সম্ভবতঃ বয়স তখন তিন কি চার এর বেশী হয়নি। মনে পড়ে বড়োদের সাথে গিয়েছিলাম হাটহাজারী বাস স্ট্যান্ডে। বর্তমান যেখানে শতশত বাস দাঁড়িয়ে থাকে তখন তা ছিল পার্শ্বের হিন্দু বাড়ীর ধানী জমি। এ জমিতে সূর্যখোলা বা সিগ্নাছ নামে হিন্দুদের এক ধর্মীয় মেলা প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হতো। একই ধরনের পর পর মেলা হতো আমাদের গ্রামের দক্ষিণে কুমোড় পাড়ায় ও। মেলাটির মর্ম এখনো বোধগম্য নয়। দেখতাম চরকার মতো ঘূর্ণায়মান বড়ো বাঁশের এক মাথায় মুর্তি, অপর মাথায় ব্রাহ্মণ দোলনার মতো বসলে লোকে হৈ হুল্লোড় করে কিছুক্ষণ ঘোঁরাতো আর অসংখ্য মেয়েরা কাঁসার ঘন্টায় হুল্লোধনি দিত। তেমন একটি মেলা দেখতে গিয়েছিলাম জীবনের এই প্রথমবার হাটহাজারী বাস আড্ডায়। হঠাৎ দেখি আমাকে ফেলে অন্যরা কোথায় ঢুকে পড়েছেন। এদিকে ওদিকে কোন দিকেই সাথীদের দেখা না পেয়ে আমি খুঁজতে চেষ্টা করলাম, অমনি হারিয়ে গেলাম। মেলায় তাদের দেখা না পেয়ে ভয় হলো। কি করে কোন পথে বাড়ী ফিরে যাব এ-ই ভয়। উপায় না দেখে কাঁদতে আরম্ভ করলাম। আমার ক্রন্দনে কে জানি শেষ পর্যন্ত খুঁজে বের করে দিলেন বড়োদেরকে। অসহায়ত্বে ভরা মনে তখন কেমন স্বস্তির নিঃশ্বাসটি ফেলেছি, এখনো বুকে যেন তা বাজে।

মেলা, ফুটবল খেলা, বলিখেলা আর গরুর লড়াই এগুলো আমাকে নেশার মতোই যেন পেয়ে বসতো। কৈশোরে কতবার স্কুল পালিয়ে একা একা এসবে ছুটে গেছি তার অন্ড নেই। মেখলের বিল, বোয়ালিয়ার বিল, ফটিকার বিল, হাট হাজারী স্কুলের মাঠ, নাজুল মোরা, নন্দির হাট, মদনা হাট, মাদারশার বিল, ফতেয়াবাদ স্কুল মাঠ, কোথাও কোন মেলা, কোন বলি খেলা বাদ যেতো না। সব চেয়ে বেশি আকর্ষণ ছিল ফুটবল-ও গরুর লড়াইয়ের প্রতি। সেই শৈশবে এমনকি এখনো, যে ব্যক্তি বা দল হেরে যায় তার প্রতিই সবচেয়ে বেশী সমবেদনা ও আকর্ষণ অনুভব করাটা আমার স্বভাব। তবে স্বপক্ষের জয়ে আনন্দে উত্তেজনা অধীর হয়ে লাফালাফি যে করতাম

না তা নয়। কিশোর জীবনের সেই প্রাণ চঞ্চল দিন গুলোর স্মৃতি সত্যই এখনো মনকে কি ভাবেই না নাড়া দেয়।

আমার জীবনে প্রথম সিনেমা দেখার সুযোগ হয়েছিল যখন আমি হাট হাটাজারী পার্বত্য হাইস্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হই। আমাদের গ্রামের সহপাঠী সুভাষা ছিল মায়ের খুবই আদুরে সন্তান এবং অসম্ভব ইচ্ছা পাকা ছেলে। সেই সুভাষা আমাকে ইউনিভারসেল নামক জ্যামিতির বাক্স শহরে অনেক কমদামে পাওয়া যায় এ অজুহাতে, এই প্রথম বারের মতো শহরে নিয়ে গিয়েছিল। শহরে গমন আমার জন্যে প্রথম বার হলেও তার জন্যে ছিল বহু বার। কারণ আদুরে ছেলে যে কোন সময়েই প্রসুতি চিকিৎসক মাদব থেকে টাকা আদায় করতে পারতো। ইচ্ছে মতো বিলাসীতা ও করতে পারতো- যা আমাদের জন্যে ঈর্ষা নয়, দীর্ঘস্থাসের কারণও হতো। শহরে নিয়ে গিয়ে জ্যামিতির পাঁচ টাকার বাক্সই শুধু কেনা হলো না, সে আমাকে রঙ্গম সিনেমায় নিয়ে গিয়ে এক উর্দু ফিল্ম দেখাতে ঢুকালো দশ আনা টিকেটের বিনিময়ে। সেই গা- গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের এক ছাত্র কি করে রঙ্গম সিনেমা হলের মতো এক স্বপ্নবর্তীত প্রেক্ষাগৃহে সেদিন আমাকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যেতে পারলো, তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। আজ যতবারই রঙ্গমের পাশ দিয়ে পাথর ঘাটা বা অন্য কোথাও আমন্ত্রণে যাই, সেই স্মৃতি বরাবরই নাড়া দেয়। পরবর্তীতে যখন আমি S.S.C পাস করার পর ১৯৬৯ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত নাছিরাবাদ বহুমুখি কারিগরি মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে সময় সুযোগে আলমাস খুরশীদ মহল ও সিনেমা প্যালেসে কয়েকবার স্টুডেন্ট কনসেশন টিকেটে আরো কয়েকটা সিনেমা দেখি। সে সময়ে সিনেমা দেখতে গিয়ে আমার জীবনে দু'টি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। তন্মধ্যে রঙ্গম সিনেমায় আরেকবার মাত্র আমার জীবনে সিনেমা দেখার সুযোগ হয়েছিল। আমার জীবনে প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা দেখা মনে হয় সেটাই ছিল শেষ। সিনোমাটি ছিল 'বাহাদুর' নামে এক রঙিন উর্দু ফিল্ম। এক নাটকীয় ঘটনার অবতারণা হলো সেই সিনেমা দেখা- কে কেন্দ্র করে। কত অসংখ্য লোক সেদিন সিনেমা দেখছিল অথচ সাদা পোষাকে এক পাঞ্জাবী মিলিটারী আমাকে অবিকার করে নিল এই অসংখ্যের মাঝে। সিনেমা শেষে প্রেক্ষাগৃহের দরজাতেই পেছন থেকে এক খস্ খসে বিরাট ভারী হাত অনুভব করলাম আমার কাঁধের উপর। পেছন ফিরে তাকাতেই দেখলাম এই সেই ব্যক্তি যিনি আমাদেরকে নতুন পাড়া কেন্টনমেন্টে আটক করেছিলেন। কেন? ধর্ম ঘট্টের কারণে পলিটেকনিকের ক্লাশ বন্ধ হয়ে গেলে সকাল ১০ টার গাড়ীতে বাড়ী ফিরছিলাম। নতুন পাড়া কেন্টনমেন্ট স্টেশনে পৌঁছতেই সাধী কয়েকজন প্রস্তাব করে বসলো চল নেমে পড়ি কেন্টনমেন্টে একটি সিনেমা হল আছে, সেখানেই সিনেমা দেখব। যেই বলা সেই কাজ। ধর্ম ঘটে, ধর্মঘটে অচল শিক্ষাজনের সুযোগে মুসলিম ইনিষ্টিটিউটের পাবলিক লাইব্রেরী সহ নানা স্থান হতে গল্প- উপন্যাস, ডিটেকটিভ সিরিজ পড়ছিলাম প্রচুর। ফলে হৃদয় রাজ্য রোমন- এর

রঙিন ফানুসে উড়ছিল তখন। ভূতের মতো পেয়ে বসেছিল নীহার রঞ্জন রায়ের ‘মাধবী ভিলা’ নামক উপন্যাসের ইঞ্জিনিয়ার নায়কটি। আমিও তো ইঞ্জিনিয়ার হতে যচ্ছি। অতএব, ‘মাধবীর’ মতো কোন পশ্চিমা সুন্দরী তনয়া যদি নাটকীয় ভাবে আমার প্রেমে পড়ে যায়; এমন একটি ভাবের আবীরে হঠাৎ করে উথলা হয়ে উঠলাম কেটনমেটে এক সুন্দরী পাঞ্জাবী কিশোরীকে দেখে। তার দৃষ্টি আকর্ষণে জোরে জোরে ইংরেজী আর উর্দু শব্দ উচ্চারণ করছিলাম। Restricted Area- তে আমাদের এই আচরণ অপরাধে দাঁড়িয়ে ছিল তাই পেছন থেকে দৌড়ে এসে এই ভদ্রলোক আটক করে সাবধান করে দিয়েছিলেন আমাদেরকে। আর আজকে তিনি এত স্নেহ ভরে আমারই কাঁধে হাত দিলেন, কিছু খাওয়ালেন, সিনেমা কেমন লাগলো জিজ্ঞেস করলেন, একই সাথে গাড়ীতে করে নতুন পাড়া অবধি নিয়ে গেলেন, ব্যারাকে যাওয়ার অনুরোধ করলেন। একদিনে এত অভাবনীয় ঘটনা সত্যি আমাকে একদিকে ভীত, অন্যদিকে উপন্যাসের নায়কের প্রায় কাছাকাছিই পৌঁছে দিয়েছিল।

সিনেমা দেখার কথা যখন এসেই গেল তখন আমার পলিটেকনিক ছাত্র জীবনে সিনেমা দেখাকে কেন্দ্র করে অন্য এক ঘটনার কথা না বললেই নয়। ঘটনাটি সত্তর সালেই হবে। দেশব্যাপী ছাত্র ও রাজনৈতিক আন্দোলনে পাকিস্তান সরকারের অস্থিভূত তখন টলায়মান। ঠিক এ সময়ে কক্সবাজারের রামু রামকোট বনাশ্রমের অধ্যক্ষ ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরো আমাদের জোবরা গ্রামবাসী তাঁর শিষ্য সারমিত্র শ্রমণ (বর্তমানে ডঃ পিন্টু মুৎসুদ্দি) সহ এক ট্রাঙ্ক বই নিয়ে জোবরা সুগত বিহারে উপস্থিত হলেন। এই ভদন্ত জোবরার গুণালঙ্কার মহাস্থবিরের শিষ্য এবং জ্ঞাতী ও বটে। মহাস্থবিরের মহাপ্রয়াণের পর তিনি তাঁর উপাধ্যায় গুরু লাকসামের পূর্ণানন্দ মহাথেরোর নির্দেশে এক কি দুই বর্ষা জোবরা বিহারে অবস্থান কালে আমার সাথে বিশেষ সম্পর্ক ঘটে। সে অনেক কথা বলার আছে। বর্তমান ঘটনার কথাই আগে শেষ করি। বহু বছর পর এই সাক্ষাত লাভ হলেও, পূর্বের সম্পর্ক ম্লান হয়নি। ভদন্ত মহোদয় উপস্থিত হওয়ার পরের দিন, সকালে দেখলাম শিষ্য সারমিত্র শ্রমণ বিহার থেকে উদাও হয়ে গেছে কিছু না বলেই। এতে ট্রাঙ্কটা নিয়ে তিনি বিপাকে পড়লেন। আমার ক্লাশ তখন বন্ধ ছিল, টেকনিকলে ধর্মঘটের কারণে। অতএব আমাকেই সাথে নিলেন ট্রাঙ্কটি রামকোটে পৌঁছে দেয়ার জন্যে। জীবনে কোনদিন ঐ অঞ্চলে যাইনি। নতুন পথ, নতুন স্থানের প্রতি আমার আকর্ষণ চিরকালের। তাই রোমঞ্চ অনুভব করছিলাম বারং বার এ ভ্রমণের কথা মনে করে। জোবরা হতে রওনা দিয়ে প্রথমে তিনি উঠলেন চট্টগ্রাম বৌদ্ধ মন্দিরে। অথচ কথা ছিল সোজা চলে যাবেন রামকোটে। যা-ই হউক, পরবর্তী রাত কাটাতে হবে বিহারটিতে আমাকেও। রাতে ভাত খাওয়ার জন্যে তিনি আমার হাতে খাওয়া খরচ দিলেন। আমি খাওয়ার পরে চিন্তা করলাম একটু সিনেমা দেখি। সিনেমাপ্যালাসে ঢুকলাম। কিন্তু হিসেব করে দেখিনি রাতের কয়টায় সেখান থেকে বের হবো। সিনেমাটার নাম মনে নেই। যখন

বেরুলাম তখন রাত প্রায় বারোটা। রাস্তা জন- মানব শূন্য। বুদ্ধ মন্দিরের প্রধান ফটকে এসে দেখি তালা ঝুলছে। নাইট গার্ড যে নেই তা জানি। প্রাচীর টপ্কে ভেতরে ঢুকলাম। উপরের হল ঘরের বারান্দায় উঠে অনেক চেষ্টা করলাম কেউ দরজা খুলে দিলনা। শীতের রাত পরণে কেবলমাত্র একটি লুঙ্গি, শাট ও গেঞ্জি। কি করে বাইরে রাত কাটাবো খুবই চিন্তায় পড়ে গেলাম। মনে মনে রামকোট অধ্যাক্ষে প্রতি স্মৃদ্ধ হয়ে উঠলাম- কেন তিনি - আমি যে বাইরে আছি তার জন্যে সজাগ রইলেন না। উপর থেকে নীচের হল ঘরের বারান্দায় গেলাম, অন্ততঃ কাউকে জাগিয়ে ভেতরে ঢুকা যায় কিনা দেখতে। একটি মাত্র জানালা খোলা পেলাম। উকিমেরে দেখলাম কিছুলোক শুয়ে আছে। অনেক ডাকার পর একজন কথা বললেন। কিন্তু জানালেন যে, এতরাতে দরজা খুলে দিতে নিষেধ আছে। অনেক বুঝিয়ে বললাম। তবুও নারাজ। তা- হলে উপায়। রাগে অভিমানে, সিনেমার খায়েসের জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে সিঁড়ির তলায় খুপরিকে হিমেল বাতাসের ঝাঁপটা থেকে অনেকটা নিরাপদ মনে করলাম। সেখানে গুঁটি সুটি মোর কিছুক্ষণ বসতে গিয়ে মশার কামড় এবং কুকুরের গন্ধে অসহ্য বোধ করলাম। সেদিন কোন ভাগ্য দেবতা বলেছিল জানি না, যাকে আজ এই বিহারের সিঁড়ির তলায় আশ্রয় নিতে হলো; সে-ই একদিন প্রজ্ঞাবংশ ভিক্ষু হয়ে বিহারটির পরিচালনার দায়িত্ব নেবে; এর মান ইজ্জত রক্ষা করবে। আবার উঠে খোলা জানালার পশে এলাম। অনেক অনুন্নয় করে ডাকলাম। এবার কিন্তু কারো সাড়া নেই। বুঝতে পারলাম ইচ্ছাকৃত ভাবেই নীরব। জেদ চেপে গেল মনে। একটি ফুল গাছের লম্বা ঢাল ভেঙ্গে আনলাম। বললাম আমাকে যদি ঘুমোতে না দেন তা হলে আজ সারা রাত আপনাদের ঘুমকেও হারাম করে দেবো। এই বলে গাছের ঢালটা দিয়ে গুঁথোতে গুরু করলাম। যেমনি গুরু তেমনি কাজ। লোকটা বিরক্তি সহকারে এবার দরজা খুললেন। আমার অবস্থা দেখে, কোণেতে একটা ধুলোয় ভরা বড় বড় ছেদাওয়ালা ঘোড়া কম্বল দিলেন। পায়ের জুতোদ্বয়কে বালিশ এবং ঘোড়া কম্বলকে আর্শীবাদ মনে করে গোল করে সারাগায়ে জড়িয়ে নিলাম। ধুলো ও ছিদ্র গুলোর জন্যে কিছুক্ষণ অস্বস্তি লাগলেও অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় অচেতন হয়ে গেলাম। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনের আগুন দ্বিগুণ হয়ে উঠলো। সোজা উপরে গিয়ে রামাকেট অধ্যাক্ষ মহোদয়কে বললাম আপনি থাকেন, আমি বাড়ী চলে যাচ্ছি। তিনি বললেন আজকের প্রাতঃরাশের পরেই রওনা দেব। তাতে শান্ত হলাম। বললেন আমার সাথে এক বাসায় চলো প্রাতঃরাশটা সেরে আসি। যাওয়ার সময় দেখলাম চট্টগ্রাম বিহারের দ্বিতীয় প্রধান ভিক্ষু ভদন্ত শীলাচার শাস্ত্রী মহোদয়ের সাথেই যাওয়া হচ্ছে। বিহারের পাশেই ছিল সেই খাওয়ার ব্যবস্থা। জানতে পারলাম বাড়ীর কর্তার নাম মুকুন্দ বাবু, যিনি ভগ্নদেবের স্বাগত জানালেন। রুটি, সব্জী ও চা এ দিয়েই প্রাতঃরাশ। মনে করেছিলাম পরে ভাত আসবে। চা টা মুখে দিয়ে তেতো লাগতে

আর খেলাম না। এতে শাস্ত্রী মহোদয় আমাকে ভণ্ডের সেবক মনে করে ক্ষিপ্ত হয়ে এমন কিছু বললেন- যা আমার অভিমানে দারুণ আঘাত করলো। নীরবে হজম করা ছাড়া উপায় ছিল না। রামকোট অধ্যক্ষ খুব সম্ভবতঃ মধ্যাহ্ন ভোজের পরেই আমাকে নিয়ে রওনা দিলেন। সন্ধ্যার আলো আঁধারিতে বনাশ্রমে গিয়ে পৌঁছলুম। ছায়া সুনীবিড় শান্তির নীড়ে স্মিত হাস্যোজ্বল প্রশান্ত বুদ্ধ বিষয়টি প্রথম দর্শনেই মন কেড়ে নিয়েছিল, যদিও শৈশবের সেই প্রাগাঢ় ভক্তি ঐ দিন ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ধর্ম সম্পর্কেও তেমন আগ্রহ ছিলনা তখন, সমাজ তান্ত্রিক মগজ ধোলাইয়ের আর্শীবাদে। রামকোট বনাশ্রম অধ্যক্ষ বিদর্শনাচার্য ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরো মহোদয়ের কথাই বলছি। তিনি যখন তাঁর প্রয়াতঃ গুরু পরিব্রাজক সঙ্ঘর্ম প্রচারক জঙ্গম তীর্থ ভদন্ত গুণালঙ্কার মহাহুবিরের শবদাহ অনুষ্ঠানে জোবরা সুগত বিহারে উপসম্পদা গ্রহণ করছিলেন সেদিন থেকেই তাঁর স্মৃতি আমার মনের স্থান পায়। পরবর্তীতে যখন জোবরা সুগত বিহারের অধ্যক্ষর দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন তাঁকে ভিত্তি করে আমার শৈশব জীবনের কিছু স্মৃতি আরো গভীরতর হয়েছে। প্রীতিভূষণ চৌধুরী ছিলেন জোবরা গ্রামের শিশু- কিশোর ও যুবকদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চেতনার উদ্দাতা। ভারতে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী স্বরাজি আন্দোলনের সাহসী সৈনিক, সেই কমরেড প্রীতিভূষণ চৌধুরী আমাদেরকে তাঁর সমাজ সেবামূলক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আলোকে পরিচালিত করতেন। গ্রামের রাস্তা মেরামত, নালা-নর্দমার পঁচাজল নিষ্কাশন, রাস্তার পাশে গাছপালা ও ঝোপঝাড় পরিষ্কার, মাজপুকুরের কচুরিপানা, পরিষ্কার ইত্যাদি কাজগুলো সপ্তাহের ছুটির দিনে আমাদের দিয়ে করাতেন। সকাল বেলা এই সংস্কার মূলক কাজগুলো করার পর বিকালে হয় কিছুক্ষণ মাঠে ফুটবল, হা-ডু-ডু, দাড়িবান্ধা ইত্যাদি খেলাতেন অথবা ঘন্টা দিয়ে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বিহারাধ্যক্ষ মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিতর্ক অথবা বিষয় ভিত্তিক বক্তৃতা প্রতিযোগীতার আয়োজন করতেন। এ প্রতিযোগীতার আলোচ্য বিষয় থাকতো সকাল বেলা যে কাজগুলো করা হয়েছে এসবের ভালো- মন্দ, আদর্শ-উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের উপরে। বক্তৃতার মধ্যে আমার পারদর্শীতা সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। সভাপতির আসনে আসীন বিহারাধ্যক্ষ মহোদয়ও ক্রমে আমার প্রতি বিশেষ স্নেহময় আকর্ষণ অনুভব করতে থাকলেন। তাঁর সেবক হিসেবে প্রথমে জগদীশ শ্রামণ নামে নোয়াখালির এক ছেলে, অতঃপর জোবরার মৃদুল (দিল্লীপের ভাই) কে রাখা হয়। কাজের একটু ব্যতিক্রম হলেই ভদন্ত মহোদয় সেবকদেরকে ভীষণ মারতেন। তারা উভয়ে ছিল আমার সমবয়স্ক এবং বন্ধু ভাবাপন্ন। তাদেরকে মারের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে আমি নিজেই পায়খানা- প্রস্রাব ঘরে শৌচের জল দেয়া, বিহার ও প্রাঙ্গন ঝাড়ু দেয়া ইত্যাদি কাজগুলো করে দিতাম প্রায় সময়। তাছাড়াও অধ্যক্ষ মহোদয়, জল চিকিৎসা করতেন পেটের পীড়ার জন্যে। নলকূপে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ নাভিতে জল ঢালতেন তিনি। এত দীর্ঘক্ষণ নলকূপের হাতল দাবানো ছিল

সত্যই কষ্টকর। সে কাজটি খুব ধৈর্য ও শ্রদ্ধা সহকারে আমি প্রায় করে যেতাম। করে আনন্দও পেতাম। এমন আনন্দময় পূণ্য কর্মের প্রতি আমার আকর্ষণ অতি শৈশব থেকেই ছিল প্রবল। সেই শিশুকালে প্রতিদিন ভোরে ওঠে আমাদের বাড়ীর সম্মুখের পুকুর পাড়ের জবা গন্ধারাজ আর শিউলী ফুলের গাছ থেকে ফুল কুড়ানোর প্রতিযোগীতা কেমন পাগল করে তুলতো আমাকে। ঝাঁকি ভরা ফুল নিয়ে পুকুরের ঘাটে বসে কত মনোরম ভাবে ফুল সাজাতাম ফুলের খালায়। একটু বড়ো হয়ে বাড়ীর সীমা অতিক্রম করে প্রতিবেশী বাড়ীর ফুলগুলো পর্যন্ত গাছে থাকতে দিতুম না- তারা ঘুম থেকে ওঠার আগেই। আর ঘুম থেকে ওঠে গাছে ফুল না দেখে কত গালমন্দ শুনতাম তাদের, ইয়ত্তা নেই। ইত্যাদি কারণে ভস্তে মহোদয় ক্রমে আমাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের উৎসাহিত করতে প্রতিদিন নানা উপদেশ, ও গল্পমূলক কথা বলতেন। কেন জানি প্রব্রজ্যার প্রতি আমার আকর্ষণও ইতিমধ্যে বেশ বৃদ্ধি পেলো। আমার সম্মতি পেয়ে একদিন তিনি নিজেই নিয়ে গেলেন আমাকে বাবার কাছে। বললেন আপনার ছেলেটা আমাকে দান করেন। শৈ প্রব্রজ্যা নিতে ইচ্ছুক। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন- এটা কি সত্য? আমি মাথা নাড়িলাম দুরু দুরু বক্ষে। বাবা বললেন, না, এখন নহে তা পরে হবে। আমার একটা আকাঙ্ক্ষা আগে পূরণ করতে দিন ভস্তে। জীবনে বহু চেষ্টা করেছি অশ্রুতঃ একটি ছেলেকে যেন উচ্চ শিক্ষা দিতে পারি। এ যাবত সে আশা আমার পূরণ হল না। এই একটি মাত্র সন্তান যার মেধা আছে, প্রচেষ্টা আছে। তাকে মেট্রিক পাশ করাতে গিয়েলেই পরে দান করবো, এখন নয়। বাবার সেদিনের প্রকাশিত এই বেদনা আমাকে দারুন পীড়িত করেছিল। প্রবল আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়েছিল আমারও বুকে। ঠিক আমার পিসতো ভাই রণধীরদাও এমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন আমার প্রতি। আমি ধন্য, আমি তৃপ্ত যে, তাঁদের জীবদ্দশায় তাঁদের আশা আমি পূরণ করতে পেরেছি; বাংলায় অনার্স সহ এম, এ, পাশ করে। বিহারাধ্যক্ষ মহোদয় এর পর বেগীদিন আর জোবরা বিহারে ছিলেন না। তারপর তিনি কোথায় গেলেন সে খোঁজ রাখার মতো বয়স তখনো হয়নি।

‘রণধীর’- মা-বাবার প্রদত্ত একটি সার্থক নাম। কয়েকটা কন্যা সন্তানের পর মা বাবার একমাত্র পুত্র সন্তান রণধীর। তাঁর মা আমার বাবার বড় বোন। ভাই বোন নিয়ে আমার বাবারা ছিলেন মোট ৮ জন। জগৎবন্ধু, দীনবন্ধু, বিদেশরী, কিনবন্ধু, যতীন্দ্র, বিন্দুলাল, নয়নতারা ও শীলব্রত। বিদেশরী সন্তান ছিলেন রণধীর। চরম দরিদ্রতার সাথে লড়াই করে ধীর স্থির গতিতে এই রণধীর আপন জীবনকে গড়ে ছিলেন তিলে তিলে। শুনেছি তাঁর নিজের মুখেই কৃষি লতি, টেকি শাক, ছড়ার মাছ বিক্রি করে করে তিনি স্কুলের বেতন, পরীক্ষার ফি, বই ক্রয়ের টাকা সংগ্রহ করতেন। প্রাইভেট শিক্ষক নিযুক্তির সৌভাগ্য কোণ দিন তার হয়নি। বাড়ী থেকে ৪/৫ মাইল দূরে মেখল নামক গ্রামে তার ক্লাশের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রটির বাড়ী। তার কাছ থেকে কঠিন বিষয়গুলো শেখার জন্যে সেখানে গিয়েই সারারাত কাটিয়ে

আসতেন। এত চেষ্টা কষ্টের পরও তিনি মেট্রিক পাশ করতে পারেননি তিন তিনটি বার। পরে উপায়হীন হয়ে কুমিল্লায় পুলিশ বিভাগে চাকুরি নিলেন। সামান্য একজন সিপাহী। চাকুরী জীবনের কঠোর শ্রম। তারপরেও ক্ষান্ত হননি তিনি অধ্যয়নে। ক্রমে মেট্রিক; আই,এ, এবং বি,এ, পাশ করলেন। সেই সিপাহী রণধীর ক্রমে দারোগা হলেন। দুঃসাহসিক অভিযানে অসীম সাহসিকতা দেখিয়ে জাতীয় সম্মান 'বীরোত্তম' খেতাব প্রাপ্ত হলেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান হতে। কিন্তু কাল মরণ বেশীদিন সহ্য করলো না রণধীরের জীবন যুদ্ধের এই চরম সাফল্য। অকালে ছিনিয়ে নিল এ বীর অমর সৈনিককে আমাদের কাছ থেকে। অশ্রু সজল নয়নে আজকের এই কাক না ডাকা ভোরে রামগড় মহামুণি বিহারে সে বীরের বীরত্বের গাথা রচে তার ঋণভার কিছু লাঘব করতে চাই।

বাল্যকাল হতে মা তাকে নিয়ে প্রায় বিব্রত অবস্থায় থাকতেন। চরম ডানপিঠ স্বভাবের সম্ভান রণধীর প্রতিদিন কমপক্ষে একবার মার পিঠ করতোই কারো না কারো সাথে। অতএব, যত নালিশ, যত উপদ্রব সব মা-কেই পোহাতে হতো। তার যৌবনে চাকুরে জীবনেও সহকর্মীদের সাথে, এমন কি যৌবনের শেষ প্রান্তেও দেখেছি মারপিটে লিপ্ত হতে। গ্রামের বাল্যকাল হতে মা-তাকে নিয়ে প্রায় বিব্রত অবস্থায় থাকতেন। তার যৌবনে চাকুরে জীবনের সহকর্মীদের সাথে এমন কি গ্রামের বয়স্ক সাথীদের সাথে মার-পিঠ করার নজির বিরল নয়। মোট কথা তার সামনে সামান্যতম অন্যায়, সামান্য নীতি চ্যুতি, প্রতিবাদহীন হয়ে যাবে এমনটি ছিল কল্পনার অতীত। অন্যায়ের প্রতি তাঁর এই আপোষহীনতা তাঁকে অনেক অপ্রীতিকর পরিস্থিতির শিকার করলেও একদিন তাঁকে দান করেছিল এক বিরল সম্মান। পুলিশের ডি, আই, বি,ইনস্পেকটর হিসেবে দায়িত্ব থাকা কালে জীবন বাজি রেখে এক দুর্ধ্ব ডাকতকে ধরে ফেলেছিলেন বঙ্গাকালীন পদ্মা নদীর গভীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই অসম সাহসীকতা ও কর্তব্য নিষ্ঠার পুরস্কার হিসেবে বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কর্তৃক তিনি বীর- উত্তম পদকে ভূষিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের বৌদ্ধ সমাজে তিনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব এযাবত কালের মধ্যে এই গৌরব লাভে। আমার সেই রণধীরদাকে দেখেছি যখনই তিনি ছুটি নিয়ে বাড়ীতে আসতেন অবশ্যই সাথে আনতেন মায়ের জন্যে তাঁর রেশন সঞ্চিৎ চাল ডাল ও তেলের বোঝা। মূহর্তের মধ্যেই বোঝা নামিয়ে ইউনিফর্ম পাল্টায়ে বেরিয়ে পড়তেন গ্রামে। গ্রামের গরীব ঘর গুলোই ছিল তাঁর আকর্ষণ। তারা খেতে পারছে কিনা, ছেলে- মেয়েদেও লেখাপড়া চলছে কিনা- এ গুলোই ছিল তাঁর অনুসন্ধারে বিষয়। বাড়ীতে যতদিন থাকবেন, প্রতিদিন ভোরে আমাদেরকে প্রথমে রাস্তায় সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করায় প্যারাদ করাবে। তারপর সাথে নিয়ে দৌঁড়াবে। ১৯৬৭ সালের দিকে গ্রামের পশ্চিমে রাজবাড়ী টিলায় চট্টলার কৃতি সম্ভান ফজলুলকাদের চৌধুরীর অকৃত্রিম চেষ্টায় পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান

কর্জক ভিত্তি প্রস্তর দান করা হলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের। সেই থেকে রণধীরদার প্রাতঃকালীন দৌড়ের লক্ষ্যস্থল ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ভিত্তি- প্রস্তর স্তম্ভ। থামের মতো লম্বা চাওড়া গৌরদেহী রণধীরদার সাথে আমাদের মতো লিলিপুটদের দৌড় কি সম্ভব? তাই কিছু এগিয়ে গিয়েই তিনি দাঁড়াতেন। উৎসাহ দিতেন আমাদের গতি বাড়াতে। শেষতক পৌঁছে যেতাম সেই স্তম্ভের গোড়ায় সবাই একসাথে। আর পৌঁছেই তিনি জড়িয়ে ধরতেন সেই স্তম্ভকে। চুমুর পর চুমু দিয়ে ভরিয়ে দিতেন শ্বেত প্রস্তর ফলকের সারা দেহ অসীম আবেগে। আমি হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম এই অদ্ভুত দৃশ্য। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক আমাদেরও নিস্তার নেই। সেই ভিত্তি প্রস্তর কে বুকে জড়িয়ে ধরতে হতো, চুমু দিতে হতো। জড়িয়ে ধরা আর চুমু দেয়ার পালা শেষ। এখন কিছু বলা। সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর আবেগে জড়িত কণ্ঠে তখন তিনি আমাদের বলতেন- আমার তো এ জীবনে বিশ্বের এই সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে পড়ার সৌভাগ্য হবে না। তোমরা এমন সৌভাগ্যবান যে, পাশ্চাত্য ভাত খেয়েই পড়তে পারবে। আমি জঙ্গল থেকে শাক সবজী সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে করেই পড়েছি। প্রয়োজনে তোমরাও কি তেমন কষ্ট স্বীকার করে পড়তে পারবে না? বলা পারবে কি পারবে না? আমরা সবাই সমস্বরে বলতাম পারবো পারবো। হায় ভাগ্য! রণধীরদার মতো সেই দরদী, সেই উদার উৎসাহী যদি থাকতো- এই হতভাগ্য দরিদ্র লাঞ্চিত গ্রামে গ্রামে তবেই তো প্রতিটি ঘরের কমপক্ষে একটি করে সন্তান বিশ্ববিদ্যালয়ের দোর গোড়ায় অবশ্যই পৌঁছুতে পারতো।

রণধীর দা ছুটি নিয়ে যেদিন বাড়ী আসেন সেদিন থেকে আমার মনটি সাংঘাতিক ছোট হয়ে যেত। কারণ প্রতিবার ছুটি শেষ করে যাওয়ার সময়ে আমাকে অনেক পড়া পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা মুখস্থ করার জন্যে বইয়ের মধ্যে দাগ দিয়ে যেতেন। সে গুলোর পাঠদান অবশ্যই করতে হবে। এতোদিন পর ব্যতিক্রম ঘটবেই। অতএব, যতদিন বাড়ীতে আছেন প্রতিদিনের জন্যে মারটা যেন আমার জন্যে বরাদ্দ হয়েই থাকছে। ছুটি ভর পিটুনি আর যেদিন চলে যাবে সেদিন কী আদর, কী স্নেহ, কী উৎসাহ। সব দুঃখ বেদনাই তিনি যেন নিজের সাথে করে নিয়ে যেতেন আমার হৃদয় থেকে।

একটি জীবন গড়ে উঠতে কত ভাবে কত জনের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ দানে দানে ভরে তুলতে হয়, তার ইয়ত্তা নেই। কৃতজ্ঞ হৃদয়ের সীমিত স্মৃতির পাতায় সকলের এ দানকে ধরে রাখা সম্ভব না হলে পাঠক আমাকে অকৃতজ্ঞ বলে ভুল বুঝবেন না। শক্তি সামর্থ্য আর সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে তাঁরা সকলের প্রতি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, কেবল তাঁদেরই স্মৃতিচারণে আনা হলো, যাঁদের অবিরাম অবিরত কল্যাণকারী চেতনা আমাকে সিদ্ধ করেছে, যাদের কথা উচ্চারিত না হলে আপন বিবেকের দংশন জ্বালার উপশম হবে না- সেই তাঁদেরই তুলে ধরার প্রয়াস হলো মাত্র।

‘সুভাষ’ ডাক নাম তাঁর মানিক। তিনি আমার কাকাতু ভাই। কাকার পরিবারে বড়ো ছেলে। আমারও বড়ো ভাই। চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট হতে তিনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ডিপ্লোমা নিয়েছিলেন ১৯৬৮ সালে। চরম দারিদ্রতার সাথে সংগ্রাম করে জীবন প্রতিষ্ঠায় এ আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমার লেখাপড়া জীবনের অনেকটা জুড়েই তাঁর ঋণ চিরস্মরণীয়। রণধীরদার চাপে পড়ে নবম শ্রেণীতে যখন বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র হলাম তখন থেকেই মানিকদার একান্ত আশ্রয় আমি লাভ করেছিলাম। সেই থেকে চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে অবস্থান কাল পর্যন্ত আমার বিদ্যার অনন্য আশ্রয় ছিলেন তিনি। অংক, ইলেকট্রিমেথ, পদার্থ বিদ্যা এ তিনটি বিষয়ে আমার যত টুকু সাফল্য সব কিছুর দাবীদার তিনি। তাঁরই আন্তরিক প্রচেষ্টায় অংক শাস্ত্রে ভীতু সেই আমি পরীক্ষার বৈতরণী পার হলাম একে একে। কিন্তু, এ দুসাহ্য সাধন করতে গিয়ে, বদহজমী হজম করতে গিয়ে, বলতে গেলে পুরো জীবনটাই যেন বিকল হয়ে গেলো। এক কালের তীক্ষ্ণ মেধাবী ছাত্র পরবর্তী কালে সব বিষয়েই সাধারণ ছাত্রে পর্যবসিত হলাম। আমার জীবনে একে চরম ট্রাজেডি বলতে হবে। আমার অক্ষর জ্ঞান দাতা শৈশব শিক্ষা গুরু যতীন্দ্র মাষ্টারের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হলো এ ভাবেই। সব মেধা খুঁইয়ে দিয়ে এক সময় নিয়তির অমোঘ বিধানই যেন আমি চিরতরে ত্যাগ করলাম অংকের রাজ্যটি। পরবর্তী (আই, এ,) (বি, এ, অনার্স,) (এম, এ ডবল) সবকিছুই হলো শৈশব শিক্ষাগুরুর ভবিষ্যত বাণীর সফল বাস্তবায়নে।

আমার শৈশব স্মৃতিতে আর একটি নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি ভদন্ত পূর্ণানন্দ মহাস্থবির। কুমিল্লার লাকসাম অঞ্চলে তাঁর জন্ম। গুণালংকার মহাস্থবির যখন সে অঞ্চলের প্রায় হারিয়ে যাওয়া বৌদ্ধ জন গোষ্ঠীকে পুনঃ বৌদ্ধ ধর্মের সূর্যালোকে পরিস্ফুট করার সংগ্রামে লিপ্ত, সে সময়ে বেশ কয়েক জন রত্নোপম সন্তানকে সে অঞ্চল থেকে স্বধর্মে স্থায়ী দীক্ষাদানে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে পরম বিনয়াচারী আলীশ্বরের পূর্ণানন্দ মহাথেরো, বড়ইগাঁও এর পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাথেরো, আগরতলার ডঃ বুদ্ধদত্ত মহাথেরো সহ আরো বেশ কয়েক জনের নাম উল্লেখযোগ্য।

গুরুদেব গুণালংকার মহাস্থবির অসুস্থ হয়ে পড়ার সময় থেকেই গুরুগত প্রাণপ্রিয় শিষ্য পূর্ণানন্দ, গুরুর সান্নিধ্যে জোবরা সুগত বিহারে এসে অবস্থান করছিলেন। গুরুকে প্রাণঢালা সেবায়ত্ত, চিকিৎসা ইত্যাদির পরও যেদিন আর ধরে রাখতে পারলেন না, সেদিন এই প্রবীন শিষ্যটির আকুল আর্তনাদে কারো চোখের জল সংবরণ করা সম্ভব হয়নি। শিষ্য কেমন হলে গুরুকে এমন ভাবে হৃদয়ে ধারণ করা যায়; আর গুরু ও কেমন হলে শিষ্যের হৃদয়কে এতোখানি দ্রবীভূত করতে পারেন, তার পরাকাষ্ঠা ছিলেন এই পূর্ণানন্দ, আর গুরু গুণালংকার।

গুরু শবদেহ যথা গৌরবে সৎকার করার সময়ে তিনি জোবরা গ্রামবাসীকে নিয়ে দশ কি পনের দিন ব্যাপী এক অভূতপূর্ব পরিবাস ব্রতের আয়োজন করেছিলেন। এটি ছিল গুরু গুণালংকার মহাস্থবিরের বহু দিনের স্বপ্নের বাস্তবায়ন। পরিবাস ব্রত সমাপ্তিতে যেদিন দাহ ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে সেদিনের কিছু নৈসর্গিক অলৌকিকতা এখনো আমার হৃদয়কে বিস্ময়াবিষ্ট করে তোলে। ঐ দিনটির আগে প্রতিদিনই শরতের আকাশ থাকতো পরিস্নাত আলোক সমুজ্জ্বল। কিন্তু অনুষ্ঠানের দিন প্রভাতি সূর্যের আলোকচ্ছটা একটু দেখা দিয়েই মুখ লুকালো এমন এক ধরণের মেঘের আড়ালে, যাকে সমগ্র আকাশ ব্যাপী ঘন কুয়াশার আভরণই কেবল বলা যায়। আকাশের এমন অবস্থার কোন পরিবর্তনই হয়নি সারাদিন। কিন্তু শবদাহটি যখন সজ্জিত চিতার উপর তুলে দেওয়া হচ্ছিল, ঠিক তখনই কেবল ঝির ঝির করে আকাশ থেকে এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেল। সকলেই বললেন এটা স্বাভাবিক বৃষ্টি নহে দেবগণের পুষ্প বৃষ্টি।

গণগৌরবে গুরুদেবের দাহক্রিয়া সমাপ্ত করে, গুরুর অসমাপ্ত আর একটি ব্রতে হাত দিলেন পূর্ণানন্দ। এবার গুরুর চির আবাস জ্বরাজীর্ণ সুগত বিহারকে সংস্কার করতে হবে। সুগত বিহার প্রসঙ্গ যখন আসলো তখন একটি বিশেষ কারণে আরো একটু অতীতের দিকে ফিরে যেতে হয়। কবে কখন জোবরাতে বৌদ্ধ এ বসতি গড়ে ওঠেছে জানিনা। পশ্চিমের চন্দ্রনাথ পাহাড়ের কোল ঘেঁসে এই মনোরম পরিবেশটি নাকি এককালে নীচু জলাভূমি ছিল। আরকান সম্রাজ্যের রনতরী বা নানা দেশের বানিজ্য তরী পর্যন্ত ভিড়তে পারতো অনায়াসে এ অঞ্চলে। জল- স্থল উভয় যোগাযোগের সুবিধে থাকায় এ মনোরম অঞ্চলের রাজ বাড়ীয়া টিলাতে আরকান সীমান্ত রাজার রাজ বাড়ী স্থাপিত হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা। বর্তমান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান, সেই রাজবাড়ীর অবস্থান স্থলেই। ভদ্র জ্যোতিঃপাল মহাশয়ের স্বপ্ন বিশ্বশান্তি প্যাগোডার অবস্থান সেই রাজবাড়ীর উপাসনালয় কেয়াং টিলাতেই। জো-ভরা, জোয়ারে ভরাট হতে হতে নীচু জলাভূমিতে যে স্থল ভাগের উদ্ভব হলো কালে তারই নাম জোভরা থেকে জোবরা হয়েছে বলে অনেকে সূত্র সন্ধান করেন। আরকানী এবং বড়ুয়া বৌদ্ধ ও মুসলিম, মাত্র এদু'টি ধর্ম সম্প্রদায়েরই অবস্থান এই গ্রামে। এককালে ছিল শুধু বৌদ্ধরা। ক্রমে পাশ্চাত্য মেখল, ভবানীপুর, ফতেপুর, ফতেয়াবাদ এসব অঞ্চল হতে মুসলিম প্রতিবেশীদের আগমণ ঘটেছে এখানে। জোবরা গ্রামে বহিরাগত বড়ুয়াদের অবস্থান, সংখ্যায় কম নয়। বরঞ্চ আদি বাসিন্দার চেয়ে সংখ্যায় তারাই এখন বেশী। তাই অনেকে হেঁয়ালি করে বলেন, জোড়া লাগতে লাগতেই জোবরা হয়েছে।

সে যা-ই বলুন, জোবরার অতীত কম সমুজ্জ্বল ছিলনা। বিতর্ক থাকলেও বলা যায়, বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত মধ্যযুগীয় মহাকবি আলাওলের নামে খনিত প্রাচীন দিঘীর অস্থি ধারণকারী এই গ্রামে বৌদ্ধ সমাজের প্রাচ্যস্মরণী মহাসাধক গোবিন্দ ঠাকুর,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন সংস্কৃত ও পালি, শিক্ষাবোর্ড হতে প্রথম বিনয় বিশারদ উপাধি লাভকারী ভিক্ষু মুনিন্দ্র প্রিয়, এবং প্রখ্যাত ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক বাগ্মী প্রবর উপ সংঘরাজ গুণালংকার, বৌদ্ধ সমাজের প্রথম জাতীয় সম্মান 'বীরোত্তম' খেতাব লাভকারী ওসি রণধীর বড়ুয়া, প্রমুখ আরো অনেক কীর্তিমান সন্তান প্রসবিনী এই জোবরা গ্রাম। গ্রামটিতে পূর্বে গোষ্ঠী ভিত্তিক অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহার ছিল। জোবরার সু- সন্তান আমার ঠাকুরদার ছোট ভাই। ভিক্ষু মুনিন্দ্র প্রিয়ের উদ্যোগ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গোষ্ঠী ভিত্তিক বিহার গুলো লুপ্ত করে জোবরা সুগত বিহার নামে সার্বজনীন বিহারটি জন্ম লাভ করে। জোবরার কীর্তিমান সন্তান হরগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয় এই সার্বজনীন বিহারের জন্যে ভূমিদান করেছিলেন। ভিক্ষু মুনিন্দ্র প্রিয়ের শ্রামণ্য শিষ্য গুণালংকার। তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য পূর্ণানন্দ সেই বিহারটি সংস্কারে এবারে মনোনিবেশ করলেন। তিনি গ্রামের প্রতিটি পরিবারে একটি করে মুষ্টি চালের পাত্র দিলেন। উপদেশ হলো প্রতিদিন দু' বেলা ভাতের চাল ধোয়ার আগে প্রতিবারে একমুষ্টি করে চাল বিহার নির্মাণের জন্যে ধর্মোদ্দেশ্যে যেন দান করা হয়। এ দান সংগ্রহের জন্যে তার সে- কি শ্রম। রাতের গভীর পর্যন্ত তিনি কমিটির সভ্যদের নিয়ে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে পাড়াময় ঘুরে ঘুরে, চাল গুলো সংগ্রহ করতেন। তাঁর এ সাধনা যেন স্বীয় গুরুরই অনুকৃতি। যে গুণালংকার একদা ত্রিপুরার সেই লাকসাম অঞ্চলের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে জাগরণীর বার্তা শোনাতে, অধর্মের আবরণে ঘুমন্ত জনতাকে; আজ তাঁরই শিষ্য পূর্ণানন্দ ও ঘুরছেন গুরুর জন্ম স্থানের অচেতনকে সচেতনের প্রয়াসে। অপূর্ব ঋণস্বীকারের কতই না মনোরম এ দৃশ্য। ভদ্র পূর্ণানন্দ সফল হয়েছিলেন এ সাধনায়। মাটির বিহার, মাটির থামযুক্ত হলঘরকে তিনি পাকা পিলারও পাকা মন্দিরে রূপ দিতে পেরেছিলেন।

কৈশোরকে ছাড়িয়ে যৌবনে পদার্পনে উন্মুখ যুগসন্ধির এ কালটি জীবনে সত্যিই এক সংকটময় অধ্যায়। জীবনের প্রবল উদ্দাম গতি তখন সকল ক্ষেত্রে অবাধ্যতাকেই প্রশ্রয় দেয়। ভালো- মন্দ, বিচার- বিবেক এ সবকে তখন, অক্ষম বুড়োদের নীতির বন্ধন বলে উড়ায়ে দিতে চায়। পনেরো থেকে উনিশ সময় টা তাই এক প্রকার বিপদ সঙ্কুল ক্ষণই বলা চলে। তাই অভিভাবক ও গুডানুধ্যায়ীদের খুবই সতর্ক থাকতে হয় নিজের অবুঝ প্রিয় স্বজনদের সম্যক পথে পরিচালনার জন্যে। অন্যথায় ঘটে যায় সমূহ বিপর্যয়। আমি নিজের জীবনালোকেই উপলব্ধি করছি এই উদ্দাম সময়ে কিশোর-যুব মনটি কিনা করতে পারে। তখন সমবয়স্কদের সান্নিধ্য লাভে মন থাকে সার্বক্ষণিক উচাটনের মধ্যে। পারস্পরিক সান্নিধ্যক্ষেণে প্রায়ই ভাব বিনিময় হয় জৈবিক তাড়নাত্মক সংলাপে। কামপ্রবৃত্তি জাত হাসি, ঠাট্টা- তামসা গুলোর চর্চাই হয় তখন সবচেয়ে বেশী। পরিকল্পনা হয় কামচেতনা চরিতার্থ করণে, অথবা অন্যের ক্ষতিকরে আমোদ উল্লাস উপভোগে। ছেলে-মেয়েদের মুখে এ সময়ে প্রায়ই শুনতে পাওয়া যাবে, এ সময়ে যদি আমোদ- উল্লাস না করি, তবে কি বুড়ো হলেই করবো?

এখন আমার ধর্ম- কর্ম করার সময় নয়। দম সংযম এ গুলো বুড়োদেরই মানায়। খাও দাও ফুটি করো- এই তো জীবন। এ যৌবন উপভোগ করতে না পারলে জীবনটাইতো মাটি; ইত্যাদি আরো কত কিছুইনা শুনতে পাবেন সন্তানদের মুখে, যৌবনের এই সন্ধিক্ষণে।

আমরা তিন বন্ধু বিকেলে বসেছি এক পুকুর পাড়ে। এক বন্ধু বলে যাচ্ছে কি ভাবে এক মেয়ে তাকে প্রেম নিবেদন করে তার বোনের মাধ্যমে চিঠি পাঠিয়েছে। এবং সে খুবই ইচ্ছুক আমরা বাকী দু'জন তাদের উভয়ের প্রেমাভিসার দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করি। তার এ ইচ্ছা পূরণে আমরা কত সক্ষ্য কতদিন নষ্ট করেছি সে হিসাব কে রাখে। শুধু কি তাই? আমি নিজেও ইচ্ছা করেছিলাম কোন মেয়ে আমাকেও তেমন ভাবে গোপনে প্রেম নিবেদন করুক। এ বয়-সন্ধিতে ইচ্ছা এ ভাবেই সংক্রমিত হয় সেটা ভালো হউক বা মন্দ হউক।

আমরা আর একদিন শীতের বিকেলে স্থির করলাম আজকের রাতে মাঠের মাঝে খেজুরের রস দিয়ে মিষ্টান্ন করে খাবো। সকলে যার যার বাড়ী থেকে কিছু কিছু চাল নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে নির্ধারিত সময়ে হাজির হলাম। পয়সা খরচ করে নারকেল, বাদাম ও সংগ্রহ করলাম। রাত গভীর হলো। চার পাঁচ বন্ধু চলে গেলাম মাঠের মাঝে। খেজুর গাছ গুলো হতে কলসী গুলো নামানো হলো। সব রস একত্রিত করে, বড়ো ডেক্সিতে করে উনুনে তুলে দেয়া হলো। শিমলতা বেড়ে ওঠার খুঁটি গুলো ভেঙ্গে নিয়ে জ্বালানির কাজে লাগানো হলো। আর খালি কলসী গুলোতে কেউ বলে জল ভর্তি করে তুলে দেয়, কেউ বলে প্রস্রাব করে তুলে দেয়, শালারা টের পাবেনা। শেষতক খালি কলসীই আবার যথাস্থানে বসিয়ে দেয়া হলো। সিমের লতা নষ্ট করে, খেজুরের রস চুরি করে, সেদিন আমরা খেজুর রসে মিষ্টান্ন ভোজে কি কম আনন্দ- ও তৃপ্তি উপভোগ করেছি? হয়তো আপনারাও অনেকেই আমাদের সাথে একমত পোষণ করে বলবেন, ঠিক আছে; তাতে আর কী-বা ক্ষতি হলো? ছেলে বয়সে এসব দুষ্টমি ভরা আনন্দ উল্লাস না করলে কি মানায়? এমন হালকা ঘটনা হয়তো ধর্তব্যের মধ্যে আসে না। সহজেই উপেক্ষা করা যায়। কিন্তু, যখন আপনার ছেলে ঠিক এই বয়সে এমন সব বন্ধুর সান্নিধ্য পেল, যে বন্ধুরা মাদক দ্রব্য সেবনে, ডাকাতি, হাইজ্যাকিং বা সন্ত্রাসী কাজ কর্মে বিশেষ উৎসাহী, তখন কি করে আপন সন্তানকে সামাল দেবেন? এ জন্যেই অভিভাবকগণকে এ সময়ে আগে ভাগে সাবধান হওয়ার প্রয়োজন আছে। সময়ের মাপকাঠি দিয়ে সন্তানকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন আছে। সন্তানের হাব-ভাব, চাল- চলন, সঙ্গীদের স্বভাব চরিত্রের উপর করা নজর রাখা সবিশেষ দায়িত্ব আছে গুরুজনদের।

আমার দীপাল নামে আর এক বন্ধু উৎসাহ দিল চলো খুব ভোরে উঠে মাঠে গিয়ে ব্যায়াম করি। যেই প্রস্তার সেই শুরু। বস্ত্তঃ এ বয়সে কখনো কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বিলম্ব মোটেই সয়না। উভয়ে বেশ কিছু দিন খুব ভোরে উঠে মাঠের দিকে

মারতাম দৌড়। ধানের খালি বীজতলা গুলোতে দাঁড়িয়ে বুকডন, উঠাবসা, ইত্যাদি নানা পদ্ধতির কসরৎ করতাম। মাঝে মাঝে একজন অন্যজনকে কাঁধে নিয়ে দৌড়তাম। আর একদিন প্রস্তাব দিল, চলো আমরা বিহারের তালগাছ হতে চুরি করে কঁচি তাল খাই। বলা মাত্রই কাজ। মধ্যাহ্ন ভোজের পর তরুন বিহারাধক্ষ মহোদয় দিবান্দিয়ায় চলে পড়েছেন। সেই সুযোগে কঁচি তাল ঝুড়ি সুদ্ধ কেটে নিয়ে তিন বন্ধু উল্লাস করে খাচ্ছি। খেতে খেতেই এক জনের দৃষ্টি পড়লো বিহারের পেছনের বাড়ীটির কাঁঠাল গাছে পাকা কাঁঠাল কাঠবিড়ালী খাচ্ছে। গুটা নিয়ে আসা হউক। যেই বলা সেই কাজ। আমি উঠে গেলাম গাছে। একজন কাঁঠাল ধরতে নীচে। অন্যে লক্ষ্য রাখছে গৃহস্থের উপর। কিন্তু, নীচের জন কাঁঠাল ধরতে না পারায় দুম্ করে মাটিতে আওয়াজ করলো। গৃহস্থ টের পেয়ে ধেয়ে আসলো। তারা দু'জন পালালো। কিন্তু আমি ধরা পড়ে গেলাম। হাতে নাতে এমন ধরা পড়াতে সে- কি লজ্জা। সেদিন প্রতিজ্ঞা করেই ত্যাগ করলাম এমন কাজ আর কখনো জীবনে করবো না। একদিন বন্ধুটি প্রস্তাব করলো, চলো আমরা কয়েক জন মিলে একটি সঙ্ঘ তহবিল গঠন করি। এ তহবিলের টাকা লোন খাটিয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই দ্বিগুণ করে ফেলতে পারবো। যেমন প্রস্তাব তেমন কাজ। আমরা মিটিং করলাম সম মনাদের নিয়ে। সপ্তাহিক চাঁদা নির্ধারণ করলাম। তহবিলের নাম দিলাম “সুহৃদ তহবিল”। আমার পূর্ব সঙ্ঘিত টাকা প্রায় সত্তরটি ক্রমে সেই তহবিলে চলে গেল। বস্তুতঃ চাঁদা কে কত দিল আমার জানা নেই। দেখলাম তহবিল কমল বন্ধক নিয়েও লোন দিচ্ছে, ঘটি বাটি বন্ধক নিয়েও লোন দিচ্ছে। আমার বন্ধুটি তার পরীক্ষার ফি এবং স্কুলের বকেয়া বেতন আদায়ের জন্যেও লোন গ্রহণ করলো। এবং যথারীতি এস,এস, সি পাশ করে চট্টগ্রাম মহসীন কলেজে আই, এস, সি তে ভর্তি হয়ে গেল। ইতি মধ্যেই একান্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। আমরা কে কোথায় পালিয়ে গেলাম। জীবনের পট আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল অনেকেরই। সেই সুহৃদ তহবিলের কোন সন্ধান নেয়ার সুযোগ আমার জীবনে আর হলো না। তবে পরম আনন্দ উপভোগ করি যখন দেখতে পাই সেই প্রস্তাবকারী বন্ধুটি এখন বিশ্বখ্যাত গ্রামীণ ব্যাংক এর সর্বোচ্চ কর্তাদের অন্যতম।

এ জীবন তরী, সময়ের ব্যবধানে আপনার প্রয়োজনে কোন ঘাটে যায়, কোন ঘাটে ভিড়ে উদ্দেশ্য তার নাই। শৈশব কৈশোরের পেরিয়ে এলাম একটানা একধাঁছে আজন্ম লালিত জন্মভূমি গ্রামে। যৌবনের উষালগ্নে সেই ১৯৭০ সালে টুকে পড়লাম জাতীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে। কৈশোর থেকেই সমাজ চেতনার আলোকে বিশ্ব রাজনীতির ধারণা জন্মে ছিল অস্পষ্টরূপে। গ্রামের খেটে- খাওয়া মাতা- পিতাদের সন্তান হিসেবে, শোষিতের স্বপক্ষে যারা কথা বলে তাদের দলেই ভিড়ে গেলাম জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে। আমাদের মাওপন্থী রাজনৈতিক সংগঠনকে সমাজ তত্ত্ব বিশ্বাসী কোন কোন সংগঠন ও অতিবিপ্লবী অথবা উগ্রপন্থী বলে আখ্যায়িত করতো।

আমরা তাদের আখ্যায়িত করতাম সংশোধন বাদী অথবা সামাজিক সম্রাজবাদী বলে। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে এর ঢেউ লাগছিল সব চেয়ে বেশী। ঘন ঘন আন্দোলনের ডাক, ঘন ঘন ধর্মঘট আর রাজনৈতিক সংগঠন গুলোর ক্রমবর্ধমান সাংগঠনিক তৎপরতা, ইত্যাদির চাপে লেখাপড়া সিকেয় উঠে গেছে বললেই চলে। চিটাগাং পলিটেকনিকে দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় তখনো রাজনীতির ভিত্তি গড়ে ওঠেনি। তবে ডিপ্লোমা কোর্স সমাপ্তির পর সরাসরি বি,এস,সি, ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তির সুযোগ লাভের আন্দোলনে তখন খুব ঘন ঘন ধর্মঘট চলছিল সেখানেও। এতে সেশন জট সাংঘাতিক রূপ নিল। লেখা- পড়ার এই অনিশ্চয়তার মুখে একবার আমি পাকিস্তান এয়ার ফোর্সে ভর্তি হওয়ার পরীক্ষা দিলাম। নন্টেকনিকেল এয়ারম্যান হিসেবে রিক্রুটমেন্ট পেলাম। পশ্চিম পাকিস্তানের পেশোয়ারে ট্রেনিং এ যাওয়ার নির্ধারিত ফ্লাইট এর উল্লেখ সহ রিক্রুটমেন্ট লেটারটি এমন সময়ে আমার হাতে এলো যে, প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির কোন সময়ই ছিলনা তখন। এই পোস্টাল বিলম্ব আর আমাকে এয়ার ফোর্সে যেতে দিলনা।

তখন ১৯৭০ সাল। গণভোটে বিজয়ী আওয়ামীলীগকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক চক্রের গড়িমসীর প্রতিবাদে দেশব্যাপী মুক্তি আন্দোলনের তখন গণ জোয়ার। ছাত্র আন্দোলনের চাপে পড়ে শেষ মুজিব তথা আওয়ামী লীগের ছয় দফা আন্দোলন, ছাত্রদের এগার দফা আন্দোলনের সাথে একাকার হয়ে গেল। অনিবার্য ভাবেই জাতীয় নেতৃত্বের হাল ধরার জন্যে শেষ মুজিবকে ঢাকায় রেসকোর্সের ময়দানে জাতিকে স্বাধীনতার আন্দোলনে ডাক দিতে হল। এ গণ জোয়ারকে স্তব্ধ করতে গিয়ে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী হত্যা আর পোড়ামাটি নীতির গ্রহণ করলো। সঠিক সময়ে দলমত নির্বিশেষে তাঁর এই একাত্মতা শেখমুজিবকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর অধিতীয় গৌরব দান করলো। বিদ্রোহী হয়ে উঠলো পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনী এবং সেনাবাহিনীর বাঙালী জোয়ানরাও। আক্রমণ পালাটা আক্রমণ চলা কালে চট্টগ্রাম সেনানিবাসকে তাক্ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান নিয়েছিল ই, পি, আর- বাহিনী। আমরা দল বেঁধে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে ঘুরে তাদের জন্যে রসদ সংগ্রহ করতাম। এ বাহিনীর অ্যারলেন্স স্টেশন ছিল আমাদের গ্রামে। তারা গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্রের একটি ষ্টক আমাদের গ্রামে গড়তে চাইলে স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতাদের নিকট গ্রামবাসী আবেদন করলেন- এই ছোট সংখ্যালঘু বড়ুয়া পাড়াটির ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্যে গোলা বারুদের এমন ষ্টক পার্শ্ববর্তী অন্য কোন স্থানে করা হউক। অসহায় নিরীহ গ্রামবাসীর এ আবেদনে নেতৃবর্গ পাকিস্তানী গব্ব আবিষ্কার করে অকথ্য গাল- মন্দ করলেন। সাথে সাথে স্থানীয় কর্মীদের দিয়ে একশ্রকার জোরপূর্বক কয়েকটা ঘরে গোলা বারুদের ষ্টক গড়ে তুললেন। চট্টগ্রাম কেন্টনমেন্ট হতে পাঞ্জাবী সেনাবাহিনী যখন সাজোয়া বহর নিয়ে

রাস্তার দু' পাশের সমস্ত গ্রাম বাজার গানপাউডার দিয়ে জ্বালায়ে পোড়িয়ে আলাওল দিঘীর সন্নিকটে এসে গেল, তখন ই, পি, আর- বাহিনী শুধু হাতিয়ার নহে ইউনিফর্ম পর্যন্ত ত্যাগ করে এক কাপড়েই পালাতে শুরু করলেন। অথচ, নিরীহ গ্রামবাসীদের কিছুতেই গ্রাম ছেড়ে পালাতে দিলেন না। এই দেশ প্রেমিকেরা আমাদেরকে আত্মরক্ষার নূন্যতম সুযোগ থেকে বঞ্চিত শুধু করেনি, অ্যারলেন সহ সমস্ত গোলাবারুদ আর অস্ত্রশস্ত্রের স্তূপ গরীব মুর্থ গ্রামবাসীর বিপর্যয়কে ত্বরান্বিত করতে ফেলে গেল। আমার বাবা-মা, আমরা ভাই- বোনদেরকে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে ঘরের বের করে দিলেন জীবনকে বাজি রেখে। তারা ঘরে থেকে গেলেন। আমরা বহু কষ্টে আমরা কমলাদির শ্বশুরবাড়ী আব্দুল্লাপুর গিয়ে আশ্রয় নিলাম। জীবন সংশয় মুহূর্তে বিপদ কালে সেই মাস কাল আশ্রয় চির কৃতজ্ঞতার সাথেই স্মরণীয়। কিন্তু মা-বাবার জীবন শংকায় ছট্ পট্ করছিলাম সারাশ্রম। দিন কয় গত করে পাহাড়ের কোল ঘেঁসে অতি ভয়ে ভয়ে ক্রমে গ্রামে উপস্থিত হলাম আমিও ভাগিনা বাবুল। আমার পিসতুত্ বোনের একমাত্র ছেলে এই বাবুল। কিন্তু হতবাক হয়েগেছি গ্রামের অস্বাভাবিক নীরব নিস্তব্ধতায়। এমন দিনের বেলায়তেও গ্রামের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গা চন্‌চন্‌ করে উঠছিল। বাড়ীতে উপস্থিত হলাম চুপি চুপি। মা ঘরে আছেন। বাবা কি কাজে বাইরে গেছেন। বুকে জড়িয়ে কাঁদতে শুরু করলেন মা। ভালো- মন্দ খবরা খবর নিলাম। জানতে পারলাম- গ্রামের বুড়োরা বহু কষ্টে রাতের অন্ধকারে সব গুলো অস্ত্র- সস্ত্র গোলা বারুদ মাঠের মাঝ খানে বিভিন্ন পুকুরে ফেলে দিয়েছেন পাক সেনারা গ্রামে প্রবেশের আগেই। যারা এতদিন আওয়ামী লীগের কর্মী ছিল, যারা নিজেরা কাঁধে করে ওসব গোলাবারুদ গ্রামে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, এখন তারই স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে বলে দিয়েছে- বড়ুয়া পাড়ায় অনেক গোলাবারুদ আর অস্ত্র আছে। পাকিস্তানের স্পীকার একে এম, ফজলুল কাদের চৌধুরীর নিকট আত্মীয় ঘোর মুসলিম লীগ সমর্থক সেই চেয়ারম্যান পাঞ্জাবী সেনাবাহিনী নিয়ে গ্রামে হানা দিয়েছিল। অস্ত্র- সস্ত্রের খোঁজে গ্রাম তন্ন তন্ন করেছে। কোন নিশানা না পেয়ে গ্রামের সকল বুড়োদের লাইন করে গুলি করার জন্যে দাঁড় করিয়েছে। জোয়ান এক জনও নেই। সবাই মৃত্যু পথযাত্রীর দল। পাঞ্জাবীদের দয়া হয়েছে, গুলি করেনি। পাঞ্জাবীরা ক্ষমা করেছে, কিন্তু ক্ষমা করেনি প্রতিবেশীরা। তারা প্রথমে লুট পাট্ পরে আগুন দিয়ে বড়ুয়া পাড়াটা উচ্ছেদ করে দেবে এই পরিকল্পনা করেছে। পঙ্গ পালের মতো ছেলে- যুবক- প্রবীণ সবাই বড়ুয়া পাড়ায় ঢুকে প্রতিটি ঘর নিমিষে উজার করে দিয়েছে। এই লুটপাটে দেখা গেছে এতদিন যারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থক ছিল, লুটের বেলায় তারা অনেকেই একাকার হয়ে গেছে। পাড়ার ঘর গুলোতে আগুন দেওয়ার মুখে আমাদের মা-বাবারা বড়োরা মুসলিম গ্রাম্য মোড়লদের হাতে পায়ে ধরে, অনেক চোখের জল ফেলে তাদের মনকে কোমল করতে পেরেছে। ফলে দু'একটি নষ্ট হলোও বাকীগুলো রেহাই পেয়েছে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ করবে উলু

খড়ের প্রাণ যাবে। এ দেশে আমরা কখনো প্রেসিডেন্ট বা প্রধান মন্ত্রী হতে পারবো-না। এমন কি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গিরিটাও আমাদের ভাগ্যে নেই। এমতাবাহুয় বিপ্লবে, আন্দোলনে সংখ্যালঘু হিসেবে সব সময় উলুখড়ের দুর্দশাই ঘটবে আমাদের কপালে। রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকেই বলতে ইচ্ছে করে, যে দেশে রাজনীতির নামে কেবল ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থাঙ্কতার খেলা চলে, আদর্শবাদ যেখানে সামান্য লাইসেন্স পারমিট বা এম.পি. মন্ত্রীত্ব গিরির লালসায় পরিবর্তন হয়ে যায় সকাল সন্ধ্যায়, সে দেশে অতি সংখ্যালঘুদের কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলকে নিয়ে মাতামাতি করা আদৌ বিজ্ঞের কাজ নয়। এখানে আমি কারো ব্যক্তিকৃতি বা আদর্শবাদী চেতনাকে বিসর্জন দিতে বলছি না। বলি, আদর্শের সে দেবতাকে আপন হৃদয়ের পূজার বেদীতে বসিয়ে আপন শক্তি প্রমাণেই নিজের কাজ ও ত্যাগের মধ্যদিয়ে পূজা করে যেতে, দলীয় বাড়াবাড়িতে না যেতে। মনে করুন যদি কেহ বাঙালী জাতীয়তা-বাদকে সমর্থন করেন, তিনি রাজনৈতিক দল নিয়ে মাতামাতি বাড়াবাড়ি না করে আপন কর্ম ক্ষেত্রে প্রাণের বিনিময়েও জাতীয় সম্পদের সুরক্ষায় ও শ্রীবৃদ্ধিতে মনপ্রাণ ঢেলে দিতে পারেন। এ-টাই হলো খাঁটি দেশপ্রেম, সত্যিকার জাতীয়তাবাদ। আর যিনি শোষক ও শোষিতের ধারায় শোষণমুক্ত সমাজের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন- তাহলে তিনি প্রথমে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করুন- আমার দ্বারা কোন প্রকার শোষণ করা হচ্ছে কিনা, অথবা শোষককে সহায়তা দান হচ্ছে কিনা। আপনি আপনার শক্তি প্রমাণে আপনার চারপাশে শোষণ মুক্ত পরিবেশ গড়ার জন্যে আপন কাজে, কথায়-ও নির্লোভ চরিত্রের মাধ্যমে মানুষের তথা শোষক শোষিতের মন পরিবর্তনের সাধনা করুন। এটাই হবে আপনার পক্ষে সাম্যবাদের প্রতি পরম পূজা। ব্যক্তি থেকেই সমষ্টির জন্ম হয়। তাই সমষ্টিগত শক্তির জন্ম দানে ব্যক্তি শক্তিই পূর্ব শর্ত। যে ব্যক্তি স্বীয় জীবনে আদর্শের সুপ্রতিষ্ঠা দান করতে পারেনি, তার পক্ষে সমষ্টিগত জীবনে আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্যে হাক ডাক করা প্রহসন, ছলনা এবং আত্ম-প্রবঞ্চনা মাত্র। শুধু মাত্র মুখের জোরে অভিনয়কারী এমন নেতৃত্ব অসম্ভব ভয়ঙ্কর। সে নিজের বিবেক বোধকে নিজের হাতে তো ধ্বংস করলোই; অধিকন্তু ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে দলীয় মতাদর্শের ভবিষ্যতকে পর্যন্ত দারুণ বিপর্যয়ের মুখেই ঢেলে দেয়। তার নৈতিক বিপর্যয়ের উদাহরণ ভবিষ্যতে ডান-বাম সকলে নির্বিচারে ব্যবহার করে সত্যিকার আদর্শের প্রতি সন্দেহের ধুম্রজাল বিস্তার করার সুযোগ পেয়ে যায় সহজেই।

যে উদ্দেশ্যে আমার এ অভিমত ব্যক্ত করা, তা বাংলাদেশের ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক, ও আর্থ-সামাজিক পরিমন্ডলে শতকরা এক জনও নহে, এমন একটি সংখ্যা লঘু ধর্ম সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যেই। এ দেশের সমতল বৌদ্ধরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন পল্লীতে দ্বীপের মতো অবস্থানের ফলে রাজনৈতিক প্রতিপত্তি অর্জনের কোন সম্ভাবনা কোন কালে ছিল না, হবে ও না। পার্বত্য বৌদ্ধদের

ক্ষেত্রে অতীতে ছিল, বর্তমানে ও, নামে মাত্র হলেও আছে; কিন্তু ভবিষ্যতের সম্ভাবনা এখন বিরাট প্রশ্নের মুখোমুখি। এমতাবস্থায় আমাদের উচিত হবে মহাকাব্যিক বুদ্ধ কর্তৃক উপদিষ্ট দশবিধ রাজধর্ম, সপ্ত অপরিহার্য নীতির আলোকে নিজেদের অস্তিত্ব, জীবন, মান-মর্যাদা, ইচ্ছিত, সম্ভব ও সম্পদ রক্ষার উপায় অনুসন্ধান করা। সংক্ষেপে বলতে গেলে- বৌদ্ধগণ কোন দলীয় পূজার চাইতে আদর্শ-চরিত্রের পূজাকেই গুরুত্ব দেয়া বুদ্ধের শিক্ষা। পারিবারিক, সামাজিক, স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এই আদর্শের আলোকেই যেন নেতৃত্ব সমর্থনে আমরা অংশগ্রহণ করি।

এখন আবার আমার আত্ম জীবনে ফিরে যাই। মায়ের মুখের বর্ণনায় এবং মুক্তি যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের বাস্তব ঘটনা-বলী প্রত্যক্ষ অবলোকন করে জীবনে কোন দিন রাজনীতি করবোনা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই। তাই ভারতে আশ্রয় গ্রহণের কোন ইচ্ছাই মনে জাগেনি। দেখলাম, গ্রামেও নিরাপত্তা নেই। প্রতিদিন যুবকদের ধরে হত্যা করতে স্থানীয় দালালদের নিয়ে পাঞ্জাবী সেনা বাহিনী গ্রামে হানা দিচ্ছে। অতএব, কতদিন আর এভাবে পালায়ে বেড়ানো যায়। ঠিক এমন সংকট মুহূর্তে আমাদের সেই পুরনো ধর্মগুরু ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরো লুটপাটে লন্ডন জোবরা সুগত বিহারে উপস্থিত হলেন। এ সুযোগে গ্রামের যুবক যারা আত্ম গোপন করে আছি, সকলে তাঁর নিকটে উপস্থিত হলাম। আমাদের দুর্ভাবস্থার কথা জানালান। অনেক আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো বার্মায় পাড়ি জমানোর ব্যবস্থা করা হউক। প্রথমে নির্বাচিত হলাম নতুন বাবু সহ আমি আমরা দু'জন ভণ্ডে মহোদয়ের সাথে কল্লুবাজারে দিকে যাব। বার্মা সীমান্তে ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি বিশেষ ভাবে জেনে সংবাদ পাঠাবো। অবস্থা অনুকূলে থাকলে সকলেই পর পর রওনা দেবো। পরদিন আমরা দু'জনে ভণ্ডের সাথে রওনা দেবো ছির করে সকলে সন্ধ্যায় বাড়ী চলে গেলাম। বাবা ও মাকে বিষয়টি ভালো করে বুঝিয়ে অনুমতি নিলাম। পুত্রের জীবন রক্ষায় কেহ প্রতিবাদ করলেন না। খাওয়া দাওয়ার পর ঘুমোতে গেলাম এ আশায়, গ্রামে তখন পাহারা বসানো হয়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছি গভীর ভাবে। হঠাৎ বাবা হাত ধরে ডাকলেন। বললেন, চলো বাইরে যাই। মনে করলাম কোন বিপদ সংকেত আছে। অতএব, নীরবে বাবাকে অনুসরণ করলাম। রাত তখন একটা। তিনি সোজা আমাকে বিহারে নিয়ে গেলেন। অনেক চেষ্টার পর ভণ্ডেকে জাগালেন। ভণ্ডে দরজা খুললেন, বাবা আমাকে নিয়ে রুমে ঢুকলেন। বললেন, ভণ্ডে ক্ষমা করবেন, এতো রাতে আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি। ভণ্ডেকে বন্দনা করে আমার হাতটা ভণ্ডের হাতে তুলে দিয়ে বললেন- এই কিছুক্ষণ আগেই আমি স্বপ্নে দেখেছি যে আমার সন্তানকে দান কার দিচ্ছি। ঘুম থেকে উঠেই সিদ্ধান্ত নিলাম, ভণ্ডে ও যখন বিহারে আছেন তখন এই মুহূর্তেই তাকে নিয়ে আপনার হাতে তুলে দেই। নিশ্চয় আপনার মনে আছে, এ সন্তানকে একদিন আপনি আমার কাছে দান চেয়েছেন। মেট্রিক পাশ করাবো এ আকাঙ্ক্ষায় সেদিন আপনাকে দেইনি। আমার আকাঙ্ক্ষা সে পূরণ করেছে। আজ

আপনার হাতে তুলে দিতে পেরে আপনাকে দেয়া প্রতিশ্রুতিও পূরণ হলো। এখন আমি দায় মুক্ত। আপনি সম্ভানকে মনের মতো করে গড়ে তুলবেন।

বাবার এ অপ্রত্যাশিত একতরফা প্রস্তাবে আমি কিছুতেই নিজেকে একমত করতে পারি নাই। আমাদের গতকালের সিদ্ধান্তের সাথে এ প্রস্তাবের কোন মিল নেই। অধিকন্তু, আমিতো ভুলেই গেছি, সে কবে শৈশবের অবুজ মন প্রব্রজ্যা জীবনকে অতপছন্দ করে ছিল। এই গভীর রাতে আপন মনোভাব ব্যক্ত করে তর্ক করে বাবার মনে কষ্ট দেয়া ঠিক হবেনা; তাই নীরবেই সব দেখে গেলাম। বাবার কর্তব্য শেষ করে আবার আমাকে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। একটি বারও আমার মতামত জানতে চাইলেন না। যা-ই হউক, সে রাত আর ঘুম হয়েছিল কিনা জানিনা। পরদিন পিসতুত বোনের ছেলে ভাগিনা মানিক ধনের সাথে চুড়াভ সিদ্ধান্ত হলো, আজ আমি ভক্তের সাথে কল্লবাজার রওনা দেব। কিছুদিনের মধ্যে সে এস, এস, সি পরীক্ষাটা দিয়ে চলে আসবে আমার ঠিকানায়। উভয়ে তার জন্মস্থান অকিয়াবের পাথর কিন্নায় যাবো। আমার অনেক ছোট হলেও, মা- বাবা ভাই বোনদের নিয়ে দেশে ফিরে আসার পর থেকে এক দুর্দমনীয় আকর্ষণে আমরা উভয়ের হৃদয় প্রায় একাকার হয়ে গিয়েছিল। এখন আমরা উভয়ের স্বপ্ন বার্মায় গিয়ে চাষাবাদ করবো। ক্রমে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হবে আমাদের এই প্রয়াস- চিনাপদ্ধতির কমিউনের ন্যায়।

ভাঙে ও নতুন বাবু সহ আমরা তিন জনে যথাসময়ে রওনা দিলাম। কাশুঘাটে আসলে ইয়াবড়ো মোচ ওয়ালা অসুরাকাকৃতির কয়েক জন পাঞ্জাবী সৈনিক দারুণক্ষিপ্ত গতিতে আমাদের সবাইকে বাস থেকে নামালো। বিগত দুই তিন মাস যাদের ভয়ে পাগিয়ে বেড়াচ্ছি, এ যাবত কেবল নাম শুনেছি, চোখে কোন দিন এই রিজার্ভ আর্মির মুখোমুখি হয়নি, আজ আচম্কা তাদেরই মুখোমুখি হয়ে সত্যি নিজের মনকে কিছুতেই সহজ করে নিতে পারছিলাম না। নানা যুক্তিতে মনে সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম যাতে। মনের এই ভাব, চেহারায় প্রকাশ হয়ে না পড়ে তাদের যদি সন্দেহের মধ্যে পড়ি নিষাৎ মরণ। তাই, তথাকথিত আন্তিকদের দৃষ্টিতে নাস্তিক মতবাদে দীক্ষিত যুবকটি এবার মনে মনে হলেও ধর্মের আশ্রয়, বুদ্ধের আশীর্বাদ কামনা করেছি। অসহায় দুর্বল মানুষ, জীবন- সত্যের মুখোমুখি হয়ে কাল্পনিক শক্তির কাছে এমনি করেই বারে বারে এই চিরন্তন রীতিতে আত্ম সর্মপন করেছে। আর ধর্মব্যবসায়ীরা মানুষের এই দুর্বল দিকটিকেই বার বার ব্যবহার করে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কায়মি স্বার্থ হাসিল করেছে। পাঠক, আমার এ অভিমত কি অবাস্তব অথবা কাল্পনিক?

যাই হউক আমাদের পথ প্রদর্শক ভাঙে প্রশ্নকারী সৈনিককে তড়িৎ গতিতে কতগুলো বার্মিজ ভিক্টুর ফটো ও চাইনিজ লেখা দেখালেন এবং আমাদেরকেও তার সহগামী হিসেবে বুঝিয়ে দিয়ে এক মহাফাঁড়া কাটালেন। ভক্তের উপস্থিত বুদ্ধি মত্তায় সন্তুষ্ট সৈনিক আমাদের আর কোন প্রশ্ন করা প্রয়োজন মনে করেনি। কিন্তু, দেখলাম

আমাদের সহযাত্রী কয়েক জনকে আর বাসে উঠতে দেয়া হলো না। জানিনা তাদের ভাগ্যে কী ঘটেছে। আমাদের গাড়ী চকরিয়া এসেই যাত্রা সমাপ্ত করলো। অধিক রাত হয়ে যাওয়াতে নিকটবর্তী নিচুপান খালি (পাল্লাকাটা) বড়ুয়া পাড়ার বিহারে আশ্রয় নিলাম। সে গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি মাষ্টার সীতানাথ বড়ুয়া, ভক্তের পরম ভক্ত। তাঁদের বাড়ীতে রাতে ও সকালে খাওয়া সেরে আবার রওনা দিলাম। মধ্যাহ্ন ভোজের সময়ে রাম কোট বনাশ্রমে এসে পৌঁছলুম। সবাই মিলে ভিক্ষালব্ধ অন্ন পরিভোগ করে একটু বিশ্রামের পর নানা আলাপের মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করতে লাগলাম। বুঝতে পারলাম এতদঞ্চলে আমাদের দিকের ন্যায় রাজনৈতিক উত্তাপ তেমন নেই; যদিও রামুতে বড়ুয়াদের জীবনও সম্পদ হানি ঘটেছে প্রচুর। রামকোটে এ যাত্রায় আমার দ্বিতীয় বার পর্দাপন। অতএব অনুভূতিতে উত্তাপ তেমন নেই। নতুন বাবু আমারই মতো একটু বাম রাজনৈতিক দৃষ্টি সম্পন্ন হলেও অনেকটা আবেগ প্রবণ। ফলে, বুদ্ধ মূর্তির অপরূপ এবং শান্ত স্নিগ্ধ তপোবন সদৃশ পরিবেশের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই বার বার করে যাচ্ছেন। আমি নীরবে কেবল অনেক এলোমেলো চিন্তার রাজ্যে ভেসে চলেছি। আর মাঝে মাঝে সীমান্তের খবর সংগ্রহের জন্য ব্যাঘ্র হয়ে উঠছি। ভক্তে আমাকে আশ্বস্ত করেছেন। যারা নিয়ত যাওয়া আসা করে তাদের সন্ধানে লোক পাঠাচ্ছেন বার বার। শেষতক এক জনকে পাওয়া গেল, বেশ কিছুদিন পরে। তার বর্ণনায় জানতে পারলাম প্রথম দিকে বার্মা কর্তৃপক্ষ শরণার্থীদের সাহায্য করলেও, পরবর্তীতে পাক সরকারের সাথে যোগাযোগের পর শরণার্থীদেরকে এক প্রকার নির্যাতনের মধ্যেই রেখেছে। সারাদিন জঙ্গল পরিষ্কার করায়, আর খাবার দেয় যৎসামান্য, কাকেও নড়তে চড়তেও তেমন দেয়না। সুযোগে সোনা-দানা ও হাতিয়ে নিচ্ছে সেনাবাহিনীর জোয়ানারা। এমনতরো বর্ণনায় কে ইচ্ছা করবে বার্মা সীমান্তে প্রবেশ করতে? অতএব, এক প্রকার সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গ্রামে চিঠি লিখলাম সব বর্ণনা করে। আমরা দু'জন ভক্তের সাথে পরামর্শ করতে চাইলাম কি করা যায়। দেখলাম তিনি আমাদেরকে রামকোটে ধরে রাখতেই ইচ্ছুক। কারণ এ কয়দিনে আমাকে না হলেও নতুন বাবুর মতো একজন উপযুক্ত আলাপী, উপযুক্ত শ্রোতা এবং উপযুক্ত দরদী সেবক তিনি পেয়েছেন। নতুনবাবু আমার শৈশব শিক্ষা গুরু যতীন্দ্র মাষ্টারের প্রিয়তম ছাত্র ছিলেন। তিনি পরিবারের বড়ো ছেলে। পিতার বহু শ্রম সাধনার ফসল হিসেবে বি,এ, পাশ করে রেলওয়েতে টি, টি, একাউন্টে চাকুরী পেয়েছিলেন। তার পিতার দুই স্ত্রী নিয়ে বিরাট সংসার। তিনি সহ তিন ভাই এক বোন ছিলেন প্রথম স্ত্রীর। এক সময় তাঁদের মা এত অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে সংসার আর চলে না। এমতাবস্থায় তারই অনুরোধে আর একটি বিয়ে করলেন নতুনেন বাবা। সে ঘরে ক্রমান্বয়ে সাত-আট জন ছেলে মেয়ে হলো। বাবা রেলের অতি নিম্ন বেতনের চাকুরে ছিলেন। মাসিক বেতন মনে হয় নব্বুই টাকার বেশী ছিল না। তবে পনেরো দিন অন্তর কিছু রেশন পেতেন। এত বড়ো পরিবার তাতে কি রক্ষা হয়?

না। তিনি তা পেয়েছিলেন এবং পেয়েছেন অতি সসম্মানে। তাঁর মতো এতো পরিশ্রমী, এতো মিতব্যয়ী, এত অমায়িক লোক আমাদের গ্রামে দ্বিতীয়টি ছিল না। কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, কি শীত, সব ঋতুই ছিল তার জন্যে এক সমান। খুব ভোরে উঠে মাঠের কাজ। সকাল দশটায় যথারীতি রেল লাইনের কাজ। বিকাল পাঁচটায় আবার রওনা দিয়েছেন মাঠে। রাত সাতটা থেকে আটটা অবধি মাঠেই পড়ে থাকতেন; যদি বাজারের প্রয়োজন না থাকতো। যদিও বেশীর ভাগ ছিল বর্গা জমির চাষ, দ্বিতীয় ক্রী সহ সব ছেলে মেয়ে নিয়ে তাঁর এই অমানুষিক পরিশ্রমে সারা বছর অল্প সংস্থান সহ যাবতীয় বাড়ী খরচ এই চাষাবাদ থেকেই নির্বাহ হয়ে যেতো। তাঁর সরকারী বেতনের প্রায় সবটুকুই সন্তানদের শিক্ষা দীক্ষার জন্যেই ব্যয়িত হতো। এতগুলো সন্তানের মৌলিক শিক্ষার ভার স্বেচ্ছায় নিয়েছিলেন আমার শৈশব শিক্ষা গুরু যতীন্দ্র মাষ্টার। তাই তিনিও স্থায়িত্ব লাভ করেছিলেন তাঁদেরই বাড়ীতে মৃত্যুর আগ-পর্যন্ত। আমার শৈশব জীবনের শিক্ষায় এই পরিবারও এ বাড়ীর অবদান কম নয়। একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে রামকোটে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে বলছিলাম। অগত্যা স্থির হলো দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আমরা রামকোটেই অবস্থান করবো। কিন্তু, দুই জন যুবক এভাবে বসে বসে দু'জন ছোট শ্রমণও সেবকের ভিক্ষে করা অল্পে দিনের পর দিন গত করা, বিবেকের দিক থেকে কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। তাই দৈনিক রুটিন করে নিলাম বিহারের যাবতীয় কাজ আমরা দু'জন সমাধা করবো, অবসর সময়ে ছোটদের পড়াবো এবং নিজেরাও ধর্মীয় বিষয় অধ্যয়ন করবো, কিছু আধ্যাত্মিক আলাপ ও ধ্যান ভাবনা অনুশীলন করবো। শ্রমণেরা শুধু ভিক্ষে করবে ও পড়বে। এ নিয়মে বিহারখানা যেমন ঝকঝকে হয়ে উঠলো, সাথে সাথে আমাদের চঞ্চল মনের গতিধারাও ক্রমে শান্ত- দাঙ্গ এবং সন্ধর্মের প্রতি আকর্ষণ বাড়তে লাগলো। কিন্তু, কিছু দিন না যেতেই গ্রামের লোকেরা আমাদের অবস্থান সম্পর্কে নানা ধরনের প্রশ্ন শ্রমণদেরকে করতে শুরু করলো। জানতে পারলাম কিছু বড়ুয়া স্থানীয় মুসলিমদের সাথে আমাদের নিয়ে বিরূপ আলোচনার সূত্রপাত করে চলেছে। আমরা নাকি আওয়ামীলীগ করি এবং বর্তমানে মুক্তি যোদ্ধার সদস্য। কোন কোন জন ভাঙেঁকে সরাসরি অভিযোগ ও করেছে। এমন বিপদের দিনে অন্য কোন আশ্রয় ও জানা নেই। ভক্তে শেষেমেধ প্রস্তাব করলেন, তোমরা যদি প্রব্রজ্যা নাও তাহলে আমি যে কোন প্রকারেই রক্ষা করবো। না হলে তোমাদের এখানে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে। আমাদের দু'জনকে নিয়ে যখন এমন সমস্যা চলছিল, তখন জোবরা হতে আমার সহপাঠী সুভাষ প্রব্রজিত অবস্থায় হঠাৎ রামকোটে উপস্থিত। তাকে পেয়ে আমার সেকি আনন্দ। কারণ নতুন বাবুও আমি বয়সে অনেক তফাৎ হওয়াতে মনখুলে কখনো কথা বলতে পারতাম না। সুভাষ আমাকে তার এই সাময়িক প্রব্রজ্যা গ্রহণের কারণ যে আত্মরক্ষার কবচ মাত্র, তা সবিত্তারে জানালো। আমিও তো একই মতের শিষ্য। ভাবলাম মন্দ হবেনা, আমরা তিনজন প্রব্রজ্যিত

হয়ে এখানে কিছুকাল গত করতে পারবো। ভণ্ডেকে সুভাষের অবস্থান ইচ্ছাটা জ্ঞাত করতেই তিনি সাথে সাথে প্রত্যাখ্যান করলেন। এমন যে করবেন, তা চিন্তাই করতে পারিনি। তিনি বললেন সে মার্কারা রাজনৈতিক কর্মী এবং অসম্ভব চঞ্চল। তাকে এখানে রাখলে সকলেই বিপদাপন্ন হবো। সুভাষ স্কুল জীবন হতেই ছাত্র লীগের সক্রিয় সদস্য এবং নেতৃস্থানীয় ছিল, এটা ঠিক। কিন্তু এ অঞ্চলে তো তার নামগন্ধও কেউ জানেনা। ভণ্ডের আসল ভয় তার সান্নিধ্যে আমিও উদ্দাম হয়ে উঠবো। তাই এই সরাসরি প্রত্যাখ্যান। দু'দিন পর সুভাষ ফিরে যাচ্ছিল দেশে। অনিবার্য মৃত্যু ফাঁদ থেকে যে আত্মরক্ষার্থে ছুটে এসেছিল এ দূরান্তে, শুধু আমাদেরই পানে চেয়ে; তাকে আবার ঠেলে দিচ্ছি সেই মরণ ফাঁদের দিকে, এই বেদননায় সেদিন অক্ষ সজল কণ্ঠে বিদায় দিয়ে রামকেট শ্মশানের জঙ্গলে প্রাণ খুলে কেঁদেছিলাম অনেক্ষণ। নতুন বাবুও আমি এক নির্দিষ্ট দিনে প্রব্রজ্যা নেয়া স্থির হলো। আমাদের ভণ্ডের তখনো ভিক্ষুত্বের দশ বছর পূর্তি না হওয়াতে সরাসরি আমাদেরকে প্রব্রজ্যা দিতে অক্ষম। তাই রামুর সত্য প্রিয় মহাশ্ববিরকে অনুরোধ করলেন, আমাদেরকে প্রব্রজ্যা দানের জন্যে। মহাশ্ববির প্রত্যাখ্যান করলেন- এই বলে, নাম ঠিকানা বিহীন, কোথায় কি করে এসে রামকোটে আশ্রয় নিয়েছে, আমি তাদের রংকাপড় দিয়ে আবার কোন বিপদে পড়ি-ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব, উপায় বিহীন হয়ে ভণ্ডে গেলেন লামার পাড়া বিহারে বড়ো মঘ ভণ্ডে অশীতিপর বৃদ্ধ উঃ পান্ডব মহাথেরোর নিকট। তিনি সাদরে আমাদের প্রব্রজ্যা দিলেন এক বৃষ্টি ঝরা সন্ধ্যায়। নামাকরণের সময় তিনি আমার জন্ম তারিখ, জন্ম বার, জিজ্ঞাসা করলেন। আমি কিছুই বলতে পারলাম না। শেষতক, প্রব্রজ্যার দিন তারিখ এবং আমার হস্ত রেখা বিচার করে নাম দিলেন পঞ্গোয়ানছা- অর্থাৎ প্রজ্ঞাবংশ। আর নতুন বাবুর নাম দিলেন আরিয়াওয়ানছা- অর্থাৎ আর্ঘবংশ। সে স্থানেই বিধিমতে আমাদের যাবতীয় শিক্ষা আর আচার সংঘের দায়িত্ব দিলেন ভদ্র প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরোর উপর, আচার্য হিসেবে। আমরা মাত্র চার জনের এই সমাবেশে, নীরব নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রব্রজ্যা অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলো। সশ্রদ্ধ সন্তোষ চিন্তে উপাধ্যায়কে পূজা সৎকার করে রাতের আলো আঁধারিতে রামকোটে চলে আসলাম।

শুরু হলো এবার নতুন জীবন। কিন্তু সত্য বলতে কি, যে দিন প্রব্রজ্যা নিতে যাচ্ছিলাম সেদিনও মনের সিদ্ধান্ত ছিল- এ প্রব্রজ্যা সামান্য কয় দিনের জন্যে। ভাগিনা মানিকধন সহ বার্মাতে গিয়ে বড়ো চাষা হওয়ার স্বপ্ন সে মুহূর্তেও ত্যাগ করিনি। অথচ দৈনিক রুটিন মাফিক জীবনাচার ক্রমে নতুন জীবনের তাৎপর্যকে আকর্ষণীয় করে তুলছিল নিত্য-নব অনুভূতির মাধ্যমে। জীবনের বর্তমান অধ্যায়ের সাথে অতীতের ফেলে আসা দিন গুলোর যতই তুলনা করি, ততই মনে হতে লাগলো সত্যি কেমন উদ্দাম উন্মাদবৎ জীবনটাই না এতদিন অতিবাহিত করে এসেছি। জীবনের কত অমূল্য মুহূর্ত গুলো নষ্ট করে ফেলেছি, কত গুলো অস্থির অনিত্য, ক্ষয়

শীল- ব্যয় শীল ক্ষণ ভঙ্গুর মরিচিকার পেছনে। জীবনে যত আশা, যত সংকল্প তখন দেখেছি, তা কতই না অর্থহীন। ক্ষণিকের মোহমগ্ন হয়ে কত মিথ্যা সংকল্পের পেছনে ছুটেছি। কত উৎপীড়ন, উপদ্রব ভোগ করেছি; তার সুফল কি? বরঞ্চ জন্মান্তরের সংখ্যা বৃদ্ধি করে দুঃখের সিন্ধুকে প্রসারিতই কেবল করেছে। ঠিক এ ভাবেই জীবনকে দেখতে, শুরু করলাম। জল যে পাত্রে রাখে, সে পাত্রের আকার ধারণ করে। এটা জলের স্বভাব ধর্ম। মানুষের মনের স্বভাব ধর্মটাও এর চেয়ে কম কোথায়? প্রচেষ্টা বা শক্তি প্রয়োগে জল উর্ধগামী হয়। নিম্নগামী মানুষের মনকেও উর্ধগামী করতে নিশ্চয় প্রচেষ্টা লাগবে। জৈবিক ধর্ম বশে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য, আসক্তি, এসব নিম্নগামী চিন্তা বৃত্তিগুলো মানুষকে জীব-জন্তুর পর্যায়েই রেখে দিতে চায় সর্বদা। কারণ সেটাইতো তার আসল নিবাস। বুদ্ধি বিবেকের অতিতাড়নায় বানর প্রজাতির এ জীবটি চতুষ্পদী থেকে দ্বিপদী হলো। মেরুদণ্ডকে সরল খাঁড়া করতে পারার বিরাট সাফল্যে সে পক্ষী হয়ে আকাশে উড়াল দিতে পারল না বটে, দেহ-ভার মুক্ত মগজটা কিন্তু স্বাধীন চিন্তার রাজ্যে প্রসারিত হওয়ার বিরাট সুযোগ পেয়ে গেল। তার নাম প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞার অহংকারে একটি সাধারণ জীব নিজেকে ‘মান+হুস’= ‘মানুষ’ নামে জাহির করেছে। ইহকাল-পরকাল, গতকালের কল্পনা করে করে নিজেকে ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ মহাপুরুষ দাবী করেছে। বাস্তবিক, সামান্য দেহী এই মানুষ নামক জীবটি সত্যই অসাধ্য সাধন করে চলছে। তার এতো সাফল্যের সমস্ত রহস্য কিন্তু সমান্তরাল ন্যূন মেরুদণ্ডকে সরল-খাঁড়া করার মধ্যেই।

আমার প্রব্রজ্যা জীবন নিয়েই উপরোক্ত প্রসঙ্গের অবতারণা। রামুকোটে আমার এই প্রব্রজ্যা, আমার সমগ্র জীবনকে যেন সোজা দু’ভাগে ভাগ করে দিল। প্রথমটি করেছে কেবল অনুসন্ধান-কোথায়, কোন ঘাটে গিয়ে সে ভিড়বে। আর দ্বিতীয়টি পেল যেন তার সন্ধান। জনবহুল পরিবেশের কর্তব্য বহুলতার কোন চাঞ্চল্যতা কোন উত্তাপ নেই রাম কোটের নির্জন বনাশ্রমে। দৈনিক রুটিনের হাঁকে বাঁধা অথচ বিভিন্ন রুটির সমাবেশে তৈরী কর্মসূচিতে একঘেঁয়েমিতা- অবসাদের অবকাশই ছিলনা। ছিল কেবল এতো দিনের লাগামহীন বহুমুখী মন-টাকে সার্বক্ষণিক অন্তর্মুখী করার অবিরাম প্রয়াস। আচার্যদেবের অকৃত্রিম কল্যাণকামী চেতনার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণী দৃষ্টি সব ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বলবৎ রাখতো আমার উপরে, প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে। মনের কোন শৈথিল্যতা অনিয়ম, কোন অনাচরনের জন্ম দিচ্ছে কিনা এ নিয়ে শংকিত থাকলাম তাই সারাক্ষণ। এতো সাবধানতার পরেও দুর্দান্ত বেয়ারা মনকে ধরে রাখা সম্ভব কতটুকু? আচার্যের প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা মতে শ্রামণ্য জীবনের ভিত্তি তৈরীর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করলাম। দশশীল, শ্রমণদের পারাজিকা, সেখিয়া, দশধর্মসূত্র, দণ্ডকর্ম বিধান, ব্রত-প্রতিব্রত ইত্যাদি সবকিছু শিক্ষা করলাম বিনয়াচার্য জিনবংশ মহাধেরো প্রণীত প্রব্রজ্যেতের ব্রতরাশি নামক গ্রন্থ হতে। শুধু শিক্ষা নহে সাথে সাথে সে গুলোর অনুশীলন ও চাই। আচার্যদেবের অকৃত্রিম প্রচেষ্টায় ও যত্নে Theory and

Practical উভয় ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছিল। আমরা উভয়ে অকপটে গুরুকে মনের সব চিন্তা বিতর্ক খুলে বলতাম। কারণ সে শিক্ষাই পেয়ে এসেছি গুরু থেকে। যৌবনের উষালগ্নে কামচেতনার উদ্দামতায় যত কিছু করেছি, সে গুলোই চিন্তে উৎপন্ন হতো সবচেয়ে বেশী। অথচ সেই চিন্তোৎপত্তি রোধ করার জন্যেই যত চেষ্টা। এ চেষ্টা করতে গিয়ে যেন ভিমরুলের চাকে ঢিল মারলাম। ফলে মাঝে মাঝে এই কাম- চিন্তায় একবার নিমজ্জিত হলে কত সময় অতিবাহিত হয়ে যেতো তার খেয়ালই থাকতো না। বহুক্ষণ পর যখন হঠাৎ করে হুস্ হতো তখন অনুশোচনার অন্তঃ থাকতো না। নিজের উপর নিজে রাগ করে অনেক সময় গায়ের চামড়া পর্যন্ত দাঁত দিয়ে কেটেছি। নখ দিয়ে ছিঁড়েছি। দুর্দমনীয় মনকে দমাতে মোমবাতির প্রদীপ্ত শিখায় হাতের আঙ্গুল বসিয়ে দিয়েছি। বসা অবস্থায় কাম বিতর্ক জাগলে উঠে দাঁড়িয়েছি, পদাচারণা শুরু করে পায়ের গতির দিকে মনোনিবেশ করা চেষ্টা করেছি। বুদ্ধ মূর্তির পদতলে পড়ে কতবার চোখের জল ঝেড়েছি, মনটা যেন তাঁরই মতো নির্মল নিষ্কলুষ হয়ে ওঠে। কিন্তু, যে উপায়ই করিনা কেন সবই সাময়িক। গুঁড়ি কচুরিপনার পুকুরে ঢিল ছোড়ার মতো। তবুও চেষ্টার বিরাম নেই। গুরুর উপদেশে হতাশ মনকে আবার সোনালী আশায় চাক্ষা করে নিয়ে পথ চলা শুরু করতাম। গুরুদেব নিজে মুখে মুখে কত থের-থেরীর কাহিনী বলতেন, আর নিজেও কত পড়তাম ওসব বই। নতুন বাবু তথা আর্যবংশ শ্রমণকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কেমন আছেন, বলতেন অসম্ভব, মরে যাচ্ছি তবুও পারছি না মনের সাথে পেয়ে উঠতে। আমার জমানো সংস্কার তো তোমার চাইতে বহু বেশী। আমার বয়স কম বলেই এমন হচ্ছে মনে করতাম। কিন্তু তাঁকে দেখতাম অনেক সময় বিহার ব্রত ছেড়ে দিয়ে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিচ্ছেন বুদ্ধ মূর্তির সামনে। একদিন মন সাংঘাতিক উদ্বেগাকুল হয়ে উঠলো। বিশ্বাস হলো প্রব্রজ্যা নেয়াতেই মনের এ অবস্থা হয়েছে। গৃহী জীবনে কই এমনতো কাম-উৎকর্ষা দেখা যায়নি? অতএব, চীবর ত্যাগ করবো। বিষয়টি ভক্তকে প্রকাশ করিনি। কিন্তু সেদিন মজ্জিম নিকায়ের মাগন্ধিয় পরিব্রাজক সূত্রটি আমাদের পাঠ ও আলোচ্য বিষয় ছিল। সূত্রটি আমি পড়ি এবং গুরুদেব আলোচনা করেন। আমি শুনি, আর এ জীবনটার প্রকৃত স্বরূপের সাথে নিজের অনুভূতির তুলনা করি। যেন অত্যন্ত বাস্তব হয়ে ধরা দিতে শুরু করেছে আমার ফেলে আসা দিন গুলোর সমস্ত দুঃখ ময়লা আবর্জনা জাত উপদ্রব। বর্তমান ও ভবিষ্যত যেন গলিত কুষ্ঠ রোগীর বিষাক্ত, ক্ষত- বিক্ষত হস্তকে জলন্ত আগুনের উত্তাপে রেখে রোগাতুরের সুখ উপলব্ধির মতো মহাবিভ্রম। ঠিক তেমনই আমার এই কাম ভৃক্ষা, এটা বুঝতে পারলাম। সূত্রটির এই উদাহরণ মনের কাম বিতর্ক জ্বালা অনেকদিন উপশান্ত করে রেখে ছিল। তদুপরি দশ অন্তঃ ভাবনা, মরণানুশ্রুতি এবং বত্রিশ প্রকার অন্তঃ বিষয়ক কায়গতানুশ্রুতি বিশেষ ভাবে শিক্ষা করলাম বিশুদ্ধি মার্গ গ্রহণ হতে। গ্রন্থটির ভাবনা নির্দেশিকা মতে গুরুদেবের

নির্দেশনায় সে গুলোর অনুশীলনও করে যাচ্ছিলাম অবিরাম। কায়গতানুস্মৃতির বত্রিশটি অঙ্কটির প্রত্যেকটি, আলাদা ভাবে পুরো একটি দিন নিমিস্ত হিসেবে গ্রহণ করে করে অনুশীলন করতাম। এমন অনুশীলন কালে একদিন ‘অস্থি পঞ্জর’ অর্থাৎ নর কঙ্কালটির নিমিস্ত নিয়ে স্মৃতি অনুশীলন করে করে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্যে গ্রামে যাচ্ছিলাম ধীরগতিতে। হঠাৎ মনে হলো পথে যাদেরকে পাশ কেটে যাচ্ছি তারা মানুষ হলে মনুষ্য কঙ্কাল, গরু হলে গরু কঙ্কাল, ভাত তরকারী যারা দান করতে আসছেন তারাও কঙ্কাল। কথা বললে যেন মনে হচ্ছে কঙ্কালই কথা বলছে। মন ও দৃষ্টির এই অনুভূতি সত্যই অপূর্ব প্রীতিযুক্ত অনাসক্ত ভাবের জন্ম দিল মনে। আসক্তি শূণ্য নির্বাণ সুখ কাকে বলে, সেদিন যেন আপনা হতেই তার উত্তর পেয়ে গেলাম। সেই থেকে এই বর্তমান পর্যন্ত যতবারই কাম বিতর্কের মুখোমুখি হয়েছি, ততবার সেদিনের ভিক্ষান্ন সংগ্রহের স্মৃতি ও অনুভূতি মনে জাগ্রত করে করেই আত্মরক্ষা করে চলেছি। কিন্তু দেখেছি এই আত্মরক্ষা তখনই সম্ভব হয়, যখন বিপরীত লিঙ্গের সান্নিধ্য হতে দূরে থাকি। কিন্তু হায়! রাম কোটের এক বছরের সেই পূত পবিত্র প্রব্রজ্যা জীবন ছেড়ে সমাজ পরিমণ্ডলে আজ ভিক্ষু জীবন গত করলাম প্রায় একশটি বছর। গৈরিক জীবনের সেই একটি বছরের প্রীতি সুখের তুলনায় বাকী একশটি বছর ধরে যেন কিছুই পাইনি। কোন মানসিক উন্নতিই যেন সত্যিকারের হয়নি। অনুকূল পরিবেশ পরিস্থিতির অভাবে কেবল আত্ম সুখ- আত্ম শান্তি বিসর্জন দিয়ে দিয়েই যেন চলেছি। মাঝে মাঝে ভাবি বুদ্ধ নির্দেশিত প্রব্রজ্যা জীবনের সাথে আমার বর্তমান জীবনের সম্পর্ক কী? আবার অনেক সময় নির্লজ্জ বিপথগামীর আত্মপক্ষ সমর্থনের ন্যায় দাষ্টিক উক্তি করে বলি- নির্বাণ সুখ এ জীবনে দরকার নেই; এ জীবনে আমি বোধিসত্ত্ব পারমীই পূরণ করছি, ইত্যাদি ইত্যাদি। পাঠক আপনার কাছেই প্রশ্ন করি আত্ম সুখের জন্যে সকলের সংসর্গ বর্জন করে আত্ম গোপন করা ভালো, নাকি ধর্ম ও সমাজের জাগতিক মঙ্গল কামনার নামে রাতদিন পাগলের মতো যে দৌড়ঝাপ দিয়ে চলেছি, এটাই ভালো?

প্রব্রজ্যায় আমার ব্যক্তিগত জীবনে যে অনুভূতিটি সবচেয়ে বেশী উৎপীড়ন করে সেটি হলো বিপরীত লিঙ্গের ভাবনা। জানিনা অন্যের জীবনকে কোন ভাবনায় এত ব্যতিব্যস্ত করে কি, না। ত্রিপিটকে লোভ চরিত, ঘেষ চরিত, মোহ চরিত, বুদ্ধি চরিত, প্রজ্ঞা চরিত ইত্যাদি প্রকার ভেদ করা হয়েছে। ব্যক্তির সংস্কার বা দেহ-মনের গুণগত প্রাবল্যের পার্থক্য অনুসারে এসব বিশ্লেষণ পিটকের পৃষ্ঠায় কেবল দেখেছি। কিন্তু প্রশ্ন করে অপরের অভিজ্ঞতা যাচাই এখনো সম্ভব হয়নি চক্ষু লজ্জায়। বৌদ্ধ জাতকের মধ্যে ‘অশ্বাত মত্ভ’ নামে একটি কাহিনী আছে। সেখানে বোধিসত্ত্বের মা-কে নক্সুই কি নিরানক্সুই এর ধক্কার মধ্যেও যে ভাবে কামান্ন হতে দেখেছি, তা তো রীতিমতো অভাবনীয়। তাহলে কি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই কাম মানুষকে কেবল এমনি ভাবেই তাড়া করে।

একটি কচি ছাগল শাবক, একটি কুকুর ছানা, এমনকি অবোধ শিশুর মধ্যেও দেখা যায় এই জৈনিক প্রবৃত্তি। মনস্তাত্ত্বিক বা দেহতাত্ত্বিকেরা এগুলোর ব্যাখ্যা কি ভাবে দেবেন জানিনা, কিন্তু ধর্মতত্ত্বে ইহাকাল পরকালের সুখের তালাটিকে এ প্রবৃত্তির বিপরীতেই ঝুলানো হয়েছে। আমি ডাক্তারও নই, মনস্তাত্ত্বিক ও নই। ধর্মতত্ত্বের মাগেই আমার অবস্থান। প্রিয় পাঠক! বলুন আমার উপায় কি? এতদিন ধরে বৌদ্ধতত্ত্ব নিয়ে যতটুকু নাড়াচাড়া করেছি, সে তত্ত্বের আলোকে মনের কুপ্রবৃত্তির উৎপাতনের চেষ্টা যতটুকু করেছি, তাতে এই প্রতীতি জন্মেছে, চব্বিশ ঘন্টা চা পান করে করে একজন যে ভাবে জীবনটাকে চাঁ ময় করে তোলে, ঠিক তেমনই। হতে হবে বুঝি কামভাব ত্যাগে নিয়ত অভ্যাসকারী জনকে? এই অভ্যাস করতে করতে দিন যাবে, মাস যাবে, বছর যাবে। তার পর.....। তারপর জীবনটাও কি যাবে? না, মহাস্মৃতি প্রস্থান সূত্রে একটি আশ্বাসবাণী আছে। মহাজ্ঞানী বুদ্ধ এখানে বলেছেন, যে জন ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে এক নাগাড়ে সাতটি বছর এই সতিপট্ঠান অনুযায়ী অনুশীলন চালিয়ে যেতে পারবেন, তিনি অবশ্যই এসব প্রবৃত্তির হাত থেকে রেহাই পেয়ে একটি নিরাপদ অবস্থানে পৌঁছতে পারবেন। কিন্তু চা-ময় ব্যক্তি চা খেতে না পারলে শির পীড়া করে। শিরপীড়া বাড়তে বাড়তে বমি হয়। বমি করতে করতে গায়ে জ্বর আসে। তার পরেই শান্তি আসে। দেহ- মনে দীর্ঘ দিনে আসে এই শান্তি, এই পরিত্রাণ। মনের দ্বারা অস্থি মজ্জাগত কাম তথা অন্যান্য হীন প্রবৃত্তি গুলোকে উৎপাঠনের জন্যে নাড়াচাড়া করতে গেলে প্রাথমিক পর্যায়ে চা-খোরের ন্যায় উপদ্রব গুলোই কি অতিক্রম করতে হবে তাহলে?

সাগরের ঢেউয়ের মতো উত্থান-পতনশীল জীবনের এ প্রবাহ। রাম কোটের অধ্যায়টিতে ও ঠিক একই নিয়মে ভেসে চলেছি। আমি ও আর্যবংশ শ্রমণ পালাক্রমে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে যেতাম। যেদিন আমার পালা সেদিন প্রায় একুটু বেশী কিছু পেতাম। তার কারণ গ্রামের দুই বুড়ো চিন্তাদা ও ছিরার বাপ। ভিক্ষান্ন সংগ্রহের পর যখন রাস্তায় উঠতাম তখন তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতো। আমার ভিক্ষা পাত্র, আর সেবকের হাতের টিফিন কেরিয়ার ঢাকনা খুলে খুলে দেখতে ন তাঁরা। আহা! নাতির আজ ভালো জুটেনি বলে আফসোস করতেন আর দোকান থেকে দই অথবা কলা, বিস্কুট ইত্যাদি তুলে দিতেন। মানুষের সাথে আর্যবংশ শ্রামণ তেমন প্রীতি সংলাপে জড়িত হতেন না। গুরুর নির্দেশ যেন তিনি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালনে রত। কিন্তু, আমি অতো বেশী কড়া কড়ি পছন্দ করতাম না। ফলে স্থানীয় জনগণের সাথে আমার এক প্রকার হৃদয়তা যেন আপনাতাই গড়ে উঠলো। রাম কোট ধীরে ধীরে আমাকে আত্মস্থ করে ফেললো। এই মাটি, এই আলো, এই বাতাস আর তার ডুখা-নাক্সা মানুষগুলো, কেমন জানি নিজেদের অজান্তেই একান্ত আপনার হয়ে গেল।

ভিক্ষান্ন লব্ধ রামকোটের মধ্যাহ্ন ভোজ মোটামুটি পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করা যেত। বিশেষত চিন্তাপ্র মহাজন এবং শরৎ মহাজন তথা ছিবার বাপ, এদের অকৃত্রিম

স্নেহে। কিন্তু সারারাত উপোসের পর প্রাতঃরাশের সময়ে মাত্র এক সের চালের যে অল্প গ্রামের গরীব জনগণ পালাক্রমে পাঠাতো, তা ক্রমান্বয়ে সাতটি বুদ্ধ পূজার খালায় বন্টনের পর আমরা চারজন জীবিত প্রাণীর জন্যে আর অবশিষ্ট থাকতো যতটুকু? আপন শ্রমে খেটে-খাওয়ার যে মানসিকতা ছোট বেলা থেকে গড়ে উঠেছে; আজ পূণ্যের নামে পরের দান করা অল্পে উদরপূর্তির এ তাড়না একদিকে বিবেক দংশনের শিকার যেমন করতো অপর দিকে ক্ষুন্নিবৃত্তি তৃপ্ত না হওয়ায় চোখের জল ও ধরে রাখতে পারতাম না, আপন ভাগ্যের কথা ভেবে। আমার মানসিক অবস্থা অনুমান করে গুরুদেব মহাদুর্ভিক্ষের কাহিনী শোনাতেন। লঙ্কার এক মহাদুর্ভিক্ষের দিনে বুদ্ধ শাসন রক্ষার জন্যে নামক ভিক্ষুরা কি ভাবে বুদ্ধে ত্রিপিটক বেঁধে, সাগরের লোনাজল পান করে করে সদ্ধর্ম রক্ষা করেছিলেন; বুদ্ধের সময়ে এক মহাদুর্ভিক্ষে ভিক্ষুরা কি ভাবে ঘোড়া ভক্ষ্য চনা উদুকখলে পিষে জীবন ধারণ করেছিলেন; স্বয়ং বুদ্ধ ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বের হয়ে শুন্য পাত্রে গ্রাম থেকে ফিরেছিলেন; এবং ঐ দিন শুধু মাত্র পাত্র দ্বীত জল খেয়েই দিবা-রজনী গত করলেন। গুরু দেবের মুখে এসব কথা শুনে শুনে কবে যে মন থেকে সমস্ত ক্ষুধা-জ্বালা উদাও হয়ে যেতো, তা টেরও পেতাম না। তবে শৈশব থেকেই খাদ্যের প্রতি এক বিশেষ দুর্বলতা আমার ছিল। তাই যে দিন রামু থেকে সুবর্ণ মহাজন অনেক প্রকারের খাদ্যদ্রব্য নিয়ে বুদ্ধ পূজার জন্যে রামকোটে আসতেন, অথবা যেদিন কোন নিমন্ত্রণে আমাকে সাথে নিতেন সে দিন সত্যিই লালায়িত হয়ে উঠতাম ছোট শিশুটির ন্যায়। রামকোটে থাকা অবস্থায় বার কয়েক রামু সীমা বিহারে ভোজন করার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাদের প্রাত্যহিক ভোজ্য সামগ্রীর সমৃদ্ধ সমাবেশ দেখে আমার রামকোট জীবনের প্রতি সত্যি দীর্ঘ শ্বাস ফেলতে হয়েছে বহুবার।

রামকোটের বিচিত্র খাদ্য ভোজ্যের সত্যিকার অভাব যে হতো তা নয়। নানা দেশ গ্রাম থেকে প্রতিদিন কোন না কোন ভক্ত বা ভক্ত বৃন্দ বুদ্ধ পূজার উদ্দেশ্যে আসতেন। কিন্তু তারা আমরা জীবিত প্রাণী গুলোর কথা একটি বারও ভাবতেন কি না জানিনা। উত্তম উপাদেয় সব খাদ্য ভোজ্য গুলো মোমবাতির মোম আর ধূপ কাঠির ছাই সংযোগে বুদ্ধের আসনে গিয়ে উঠে। কিন্তু ক্ষুধা নামক মহাব্যাধিটি যাদেরকে জীবন্ত দহন করে তাদের জন্য সামান্য আঁখের গিরাটাও পর্যন্ত জুটেনা। কারণ বড়ুয়াদের বুদ্ধ পূজার পবিত্রতা অসম্ভব। বুদ্ধের নামে বা বুদ্ধ পূজার চেতনায় যা কেনা হবে তা দ্বিতীয় কোন প্রাণী (মশা-মাছি, কাক-কুকুর ছাড়া) স্পর্শ করতে পারবে না। পরম বুদ্ধ ভক্ত আমাদের গুরুদেব এ বিশ্বাসে অসম্ভব বলীয়ান। তিনি উত্তম উত্তম খাদ্য ভোজ্য দিয়ে নিত্যনব উপায়ে হরেক রকমের বুদ্ধ পূজা করে থাকেন। যেমন, অষ্টবিংশতি বুদ্ধপূজা, রামকোট বুদ্ধ পূজা, চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ পূজা- ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব এক একটি পূজায় তিনি ভক্তদের নিয়ে নানা খাদ্য সামগ্রীর এত বিশাল সমাবেশ ঘটাতে পারেন যে; চোখ রীতিমতো স্থির হয়ে যাওয়ার

দশা হয়। সারা রাত ভর নানা কারুকার্যের মাধ্যমে পূজা সাজিয়ে বেলা ১২টার পর তা কোথায় রাখা যাবে, কোথায় ফেলা যাবে- এ নিয়ে চিন্তায় ও বেশ কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত করতে হয়। পরে দেখি কিছু ভিখারীরা নিচ্ছে, আর কিছু কাক পাখী ও কুকুরেই খাচ্ছে। দু'দিন পর অবশিষ্টের পঁচা-দুর্গন্ধ ঝান টুকুই কেবল নেওয়ার অধিকার আমাদের জন্যে বরাদ্দ আছে। আমার গুরুদেব এই পরম উৎসাহটি লাভ করেছিলেন নাকি আর্থশ্রাবক ভদন্ত জ্ঞানীশ্বর মহাথেরোর নিকট থেকে। গুরুদেব মহাথেরো মহোদয়ের বুদ্ধ পূজার গুণ কীর্তনের চেয়ে নানা উপকরণে সজ্জিত সৌন্দর্যের প্রশংসাই করতেন বেশী। সেই বুদ্ধ পূজা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য এ দুই পোড়া চোখে হয়নি। কিন্তু, তার শিক্ষায় শিক্ষিত কারিগরদের নিয়ে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারে সীবলী সংসদের পালটা এক সীবলী পূজার আয়োজন করেছিলাম একবার। তখন আমার জীবনেও চলছিল এক ভয়াবহ পাল্টা কীর্তন। কারিগরদের পূজার উপকরণ সংগ্রহের তালিকা দেখে এবং পূজা সজ্জার কেরামতিতে কাঁচা চাল কুমড়োর হাঁস, মিঠা লাউয়ে বুড়ি, শশা দিয়ে মাছ, ময়ুর- ইত্যাদি তৈরী করতে দেখে লোভ ত্যাগের অনুশীলনে বুদ্ধ পূজার প্রতি এতোদিন আমার যৎসামান্য আকর্ষণ যা ছিল, তাও যেন তরল হয়ে গেল।

রামকোটে সাত আটটা কুকুর থাকে। সেখানকার ভিক্ষু শ্রামণেরা ক্ষীনদেহী হলেও ঐ কুকুর গুলোর স্বাস্থ্য কিছু দেখবার মতো। আমাদের অতি ভক্তি প্রণোদিত বুদ্ধ পূজার সৌভাগ্যে তারা এতো সৌভাগ্যবান হয়ে থাকে। সেই দলের একটি কুকুরী কিছু দিন আগে বেশ কয়টি বাচ্চা দিল, রামকোট পাহাড়ের গায়ে এক গর্তে। রাতে শৃগাল আক্রমণ করেছিল মনে হয়, কুকুর ছানার লোভে। পাল্টা আক্রমণ করতে গিয়ে কুকুরীর গায়ে ক্ষত হয়েছে। আমি ও আর্থবংশ কুকুরীর কষ্টে ব্যথিত হলাম। ক্ষত শুকানোর জন্যে ঔষধের সন্ধান করতে লাগলাম। 'মূর্খ বৈদ্য যম তুল্য' প্রবাদটির হাতে হাতে প্রমাণিত হলো। কুকুরীটিকে ধরে তার ক্ষতে দিলাম ধানের বিষ। সামান্য একটি মোরগের পালকের মাথায় করে লাগানো বিষ তার ক্ষতে পড়া মাত্রই মারলো এক দৌড়। আরো একটু দেয়া প্রয়োজন ছিল মনে করে সন্ধান করছিলাম কোথায় গেছে। দেখলাম এক বাড়ীর উঠানে সে চরকার মতো ঘুরতে ঘুরতে সেখানেই প্রাণত্যাগ করলো। আমি পাথর হয়ে গেছি এই দৃশ্যে। একটি অবোধ, নিরীহ প্রাণী এভাবে নষ্ট করলাম। শুধু তা নহে, তার শিশু ছানা গুলোর জন্যে আরো বেশী মর্ম পীড়ার সৃষ্টি হলো। নিজের এই মূর্খতার শাস্তিই সেদিন কামনা করেছিলাম। দুধ পর্যন্ত ক্রয় করলাম কুকুর ছানা গুলোকে বাঁচানোর জন্যে। কিন্তু, কিছুদিন পর পর সব কয়টি মারাই গেল।

একটি একটি করে রামকোটের জীবন গুলো প্রায় বছরের সংখ্যা পূর্ণ করতে চলেছে। জীবন দুঃখের চির অবসানের লক্ষ্যে দীর্ঘ মেয়াদি সাধনায় নিরত হওয়ার একটি সংকল্প ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠছে। বিহারের দৈনন্দিন ব্রতের মধ্যে এভাবে খন্ড স্মৃতি

অনুশীলনের মাধ্যমে যখন চিন্তকে অবিচ্ছিন্ন আয়ত্রে আনতে পারছিলাম, তখন একবার শেষ পরীক্ষার নিমিত্তেই এই ব্যাঘ্রতা। ভক্তকে তাই বার বার অনুরোধ জানাচ্ছিলাম আমরা দু'জনকে পর্যায় ক্রমে দীর্ঘ মেয়াদি ভাবনায় আত্ম নিয়োগের সুযোগ দিতে। কিন্তু তিনি আজ নয় কাল, এভাবে কেবল পিছিয়ে যাচ্ছিলেন। কি কারণে তিনি বিলম্ব করছেন তাও আমার বোধগম্যতায় আসছেন। অথচ, ইতিমধ্যে তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে পরিচ্ছন্ন করা ভাবনা কুঠিরে আমাদেরই পরিচর্যায় রেজুর কুলের (পালং) বিরজার বাপ নামে এক বৃদ্ধকে ভাবনার কর্মস্থান দান করলেন। আমার অত্যধিক পীড়াপিড়িতে এক সময় বললেন- তোমরা প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে প্রথমে মধ্যাহ্ন ভোজ সমাপ্ত করার সাথে সাথেই বনের সেই ভাবনা কুঠিরে পালাক্রমে চলে যাবে। এবং সারারাত অবস্থান করে প্রাতেঃ চলে আসবে। অগত্যা তা-ই করতে হলো। এভাবে কিছুদিন চললো। ইতিমধ্যে আমার গায়ে খস-পাঁচড়া দেখা দিল। চিকিৎসার অভাবে তা দিন দিন ব্যাপকতা লাভ করছিল। বাড়ীতে চিঠি লিখলাম। মেঝাদা টাকা পাঠালেন এবং সহসা বাড়ী রওনা দিতে বিশেষ ভাবে জানালেন। নতুনদার মেঝাভাই নেপাল আসলেন। পাকিস্তান সবকার এখন প্রশাসনিক কাজকর্ম আবার পুরোদমে চালু করেছে। তাকে পুনঃ চাকুরীতে যোগ দানের জন্যে পত্র দিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। নেপালদা অনেক চেষ্টা করলো সাথে নেওয়ার জন্যে। তাঁর মা যে খুব অসুস্থ এবং তাকে একটি বার দেখতে চায় এসকল বার্তার সবকিছু অবগত করালেন। কিন্তু কিছুই হলো না। বরাবরই এক কথা, গুরু ভক্তের নিকট আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাঁর অনুমতি ছাড়া এক কদমও দিতে পারবো না। আমি আগে ভাবনা করবো তার পরেই যাবো। অতীব দুঃখের সাথে নেপালদা বিদায় নিলেন রামকোট হতে। এর কয়েকদিন না যেতেই আমরা আক্রান্ত হলাম ডাকাত দল কর্তৃক।

ঘটনাটা ঘটলো হাস্যকর ভাবে। গুরুদেব সে সময়ে ভীষন ধূমপান করতেন। এক সাথে প্রায় চার পাঁচটা কলকীতে তামাক প্রস্তুত করে রাখতে হতো। একটি শেষ না হতেই আর একটি। তামাকের এই সরবরাহের সাথে পাল্লা দিতে হতো টিক্কাও। আমরা বটপাতা পোড়া গোবর মাখা টিক্কা কয়েকটি কেরোসিনের টিন ভর্তি করে রাখতাম। তামাক তৈরী করতাম রামু বাজারের পোড়া গুড় ও তামাক পাতায়। আর্থবংশ (নতুন বাবু) শ্রামণ ভক্তকে শয্যায় পাঠিয়েও তামাক সেবন করাতেন, আর উভয়ে ধর্মালাপ করতে করতে প্রায় গভীর রাতে ঘুমুতে আসতেন আমারই কক্ষে। প্রতিদিনের ন্যায় এ রাতেও ঠিক ত-ই হলো। আমি কিন্তু ইতিমধ্যে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। ডাকাত যখন আসছে আর্থবংশ শ্রমণ নাকি তা টের পেয়েছিলেন কুকুরদের আর্ত শব্দে। আর অমনি তাদের প্রতি একাগ্রমনে মৈত্রী বিতরণ শুরু করে দিলেন তিনি। ডাকাত দরজা ভাঙছে, গুরুদেবের উপর আঘাত হানছে, শ্রমণের নীরব পুণ্যদানের তবুও বিরাম নেই। দরজা ভাঙার শব্দ শুলো ঘুমের ঘোরে আমার নিকট মনে হচ্ছিল বাইরে ভীষণ তুফান চলছে, আর ঘন ঘন বজ্রপাত হচ্ছে। আমি কিছুক্ষণ

পর সজাগ হয়ে তা বুঝার চেষ্টায় যেই মাত্র উঠতে চাইলাম, ঠিক তখনই ডাকাতদের দুইজন আমাদের কক্ষের প্রবেশ করলো। দরজার আড়ালে বিছানা হওয়ায় আর্যবংশকে প্রথমে দেখতে পায়নি। কক্ষের একপাশে আমার উপরেই সরাসরি চোখ পড়লো। তাদের ট্চ লাইটের আলোতে বন্দুকের নলটাই কেবল দেখতে পেলাম। হাতে বন্দুক দেখে প্রথমে মনে করলাম তারা রাজাকার হবে। আমাদেরকে মুক্তি বাহিনী সন্দেহে ধরতে এসেছে। কিন্তু পরক্ষণে টাকা কোথায় বের কর এই বলে আমাকে নির্দেশ দিল। তখন বুঝতে বাকী রইলোনা যে তারা ডাকাত। আমি উঠতে চাইলে তারা নড়াচড়া করতে নিষেধ করলো। কাছে এসে গালে একটা থাপ্পর দিয়ে বললো, শালা টাকা পয়সা কোথায় আছে বের কর। আমি কিছু চলতি ভাষায়, কিছু চাঁটগা ভাষায় বলতে চাইলাম যে, আমরা কোন টাকা পয়সা স্পর্শ করিনা, ভিক্ষা করে খাই ইত্যাদি। তারা আমার পকেটে, বালিশের তলায় কোথাও টাকার সন্ধান না পেয়ে বের হয়ে যাওয়ার সময়েই আর্যবংশকে দেখলো। তিনি লেপের তলায় তখনো পুণ্যদানে রত আছেন কিনা জানিনা। কিন্তু ডাকাত যখন লেপের উপর দিয়েই তাকে বন্দুকের বাট দিয়ে আঘাত করলো তখন শ্রামণ যেই বিকট চিৎকার দিলেন, সেই চিৎকারে পাহাড়ের নীচের বাড়ী গুলোর লোকদের ঘুম ভেঙ্গেছে বলে তারা জানালো। কিন্তু কেহই ভয়ে উপরে আসলো না। শ্রামণও বিছানা ত্যাগ করলেন না, অনেকক্ষণ। ডাকাতদের পেছনে পেছনে আমি বের হয়ে ভাঙের কক্ষে গেলাম। তারা তখনো ভাঙেকে মারছিল আরো কিছু পাওয়ার জন্যে। আমি হাতে ধরে উনাকে বাইরে নিয়ে আসলাম তাদের নিকট থেকে। তাদের উদ্দেশ্য করে বললাম-যা আছে সব আপনাদের সামনেই আছে- সবই নিয়ে যান। আমাদের লুকোবার কিছুই নেই। তারা বাইরে বারান্দায় সেবক রতন, গুরু ভণ্ডে ও আমাকে বসিয়ে রেখে শাসিয়ে দিল নড়াচড়া করলেই গুলি করবে। আমরা বসে রইলাম। তারা ইচ্ছে মতো সব কিছু নিয়ে চলে গেল। এতক্ষণ পর আর্যবংশ শ্রামণ উঠে আসলেন; তাঁর গভীর মৈত্রী ভাবনা ত্যাগ করে বাস্তবের মুখোমুখি হতে। চারদিকে ঘুট ঘুটে অন্ধকার। কারো হাতে একটি দিয়াসলাইও নেই। লেম্পও পাওয়া যাচ্ছেনা। গুরু ভণ্ডে ক্ষণিকের শীত শীত বলে ভীষণ কাঁপতে থাকেন, যেইমাত্র লেপ-কমল দিয়ে ঢেকে দিই তখন গরম গরম বলে ছট্ পট্ করে ওঠেন। ব্যাপার কি? আঘাত কোথায় কোথায় লেগেছে তাও অন্ধকারে বুঝতে পারছি না। সময়ও কত জানিনা। নীচের বাড়ীগুলো হতে বাতি নিয়ে উঠে আসতে অনেক ডাকা- ডাকি অনুন্নয়- বিনয় করলাম। আশ্চর্য্য একটি মানুষও এলো না। এতোদিন যাদের সুখ- দুঃখের সাথে নিজেদেরকে একাকার করে নিয়ে একান্ত আপন জন হয়ে উঠেছিলাম, আজ তারা এমন ব্যবহার করবে, এ বিশ্বাস স্বপ্নেরও অতীত ছিল। অগত্যা, অনেক কষ্ট করে আমিও আর্যবংশ শ্রামণ নীচে নামলাম। এক বাড়ীতে গেলাম- লেম্প চাইতে। তারা যেন একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে লেম্প জ্বালায়ে আমাদের হাতে দিল। কিন্তু, কেউ সাথে আসলো না। নিজেই নিজে

প্রশ্ন করলাম কেন এই পরিস্থিতি? তারা এম্মিন যাবত বাইরে হৃদ্যতার অভিনয়ই কি শুধু করেছে? আমার গুরুদেব স্থানীয় লোকদের সাথে কোন দিন সুখ-দুঃখের সম্পর্ক গড়ে তোলেননি, অথচ তাদের অন্তরে উপরেই বিগত ১৮টি বছর গত করেছেন। আজ আমরা যারা রামকোট বিহারে আছি তাদের একজনও স্থানীয় নই। অতএব, আমাদের প্রতি ভিন্ দেশী মানোবৃত্তি তাই তাদের অন্তরে এতো প্রবল ভাবে বিরাজ করেছে। মনে হচ্ছে আমরা যেন জোর করেই তাদের সম্পদ ভোগ- দখল করে চলেছি।

সে যা-ই হউক। লেম্প হাতে নিয়ে উপরে এলাম। ভঙে ছট্ পট্ করছেন পূর্বের মতোই। কিছুক্ষণ পর পিস্ত বমি হলো, আর সাথে সাথে জ্বর এলো ভীষণ কাপুনি দিয়ে। লেম্পের আলোয় দেখলাম মাথা ও মুখের এক পাশে ভীষণ ফোলে গেছে। আঘাতটা সেখানেই হয়েছে সবচেয়ে বেশী। ভঙেকে খাটে শুইয়ে দিলাম। মৃদু আগুন জ্বালিয়ে দিলাম নীচে। ঘড়ি একটাও নেই। সব নিয়ে গেছে ডাকাত দলে। কোন প্রকারে এভাবে রাত গত করে খুব সকলেই নাসির কুল গ্রামে গেলাম সংবাদ দিতে। সেখান থেকে হাস পাতালে গেলাম ডাক্তার আনতে। একই পথে রামু গিয়ে সুবর্ণ মহাজন প্রমুখ অন্যান্যদের খবর দিতে সেবক রতনকে পাঠিয়ে দিলাম।

ডাকাতির পর থেকে রামকোটের জীবন ক্রমে আমার নিকট ধূসর হয়ে আসছে। চার দিকে এক অনাত্মীয় পরিবেশ যেন আমাকে দিন দিন গ্রাস করে ফেলেছে। আমি হাঁফিয়ে উঠেছি। এবারে গাছে প্রচুর কাঁঠাল ফলেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুতে যেদিন রামকোটে আমরা দু'জন যুবক পদার্পন করেছিলাম সেদিনও রামকোটের কাঁঠাল আমাদের স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু, তার কয়দিন পর শুরু ভঙে কিছু কাঁঠাল বিক্রি করে দেয়াকে কেন্দ্র করে গ্রামের লোকেরা যে ভাবে তাঁকে আক্রমণ করতে এসেছিল, সেই মুহূর্তেই আমি রামকোট ছেড়ে পালাতাম, যদি অন্যকোন অভয় আশ্রয় জানা থাকতো। এবারের কাঁঠালের মৌসুমে দেশের পরিস্থিতি খুবই ঘোরালো হয়ে উঠেছে। মুক্তি বাহিনীর তৎপরতা ভীষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন স্থানে পাক সেনাদের পরাজয় এবং মুক্তি যোদ্ধাদের অগ্রগতির খবর পাচ্ছি বি,বি,সি, সহ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে। এতদিন আধ্যাত্মিক জগতের সভ্য হওয়াতে জাগতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে কোন দিন রেডিওর পাশে যাইনি। ডাকাতির পর আধ্যাত্মিক ছেড়ে আবার পুরো জাগতিক হয়ে উঠলাম। বি, বি, সির সংবাদই হলো দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অবগত হতে আমাদের আশ্রয়। তবে, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে আর একটি নতুন ষ্টেশনের খবরও পেলাম এবারে। তাদের খবর এক-পেশে এবং কিছুটা অতিরঞ্জিত মনে হলেও, দেশাত্ম বোধক পরিবেশনার পথে আকর্ষণ ছিল। জানতে পারলাম ভূটান এবং ভারত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে নিয়ম তান্ত্রিক ভাবে সমর্থন দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাথে একান্ততা ঘোষণা করেছেন। অতএব, স্বাধীন বাংলাদেশ নামে নতুন একটি রাষ্ট্রের জন্ম এখন নিশ্চিত হয়ে গেল। অতীত হয়ে

যাবে পূর্ব পাকিস্তানের নাম। এসব সংবাদে উৎফুল্ল না হয়ে পারছিলাম না। অনেক ভয় আতঙ্ক ও দুঃখের রাত অতিক্রমের পর যে আনন্দ, যে স্বস্তিঃ অনুভূত হয় আমাদের মধ্যে ও তেমন একটি রোমাঞ্চ সৃষ্টি হয়েছে। নতুন রাষ্ট্র হবে। আমরা নিজেদের জন্যে একটি স্বাধীন রাজ্য লাভ করতে যাচ্ছি। স্বাধীনতা আমাদের সব দুঃখ ভার অপনোদন করবে। আমরা মুক্ত পাখীর মতো সুখি হবো; ইত্যাদি কত স্বপ্নই না মনের কোনে নানা প্রশ্ন নিয়ে বার বার ভিড় করছে। মাঝে মাঝে ভুলে যাচ্ছিলাম যে আমি শ্রমণ। আজ যদি শ্রমণ না হতাম, উঃ সে কি উদ্দাম উল্লাস প্রকাশ করতে পারতাম বন্ধুদের সাথে। মনে আফসোস হতো।

হায়! রামকোটের কাঁঠাল। কত জাতের মিষ্টি মধুর কাঁঠাল। প্রতিদিন পাকছে কিন্তু বাজার নেই। খাবে কে এতো কাঁঠাল। গ্রামের লোকদেরও তেমন আগ্রহ নেই। ডাকাতির পর থেকে তারা যেন অনেক দূরেই সরে গেছে, আমাদের সমালোচনার মুখে। যুদ্ধের মোড় পরিবর্তনের আনন্দে ওসব বেদনাকে এখন অতিক্ষুদ্র তুচ্ছ বলেই মনে হচ্ছে। পাকা কাঁঠাল অচির স্বাধীনতার খুশিতে এখন নিজেরাই বেশী করে খেতে শুরু করেছে। কাঁঠালের কোষ সকালে, দুপুরে এমনকি ভাতের সময়েও খেতে খেতে একদিন হঠাৎ করে কাঁঠালের প্রতি মন এমন বিষিয়ে উঠলো যে, পরক্ষণেই বমি শুরু করে দিলাম। সাধারণতঃ আমার বমি হয় না। কিন্তু, কোন কারণে একবার যদি শুরু হয় তা হলে রক্ষা নেই। দিনের পর দিন গত হয়ে যাবে বমি করতে করতে। এবারে তার ব্যতিক্রম হলো না। এক ফোঁটা জল পর্যন্ত আর পেটে দিতে পারছিলাম না। মুখে যা-ই দিই বেরিয়ে আসে। শয্যার সাথে যেন লেগে গেছি। আমার এ দুর্ভাগ্য দেখে অপুত্রক চিন্তাপ্রাণ দা ভেষজ কি কি ঔষধ খাওয়ালেন এবং কাঁকন চালের যাগু তৈরী করে একটু একটু খাওয়ানোর পর- বমি বন্ধ হলো। গুরুদেব বা সাথী শ্রামণকে মনে হলো, বেশ উদাসীন। তবুও এই অনাগারিক বুড়োর সেবায় সুস্থ হয়ে উঠলাম।

শরীরটা খুবই দুর্বল। কিন্তু ও দিকে আমেরিকার সপ্তম নৌ বহর, অন্যদিকে রুশ ও ভারতীয় নৌবহরের খবর, আর কক্সবাজারে ভারতীয় যুদ্ধ বিমানের গোলা বর্ষন- ইত্যাদির উত্তেজনায় রোগজীর্ণ, শরীরের দুর্বলতা মনকে তেমন কাবু করতে পারছেনা। দু' এক দিনের মধ্যেই জানতে পারলাম পাক সেনারা আত্ম- সমর্পনে রাজী হয়েছে। তাহলে পূর্ব পাকিস্তান অনিবার্যভাবে স্বাধীন বাংলাদেশ হলো? একটু দেশে যাব, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের দেখবো, এই ভাবনায় মনটা দারুণ অস্থির হয়ে উঠেছে। গুরুভগ্নে বললেন তিনি একটু হাইদচকিয়া যাবেন। তিনি তাঁর এই জন্মস্থানে যাবেন মাও ভাইদের দেখতে, শহরেও কিছু কাজ আছে ইত্যাদি। আর তখনই আমিও প্রস্তাব করে বসলাম আমাকে সাথে নিতে। তিনি যুক্তি দেখালেন, আমি গেলে আর্থবংশকেও সাথে নিতে হবে। এ ভাবে বিহার খালি করে যাওয়া যায় না। ভগ্নের এ বক্তব্য আমার মোটেই মনঃপুত হয়নি। কিন্তু, কথা বাড়াতে ও ইচ্ছে নেই। চুপ করে গোলাম। তিনি বললেন, এতদিন যখন ধৈর্য ধরেছে- আমি ফিরে

এসেই তোমাদের ভাবনায় বসাবো। খাইছে, কোথায় স্বাধীনতার মুক্তি উদ্ভাস, আর কোথায় ভাবনার কারাগার। মনে মনে ভন্ডের দুর্বলতার প্রতি হাসলাম। আমাদের শ্রমণ আর্ববংশ কিন্তু ভন্ডের ইচ্ছের সাথে পুরো একমত। নতুন বাবু সতি্য সবকিছুতেই যেন পুরাতনের একান্ত অনুরাগী। নতুনের অনুরাগ বলতে যে কিছু থাকা দরকার তা তিনি মানতে রাজী নন। কারণ গুরুদেব তাঁকে শিখিয়েছেন অনুরাগ মানেই তৃষ্ণা। আর তৃষ্ণা মানেই দুঃখ। জীবন দুঃখে পুঁড়ে পুঁড়ে তিনি অঙ্গার হয়ে গেছেন। আর নতুন ভাবে পোড়া খেতে তিনি রাজী নেই। দেশ যখন আপনাতেই স্বাধীন হলো এবার তিনি আপন সর্বশক্তি দিয়ে আত্ম- মুক্তির যুদ্ধে ঝাঁপ দেবেন। আর এ যুদ্ধের কলা কৌশল; আদেশ নির্দেশ সবই গুরুর হাতে। অতএব, গুরুহি পরমং তপঃ।

অবস্থা বুঝে, আমার সিদ্ধান্ত, আমি তখন নিয়েই ফেলেছি। রাম কোটের সব কিছুর প্রতি এ যেন আমার অঘোষিত বিদ্রোহ। গুরুদেব যথাসময়ে আপন জন্মভূমির উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার পর পরই আমার প্রত্নতি শুরু হলো। সিদ্ধান্ত আর ফিরে আসা হবে না- এই ঐতিহাসিক তীর্থ ভূমিতে। এককালের সুপ্রাচীন রম্যবতী নগরে সুবর্ণ ভূমির (মায়ানমান) মণীষীরা বুদ্ধের বক্ষাঙ্ঘি (রাংউ) সুরক্ষার জন্যে স্থাপন করেছিলেন মরোরম পর্বত শীর্ষে এই চৈত্য ও কালো পাথরের অনিন্দ্য ভাস্কর্য সমূহ জীবন্ত বুদ্ধমূর্তি। বুদ্ধের সেই পবিত্র বক্ষের অঙ্ঘি ধাতু সংস্থাপন করা হয়েছিল উক্ত বুদ্ধমূর্তির মস্তকে। এই চৈত্য ও বুদ্ধ মূর্তিকে কেন্দ্র করেই কালে সমগ্র রম্যবতী অঞ্চলের নাম হয়েছিল 'রাংউ'। আর এই পুণ্যতীর্থ মন্দির প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল 'রাংকুট' নামে। বুদ্ধ পূতাঙ্ঘি যুক্ত এই রাংউ বুদ্ধ বিষের আলৌকিক ঋদ্ধি আছে। মানুষের প্রার্থনা অধিষ্ঠান পূর্ণ হয়, এই রাংউ বুদ্ধ বিষের প্রভাবে। এ সকল গণ বিশ্বাস ও ভক্তিতে রাংউ বুদ্ধভূমি ক্রমে রাংউ নামক তীর্থ স্থানে পরিণত হলো। চন্দ্রসুরিয় রাজ বংশের সম্ভান চন্দ্র মুনির সাধন পীঠস্থান ও ছিল এই রাংকুট। তাই কালে রাংউ বুদ্ধ ভূমিতে বিশাল পরিধির সম্ভারাম বা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিশাল নিবাস ও বিদ্যাপীঠ গড়ে উঠেছিল।

মোগল আমলে ফতে খাঁ নামক মোগল সেনাপতির সৈন্য বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ঐতিহাসিক রাজার কুলের এই তীর্থভূমি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বৃটিশ আমলে, বৃটিশ উপনিবেশিক সরকারের সরকারী কর্ম কর্তাদের হিন্দু পৌরনিক গল্প প্রীতির ফলে আর, এস, ভূমি জরীপে তারা 'রাংউ' নামের স্থলে 'রামু' শব্দ সংযোজিত করলো। আর 'রাংকুট' (বুদ্ধের বক্ষাঙ্ঘি স্থাপিত পর্বত শীর্ষ) কে তারা 'রাম কোট' নামে জরীপ করলো। রাংউ ভূমির 'রাংকুট' তীর্থের পবিত্র নাম নিয়ে এমন জোচ্ছুরির নীরব দর্শক হয়েই ছিলেন সেদিনের লুঠিত, পরাজিত এ অঞ্চলের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী। প্রতিবাদ করার শক্তি বিন্দুমায়া ও ছিলনা তাদের। বহুদিন পর প্রত্নতাত্ত্বিক বৌদ্ধ ধর্ম গুরু জগত চন্দ্র মহাশ্ববির আরকানে রক্ষিত রেকর্ড নিয়েই তাকে খোর অরন্য থেকে

আবার লোকচক্ষুর দৃষ্টিপথে আনলেন। কিন্তু, এতদিন পর উদ্ধার প্রয়াসে সেই তীর্থ অক্ষত হয়ে ফিরলো না। তার বহিরাবরণ 'রাংউ' রাংকুট টা সম্পূর্ণ খেয়ে ফেলে উই পোকাকারুপ রামু আর রামকোট শব্দদ্বয়। প্রাচীন বৌদ্ধ তীর্থের এখন অর্ধাংশ জুড়ে বসেছে রাম সীতার শীলনোড়া, শীবলিঙ্গ আর রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার আসর। অনেক প্রয়াস, অনেক লেখালেখি ও দৌড় ঝাপের পর আমার গুরুদেব ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরো রাংকুট তথা রামকোট এর ঐতিহাসিক সত্যকে এখন জাতীয় পর্যায়ে পরিচিত করলেও বিভ্রান্তিকর অনৈতিহাসিক 'রামকোট' ও 'রামু' নাম থেকেই গেল। এমন ঐতিহাসিক ঐতিহ্য মণ্ডিত পুণ্যতীর্থ রাংকুট-কে ত্যাগ করে জন্মভূমি জোবরায় চলে যাওয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে আর্যবংশ শ্রমণকে শুধু সংক্ষেপে বললাম আমি দেশে যাচ্ছি, আপনার কোন কথা আত্মীয় স্বজনদের বলার থাকলে বলুন। তিনি বললেন আমার কিছুই বলার নাই, সবই গুরুর উপর। বাড়ী থেকে পাঠানো অবশিষ্ট টাকা যা ছিল এবং গুরুদেবের ফেলে রাখা একটি নষ্ট পকেট ঘড়ি নিয়ে বিদায় নিলাম রাম কোট বুদ্ধের নিকট থেকে। রামু হতে সোজা চট্টগ্রাম হয়ে জোবরা চলে এলাম বিকাল ৪/৫ টার দিকে। গ্রামে প্রবেশের মুখেই নতুনদার মা জেনে গেছেন আমার আগমন বার্তা। তখন তিনি নাকি চাল আলাদা করছিলেন তুস-কুড়া থেকে। বার্তা বাহককে শুধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন- আমার নতুন ও আসছে তো? যেই শুনলেন আমি একা, তখনই তিনি সেখানে ঢলে পড়লেন শুধু এই একটি প্রশ্নে বলে- যাদুকে আর কি দেখবো না? তিনি বেহুস হয়ে শয্যা গ্রহণ করলেন। আমি সরাসরি বিহারে চলে গিয়েছিলাম। ধারণা ছিল বিহারে বিশ্রামের পর পরবর্তী দিন সকালেই দেখা করতে যাব। কেহ আমাকে একটি বারও নতুনদার মায়ের এমন সংকট জনক অবস্থার কথা জানায়নি, সারা রাত ভর। সকালে প্রাতঃরাশে বসেছি, এমনি সময়েই খবর আসলো নতুনদার মা মারা যাচ্ছেন। বলে-কি? অমনি দূর দূর বুকে ছুটলাম তাদের বাড়ীতে। কান্নার শব্দে আমার প্রতিটি পদক্ষেপ স্থির হয়ে যাচ্ছিল। কোন প্রকারে দেহটাকে টেনে নিয়েই যেন পৌঁছলাম। দেখলাম তিনি অনেকগুলি পর পর কেবল শ্বাস নিচ্ছেন, চক্ষু তাঁর স্থির। মনে হলো এই চর্ম চোখে তিনি আমাদের অবজ্ঞা করে কোন্ সুদূর জগতের সন্ধানে চলে গেছেন। আমি তাঁর সদগতি কামনায় বুদ্ধ বাক্য পাঠ করতে করতেই তিনি একবার চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে হয়তো সন্তান নতুনকে খুঁজতে চেষ্টা করলেন আরেক বার। ব্যর্থ হয়ে সে-ই যে চোখ বন্ধ করলেন, আর খোললেন না প্রিয় জনদের এত কাতর আর্তনাদ সত্ত্বেও।

এই সেই নতুনের মা, যাকে আমি প্রাণ ভরে প্রতিদিন কাকীমা ডেকে ছিলাম আমার শৈশব শিক্ষা জীবনের ৬/৭টি বছর। যার হাতে রাঁধা ভাত বাড়া ভাত, কত সকাল সন্ধ্যায় খেয়েছি। তার পুত্র সম অপার স্নেহ, অপার ভালোবাসা আমার জীবনকে কতো ভাবে সিক্ত করেছে, বারো বার সেই স্নেহময়ী জননীর মূর্তিটি আমার সামনে জীবন্ত হয়ে নিজের অজান্তে কৃতজ্ঞ অশ্রু ঝরিয়েছে সেদিন। শোকে পাথর হয়ে

কতক্ষণ ধরে তাঁর মরদেহে সামনে বসেছিলাম খেয়াল নেই। কে জানি বলল শ্রমণ বিহার থেকে ভস্কে এসেছেন। আমার সম্বিত ফিরলো। বুক চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়িলাম। আমার সম্বিত পুণ্য আবার তাঁকে দান করে বিদায় নিলাম। পথে যেতে যেতে সিদ্ধান্ত নিলাম, এখনই রওনা দেব রামকোটে। দেখি শ্রমণকে আনতে পারি কিনা। পাথেয় নিয়ে দিলাম রওনা। ঠিক সন্ধ্যার পূর্ব মুহূর্তে গিয়ে আবার উপস্থিত হলাম রামকোটে। আমাকে ফিরতে দেখে শ্রমণ একটু আশ্চর্য হলো। বললো, কি হয়েছে? আমি সরাসরি আঘাতের জন্যেই বললাম-আপনার দেখা না পেয়ে আপনার মা হাটফেল করে মারা গেছেন। আমার মা নেই? মারা গেছে? এই বলে সে-কি আর্ত চিৎকার। দৌড়ে গেলেন বুদ্ধের কাছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলেন, কেন গুরু তাকে একটি বারও অনুমতি দিলেন না; কী দোষ সে করেছে- ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন। তার কান্নার উচ্চস্বরে নীচের এক মহিলা ছুঁটে আসলো। আর অমনি আর্যবংশ শ্রামণ তাকে বুক জড়িয়ে ধরে মা! মা! বলে সে কি আর্তনাদ। অনেক্ষণ এভাবে অশ্রু বিসর্জনের পর একটু শান্ত হলে, আমি তাঁকে বললাম আপনার মাকে আজকেই দাখ করে ফেলবেন; এরূপ ইচ্ছা দেখেছি আপনার বাবা এবং ভাই বোনদের। কারণ আপনি মায়ের মুখ দেখেন এ- তাঁরা চায় না। জানিনা এখন অবস্থা কি! তবে চলুন আগামী কাল খুব ভোরে রওনা দিই। আমি ভাবতে ও পারিনি তিনি আমার প্রস্তাবে এমন উত্তর দেবেন। তিনি বললেন আমি শেষ পর্যন্ত দেখতে চাই এ-ই গুরু আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চান। তিনি ফিরে আসলেই যা হবার হবে। এর আগে এক কদমও বাইরে দেবো না। আমি থ হয়ে গেছি- এই জবাবে। কিছুক্ষণ আগেই যার এমন অবস্থা দেখলাম- সে মানুষ কি করে এমন কঠিন হতে পারে? সত্যি এ দারুন দুঃখ - স্কোভের মধ্যেও আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় যেন কোমল হয়ে গেলাম। তখন তাঁকে বললাম আপনি যা ভালো বুঝেন করেন কিন্তু আমি কাল সকালেই চলে যাব; এবং আর কখন ফেরবো জানিনা। আর কোন কথাই হলো না তাঁর সাথে। কয়েকদিন পর সেই নতুনদা আর্যবংশ শ্রামণ সম্পূর্ণ একাকী গ্রামে আসলেন। আমি মনে করেছিলাম গুরুকে না নিয়ে তিনি কখনো আসবেন না। কিন্তু না; একাকীই আসলেন। তাঁর হাব-ভাব-চাল চলন ঠিক রামকোটের মতোই আছে। কি উদ্দেশ্য নিয়ে আসলেন তা জানার সুযোগ হওয়ার আগেই তাঁর আত্মীয় স্বজনরা বোঁকে ধরেছে তাঁকে। এমন প্রব্রজ্যার দরকার নেই। মাতৃ হত্যাকারী, পিতার রক্ত শোষণকারীর আবার প্রব্রজ্যা কিসের? মা- বাবার অনুমতি না নিয়ে প্রব্রজ্যা দেয় এ কোন ধরনের ভিক্ষু, কোন ধরনের গুরু; ইত্যাদি অনর্গল বকে যেতে লাগলো সকলেই- বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মতো। চারদিক থেকে হাজারো শর নিক্ষিপ্ত হলেও কুর্ম যেমন আপন দেহের ভেতরে হাত- পা- মাথা সবকিছু গুঁড়িয়ে চূপটি করে বসে থাকে, আর্যবংশ শ্রামণও ঠিক তেমনই নিখর নিষ্কম্প। তাঁর প্রতিক্রিয়া বিহীন এই নীরবতা জ্ঞাতীদের স্কোভের আগুন বৃষ্টি করলেও, আর কতক্ষণই বা হাঁক-ডাক

করা চলে। অগত্যা এক সময় বিদায় নিলেন সকলে, একে একে। কিন্তু, তারপর দিন, ভোজনের উদ্দেশ্যে ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁর অফিসের সহকর্মীদের দ্বারা কেমন করে চীবর ত্যাগ রাজী করালেন জানিনা। দেখলাম বিহারে ফিরে এসে তিনি চোখের জল ফেলতে ফেলতে চীবর ত্যাগ করলেন।

যে নতুন বাবুকে নিয়ে আমার জীবনের একটি অধ্যায়ের শুরু; প্রব্রজ্যা জীবনে যার ধৈর্য্য, সংযম ও গভীর অনুরাগ অনেক সময় আমার দারুণ ঈর্ষার জন্ম দিত; জানিনা কোন অদৃশ্য কর্মের কারণে তার এত সুদৃঢ় সংকল্পের প্রব্রজ্যা জীবনটি স্থায়ী হতো পারলো না কেন। আর আমি, যে বান্দা অস্থায়ী প্রব্রজ্যা নিয়েও জানিনা কোন অদৃশ্য কর্মের কারণে বহুবার যাই যাই করেও অবলীলাক্রমে তেইশটি বছর পার করে দিলাম। কর্ম রহস্য এতই অদ্ভুত, এতই বিচিত্র।

এই নতুনদার কথা আরো কিছু না বললে, আমার বলা অপূর্ণ থেকে যাবে। তিনি কঠোর শ্রমজীবী পিতা অসীতি রঞ্জনের প্রথম সন্তান ছিলেন। লেখাপড়ায় মেধাবীই বলতে হবে। ক্রমে মেট্রিকটা ভালো পাশ দিয়ে আই, এস, সি, তে নাজিরহাট কলেজে ভর্তি হন। বাড়ী থেকে হাটহাজারী রেল স্টেশান পর্যন্ত হেঁটে তার পরেই চট্টগ্রাম শহর থেকে আসা দশটার ট্রেন ধরে নাজির হাট কলেজে যাওয়া। প্রতিদিন এ ভাবেই ক্লাশ করা, তার উপর লেখা-পড়ায় অত্যধিক ঝাঁটুনি দেয়ার ফলে একসময় স্বাস্থ্য খুবই ভেঙ্গে পড়েছিল। আই, এস, সি ও ভালো ফল করেছে। কিন্তু বি, এস, সিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেলেন কিনা জানিনা; অচিরেই কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। পিতার প্রচুর ঋণকরা অর্থব্যয়, মায়ের অজস্র সেবা, আর আমার শৈশব শিক্ষা গুরুতর দারুণ উৎকর্ষায় এক সময় রোগ জীর্ণ অবস্থায় সেরে উঠলেন। তবে ঔষধ রোগ সারালেও সেই ঔষধের ধকল সামলানো দায় হয়ে পড়েছিল। তাঁর মেধাও কর্মশক্তি দু-ই যেন প্রায় পঙ্গু হয়ে গেল। তিনি আর বি, এস, সি, শেষ করতে পারলেন না। পিতাকে ঋণভার মুক্ত করার জন্যেই সর্ব প্রথম চাকুরী নিলেন ষোল শহরস্থ ফরেস্ট রিচার্স লেবরেটরীতে। চাকুরী রত অবস্থায় বি, এ, পাশ করে রেলওয়েতে যখন ঢুকলেন, তার পরেই আমার সাথে নতুন বাবুর নতুন জীবনের সূত্রপাত হয়। তিনি প্রব্রজ্যা ত্যাগ না করে পিতার ঋণ শোধ করার চেষ্টায় একবার রায়ুর ধনী উপাসক সুবর্ণ মহাজনের নিকট ঋণ হিসেবে আর্থিক সাহায্য চেয়ে ছিলেন। কথা ছিল রায়ু বা অন্য কোথাও শিক্ষকতা করে সে ঋণ শোধ করে দেবেন। কিন্তু, মহাজন মহোদয় রাজী হননি। পিতৃঋণ শোধ করে আবার প্রব্রজ্যিত হবেন এ-শর্তেই পরে তিনি চীবর ত্যাগ করেছিলেন। পিতা তাঁকে বিয়ে করানোর জন্যে ইতিমধ্যে ভীষণ তৎপর হয়ে উঠলেন। কিন্তু যতবার কন্যা ঠিক করেন, ততবার তিনি নিজেই কনের বাড়ী গিয়ে প্রতিবাদ করে আসেন। এ ভাবে কয়েক বছর পিতার সাথে স্নায়ু যুদ্ধের পর এক সময় বিয়ে করতে রাজী হলেন। ভাগ্যের কী নির্ভর্য পরিহাস। যে

পিতা তাকে এতো সংগ্রাম করে বিয়ে করালো, সে পিতাই একদিন এই নতুন কে পত্রিকায় ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করে পৈত্রিক সমস্ত সহায় সম্পদ হতে বঞ্চিত করলেন। নতুন বাবুর প্রব্রজ্যা জীবন, আমার জীবনে একটি আদর্শ হয়ে আছে। নিখুঁত প্রব্রজ্যা জীবন উদ্যাপন করেই তিনি বিদায় নিলেন আমার জীবন হতে।

প্রব্রজ্যা জীবনে রামকোট অধ্যায় আমার শেষ হলো। কিন্তু, বিগত একুশটি বছরের চলার পথে প্রতি পদক্ষেপেই রামকোটের পবিত্র শ্রামণ্য জীবন, রামকোটে গুরু শিক্ষা আমাকে পথ চলার সমস্ত শক্তি যুগিয়েছে। এই বৈরাগ্য জীবন নিয়ে যতবারই মনে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, ততবারই রামকোটের জীবন ও শিক্ষার মূর্ত্যটিকে আমার মানস পটে জ্জ্বলিত করে তাকে প্রশ্ন করেছে। সেই হৃদয় দেবতা আমাকে যথাযথ উত্তর দিয়ে সংশয় অপনোদন করেছে। যদি কেহ বলেন প্রজ্ঞাবংশ ভিক্ষুর মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ে পরিচ্ছন্ন জ্ঞান আছে, অথবা তার জীবনাচারে একটি আদর্শ বোধ আছে। আমি অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করবো রামকোটের গুরু এবং রামকোটের শ্রামণ্য জীবনই তার সব কৃতিত্বের দাবীদার। জীবনের এই স্বল্প সময়ে সমগ্র এশিয়া মহাদেশে পদাচারণা প্রায় শেষ হয়েছে। এ যাবত যতদেশ ঘুরেছি, যত জ্ঞানী- গুণীর সান্নিধ্য পেয়েছি, যত শিক্ষা, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, সবগুলো মিলে ও আমার রামকোটের একটি বছরকে আমি অতিক্রম করতে পারিনি।

১৯৭১ হতে ৭২ ইংরেজী ৪-

১৯৭১ থেকে ৭২ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত রামকোট কাটিয়ে এখন জন্মান্তর জোবরায় অবস্থান নিলাম জ্ঞাতীদের ইচ্ছায়। মা চেষ্টা করেছিলেন প্রব্রজ্যা ত্যাগ করাতে। জ্ঞাতীরা ইচ্ছা করলেন প্রব্রজ্যা জীবনে পলিটেকনিক যখন আর পড়া হবে না, অন্ততঃ কলেজে হলেও যেন ভর্তি হই। শেষাতক হাটহাজারী কলেজেই ভর্তি হলাম আই,এ, তে। যে পালি টোলার শিক্ষকদের বেতন সংগ্রাহের জন্যে কৈশোরে গ্রামময় ঘুরে ঘুরে সপ্তাহিক মুষ্টি চাল সংগ্রহ করতাম আজ সেই পালিটোলে নিজেই শিক্ষকতা করে অধ্যয়ন খরচ চালানোর উপায় বের করলাম।

জোবরা সুগত বিহারে ভিক্ষুদের পবিত্র বর্ষাবাস ব্রত সমাগত। পূর্বাঙ্কেই বিহারাধ্যক্ষ ভিক্ষুকে সংশ্লিষ্ট বিহারে এই ব্রত অধিষ্ঠানের জন্যে আমন্ত্রণ জানানো একটা ধর্মীয়-রীতি। বিহার পরিচালনা কমিটির আহ্বানে গ্রামের প্রতিটি পরিবার প্রতিনিধি সে উদ্দেশ্যে এক রাতে সমবেত হলেন বিহারে। যথারীতি বিহারাধ্যক্ষ ভদ্র প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষু মহোদয়কে ফাং (আমন্ত্রণ) করা হলো। সবশেষে বিহারাধ্যক্ষ মহোদয় জোবরা সুগত বিহারে আমার অবস্থান প্রসঙ্গ উত্থাপন করে গ্রামবাসীর সম্মতি চাইলেন। ভিক্ষু মহোদয়ের এ প্রস্তাবে সমস্ত হল ভর্তি জনতা প্রায় দুই তিন মিনিট নিঃশব্দ মৌনভাব ধারণ করলেন। গ্রাম্য সভা বৈঠকে সাধারণত দু'চারজন লোকই কথা বলে। বাদ বাকীরা কেবল হাঁ না তেই অংশ গ্রহণ করেন। এ রাতের সভায় যারা এতক্ষণ যাবত কথা বলেছেন, তারা আমাকে দিয়ে স্বেচ্ছা শ্রমদানের নামে আমার গৃহীকালে গ্রামের

রাস্তা বাঁধা, নালা পরিষ্কার করা, নিজেদের পুকুরের কচুরিপনা পরিষ্কার করা, পালিটোলের মুষ্টি চাল সংগ্রহে, তাঁত ঘরের মাটির দেয়াল গড়াতে মাটি কাটানো, ইত্যাদি যে কোন কাজে ভুতের মতো খাটাতেন। ঘরে খেয়ে মামার মোষ তাড়ানোর শিক্ষাও প্রেরণা তাদের কাছে থেকেই পেয়েছিলাম। আমার সেই শিক্ষা-দীক্ষা দানের কর্তারা উনিশ বছরের এই যুবক শ্রমণটিকে যে আজ কিছুতেই চিনতে পারছেন না। ঠাহর করতে পারছেন না তার স্বভাব চরিত্র, তা তো প্রজ্ঞাবংশের কর্মের দোষ। অনেচ্ছের নীরবতা ভঙ্গ করে শেষাতক তাদেরই একজন বললেন-এ সব শ্রমণ রেখে লাভ কি? পরের মাথায় নারকেল ভেঙ্গে মজা করে খেয়ে একদিন কাপড় ছেড়ে চলে যাবে। তার কথাই প্রথম এবং শেষ কথা আমার সম্পর্কে। এসব কথাবার্তা আমি একটি কক্ষে বসে শুনতে শুনতে লজ্জায় ও ঘৃণায় মরে যাচ্ছিলাম। মনে হলো এই মাটি দো-ভাগ হউক আর আমি তাতে প্রবেশ করি। গৌরো মোড়ালী চরিত্র গুলোর এই চেহারা, এই চরিত্র কোন কালেই পরিবর্তন হয় না। যুগে যুগে তারা কেবল পোষাক বদলায় মাত্র। নতুন বোতলে পুরনো মদের ন্যায় তাদের একশান চিরকাল থেকে যায় ঠিক একই রকম।

সভা ছেড়ে একে একে সবাই উঠে গেলে আমার জ্ঞাতীরা সবাই একত্রিত হলেন। তারা আমাকে ফাং করলেন এবং বললেন- আগামীকাল থেকে আপনি এ গ্রামের কোন ছোয়াইং খাবেন না। বিহারের সকল কাজকর্ম করবেন এবং কলেজে যাবেন। আমরা পালাক্রমে ছোয়াইং দেবো। সে ভাবে কিছুদিন চললো। কিন্তু বিহারাধ্যক্ষ ভণ্ডে এতে দারুণ অস্বস্তি বোধ করছেন দেখে, বাইরে কোন নিমন্ত্রণে না গেলেও জ্ঞাতীদের অজ্ঞাতসারে বিহারে সকলেই এক যোগে আহ্বার করতে শুরু করলাম। আমি অনুধাবন করতে পারলাম আমাকে ভিস্তি করে অচিরেই গ্রামে দলাদলি শুরু হতে পারে। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম গ্রাম ত্যাগ করার জন্যে। কলেজে ভর্তি হওয়াটা এক মস্ত প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো। অনেক গণ্যমান্য ভণ্ডেরা আমাকে তাঁদের নিকট ভিক্ষু হতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু রামকোটের যে ভিক্ষু যুদ্ধের দিনে প্রাণ রক্ষার আশ্রয় দিলেন যে ভিক্ষু একজন ঘোর ধর্ম বিদ্বেষীকে ধর্মানুরাগীতে পরিণত করলেন, যে ভিক্ষু আমার জীবনের এক নতুন গতিপথ নির্দেশ করলেন; তাঁর এতো ঋণ ভার অস্বীকার করা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হয়নি। অথচ জোবরা সুগত বিহারে যত শীঘ্র ত্যাগ করতে পারি ততই একটি গ্রামকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি। এই উৎকণ্ঠায় দিন গুণতে গুণতে প্রায় একটি বছর গত হয়ে গেল। আমার এই উৎকণ্ঠার অবসানে এক সময় রাস্তামাটির লংগদুস্থ তিন টিলায় শ্রদ্ধেয় বনভাঙের আশ্রয় চেয়েছিলাম। কিন্তু, তিনি সম্মতি দিলেন না।

তখন ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী। শিলং এর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হেমেন্দু বিকাশ বড়ুয়া আপন জন্ম ভূমি কদলপুর গ্রামে কলিকাতা ধর্মাংকুর বিহারাধিপতি পণ্ডিত ধর্মধার মহাস্থবিবের ৭২ তম জন্ম জয়ন্তী এবং পরিবাস (ভিক্ষুদের পরিত্রা) ব্রত-

মহাসমারোহে উদ্‌যাপনের আয়োজন করেছেন। সেই পরিবাস ব্রতে আমার গুরুদেবকে পেয়ে আমি একটি কৃত্রিম চাপ সৃষ্টি করলাম আমাকে ভিক্ষু করানোর জন্যে। রামকোট ত্যাগের কারণে তিনি এতোদিন কোন যোগাযোগই রাখেননি আমার সাথে। সেই মান-অভিমান সত্ত্বেও আমার এই চরম চাপের মুখে রাজী হলেন ভিক্ষু করাতে। কিন্তু বিশ্বাস করিনি এতো সহসা তিনি তার ব্যবস্থা করবেন। সকালে বললাম আর বিকেলেই তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন-যাও তোমার বাবা- মা কে আগামীকাল খুব সকালে উপস্থিত করো। সেই সন্ধ্যা সমাগতের মুখেই উর্ধ্ব্বাসে ছুটলাম কদলপুর হতে জোবরায়। মনে আমার সে- কি আনন্দ। রাতে বাড়ীতে পৌঁছেই পরদিন মা- বাবাকে নিয়ে উপস্থিত হলাম। বলা নেই, কওয়া নেই এই বিরাট জন সমাগমের মধ্যেও এক আশ্চর্য নীরবতায় অজ্ঞাত অখ্যাত অনুষ্ঠানের মতো আমার 'উপসম্পদা' অনুষ্ঠানটি হয়ে গেল ঠিক প্রব্রজ্যার দিনটির মতো।

আমার সেদিনের উপসম্পদার তথ্য বিবরণী নিচে প্রদত্ত হলো :

শ্রীমান প্রজ্ঞাবংশ শ্রামণের (১৯৭১ খৃঃ জুন) উপসম্পদা বিবরণী

স্থান :- কদলপুর সুধর্মানন্দ বিহার বঙ্কসীমা

উপসম্পদা তারিখ :- ১২ই ফাল্গুন ২৫১৬ বুদ্ধাব্দ, ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ খৃঃ,

সময় : সকাল ৮:৫ মিনিট

হেমন্ত ঋতু কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথি

উপাধ্যায় :-

শ্রীমৎ প্রজ্ঞাজ্যোতি স্থবির

১ম কর্মবাচা আচার্য :-

শ্রীমৎ আনন্দমিত্র মহাস্থবির

শ্রীমৎ নাগসেন মহাস্থবির

২য় কর্মবাচা আচার্য :-

শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির

শ্রীমৎ সুভূতি মহাস্থবির

৩য় কর্মবাচা আচার্য :-

শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির

শ্রীমৎ জ্ঞানপাল মহাস্থবির

শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির

উপস্থিত সংগীতিকারক ভিক্ষু সংঘের নামের তালিকা :-

- ১। শ্রীমৎ সুভূতি মহাস্থবির (জোয়ারা)
- ২। শ্রীমৎ নাগসেন মহাস্থবির (জোয়ারা)
- ৩। শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির (হাশিমপুর)
- ৪। শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ মহাস্থবির (কুমিল্লা)
- ৫। শ্রীমৎ আনন্দমিত্র মহাস্থবির (ভারত)
- ৬। শ্রীমৎ সুমঙ্গল মহাস্থবির (মায়ানী)
- ৭। শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত মহাস্থবির (কুমিল্লা)
- ৮। শ্রীমৎ যোগানন্দ মহাস্থবির (সাতকানিয়া)
- ৯। শ্রীমৎ জ্ঞানপাল মহাস্থবির (বাঁশখালী)
- ১০। শ্রীমৎ সুমনজ্যোতি মহাস্থবির (হাইদচকিয়া)
- ১১। উঃ পঞঞাওয়াংসা মহাস্থবির (টেকনাফ)

- ১২। শ্রীমৎ সারানন্দ মহাস্থবির (বিনাজুরী)
- ১৩। শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির (বর্তমান উপসংঘরাজ)
- ১৪। শ্রীমৎ সংঘরক্ষিত মহাস্থবির (জোয়ারা)
- ১৫। শ্রীমৎ শ্রদ্ধালংকার স্থবির (কর্তলা)
- ১৬। শ্রীমৎ প্রজ্ঞাজ্যোতি স্থবির (রাংকুট)
- ১৭। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্থবির (পটিয়া)
- ১৮। শ্রীমৎ প্রজ্ঞামিত্র ভিক্ষু (রামু)
- ১৯। শ্রীমৎ জ্ঞানজ্যোতি ভিক্ষু (শিলিগুড়ি)
- ২০। শ্রীমৎ মেধানন্দ ভিক্ষু (জোবরা)

উপসম্পদার দায়ক :-

দানবীর শ্রী হেমেন্দু বিকাশ বড়ুয়া, শিলং পুলিশ বাজার, আসাম, ভারত।

সাধক প্রবর ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথেরো আমার উপসম্পদায় সীমানায়কের দায়িত্ব পালন করলেন। এই বাগী সাধক আমার মতো শিক্ষিত তরুণের ভিক্ষুত্ব গ্রহণের তাৎপর্য বর্ণনা করে সমাজের প্রতি যে বক্তব্য সেদিন রেখেছিলেন তা আমাকে খুবই অনুপ্রাণিত করেছিল। তার জন্যে আমি চিরকৃতজ্ঞ, যদিও মহাস্থবিরের বুদ্ধ পূজা খাওয়া, ভিক্ষুদের বিকাল ভোজন ইত্যাদি কতিপয় বিষয়ে ভদন্ত মহোদয়ের সমর্থন দানকে শুরু থেকেই আমি প্রত্যক্ষ ভাবে বিরোধিতা করেছি। দানবীর হেমেন্দু বাবুও তার পত্নী লতিকা প্রভা সে দিন আমার উপসম্পদার দায়ক হয়ে জীবনের তরে ধর্ম মাতা-পিতার বন্ধনে আবদ্ধ করলেন আমাকে।

কদলপুর শান্তাবাবুদের বিহারে নতুন প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষু সীমায় সর্বপ্রথম আমারই উপসম্পদা হলো। এখান থেকেই শুরু হলো আমার জীবনের আর একটি নতুন অধ্যায়। বুদ্ধের পবিত্র সংঘের একজন সদস্য হলাম ২৫১৫ বুদ্ধাব্দের ১১ই ফাল্গুন, ১৩৭৯ বাংলা, ২৩ ফেব্রুয়ারী শনিবার ১৯৭৩ ইংরেজী। সমগ্র বিশ্বের বৌদ্ধ সংঘ কূলে আমার সভ্যপদ লাভ হলো এই দিনে। পরিবাস ব্রত সমাপ্তির পর জোবরা বিহারে পদার্পন করলাম নীরবে। প্রার্থনা করেছিলাম কবে ছাড়া পাবো এ গন্ডি হতে। শীঘ্রই এক সুযোগ এসে গেলো। আমার শুরুভাই ভিক্ষু জিনসেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি প্রিলিমিনারীতে ভর্তি হয়েছেন। ক্লাশ করার সুবিধার্থে গহিরা শান্তিময় বিহারে (অস্থায়ী মাথের ক্যাং) থাকার ব্যবস্থা করেছেন। অনিবার্য কারণে সমাগত বর্ষাবাসে তার বর্তমান অবস্থান নানুপুর আনন্দধাম বিহার তিনি ত্যাগ করতে পারছেন না। দু'দিক রক্ষা করার জন্যে আমাকে নিরাপদ ভেবে ধরে বসলেন এই একটি বর্ষাবাস যেন আমি গহিরা শান্তিময় বিহার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করি। সানন্দে রাজী হলাম আমি। ১৩৮০ বাংলার ১৭ই আষাঢ় ১৯৭৩ ইং ২রা জুলাই সন্ধ্যার আলো আঁধারিতে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন সে বিহারে ঠিক যেন রামকোটের সেই প্রবজ্যা দিনটির মতো। গ্রামের কিছু বৃদ্ধ বিহার প্রাঙ্গণের সবুজ ঘাসের উপর বসে সন্ধ্যার আড্ডা দিচ্ছিলেন। জিনসেন ভিক্ষু মহোদয় আমার আগমন

উদ্দেশ্য তাদের গোচরিভূত করতেই এক বৃদ্ধ বলে উঠলেন- এস্তো বড়ো বিহার, এতগুলো দায়ক এমন কচি ছেলে, এতো যেন ছাগল দিয়ে হাল চাষ। ভদন্ত জিনসেন তিনি আশ্বস্ত করে বললেন, মাত্র তিনটি মাস আপনাদেরকে কষ্ট দেবো। তার পরেই তো চলে আসছি। তাঁদের সংলাপ শুনে সত্যিই আপন ভাগ্যের প্রতি ধিক্কার দিলাম। ঘরে না ঢুকতেই অপাংতেয় হয়ে গেলাম? এখানেই জন্মান্তরীণ কুশল-অকুশল জীবনে ভরকরে। জন্মলগ্নে মা অসুস্থ। তাঁর বক্ষে আমার জন্যে দুধ নেই। শৈশব থেকেই হাড় ভাঙ্গা খাটুনি। প্রব্রজ্যাটা হলো নীরবে নিভুতে। এতো বিরাট মেলার মধ্যে উপসম্পদাটা হলো কেহ জানে, কেহ না জানে মতো। স্ব-গ্রামের বিহারে হলাম উপেক্ষিত। ভিক্ষু জীবনের শুরুতে প্রথম যে বিহারে আশ্রয় নিতে পা বাড়ালাম, ঢুকতে না ঢুকতেই অবহেলার প্রতিধ্বনি। ভাগ্য কাকে বলে? বস্তুত আমার ফেলে আসা সমগ্র জীবনটার দিকে যখন তাকাই দেখি শুরুটা হয় বড়ো মর্মান্তিক করুণ। ঝড়- ঝাপটা সবদিক থেকে এক সাথেই যেন উপস্থিত হয় দুর্ভাগা জীবনে।

যা-ই হউক, যে বিহারে, যে গ্রাম আমার পরবর্তী জীবনের সাথে গভীর ভাবে আবদ্ধ হয়ে গেল সেই গহিরা গ্রামটি সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। যে বিহারের দায়িত্ব নিতে যচ্ছি তার নাম শান্তিময় বিহার। তার পূর্ব নাম ছিল বৈজয়ন্ত বিহার। রাউজান থানাধীন পশ্চিম গহিরা নামে এক বর্ধিষ্ণু বৌদ্ধ পদ্বীতে হালদা নদীর পূর্বতীরবর্তী এই বিহার। গ্রামটি বহুকাল ধরে হালদা নদীর ভাঙ্গনের ফলে মানচিত্রে পরিবর্তন হলেও বহুকীর্তিমান পুরুষের জন্মে ধন্য পুণ্য এই গ্রাম। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের যে সূত্রপাত হয় তার প্রথম উদ্যোক্তাদের একজনের জন্মভূমি এই গ্রাম। সেই পুণ্যপুরুষ রামমনি মহাস্থবির তৎকালীন প্রচলিত তান্ত্রিক মহাযান বৌদ্ধ মতাদর্শ পরিত্যাগ করে আরকান সংঘরাজ সামমেধ মহাথেরো মহোদয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম দীক্ষা গ্রহণকারীদের একজন। তিনি গহিরা শান্তিময় বিহারের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত একজন ব্যক্তিত্ব। গ্রামবাসী তাঁর শিষ্য চতুর্থ সংঘরাজ বরজ্জান মহাস্থবির (অংঘী মাথে) এবং গুরু রামমনির সমাধি সৌধ রঞ্জিত করেছেন যে বিহারে, সেই শান্তিময় বিহারেই আমার পবিত্র ভিক্ষু জীবনের প্রথম বর্ষাবাস।

নির্মাণাধীন গহিরা শান্তিময় বিহার। সম্মুখের বড়ো বারান্দার ছাদ ঢালাই এর আয়োজন চলছিল। বারান্দা তখনো, টিনের ছাউনি। শোবার কক্ষে সিমেট ভর্তি। বিছানার চৌকি, পাটি, বালিশ সবই জুরা- পীড়িত, ধুলি ধূসরিত। এমন বেসামাল অবস্থা দেখে পরদিন জোবরা থেকে পাটি, বালিশ ও সুজানি নিয়ে আসতে হলো। গৃহী জীবনেই শ্রমের প্রতি ভালোবাসার শিক্ষা পেয়েছি মা- বাবা হতে। তাই লেগে গেলাম চারদিক শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতার কাজে। এভাবে দিন কয় কেটে গেল। এমন সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে উপস্থিত হলেন সেই গ্রামের রামমণি বরজ্জানের বংশজ বৃদ্ধ ভিক্ষু জিনানন্দ ভণ্ডে। তিনি একজন ভবঘুরে প্রকৃতির লোক। দীর্ঘকাল ব্রহ্মদেশে

ফেরী জীবন অতিবাহিত করে দেশ ভ্রমণের প্রচুর অভিজ্ঞতার বিরাট ভাণ্ড নিয়ে জন্ম ভূমিতে ফিরে আসলেন প্রবীণ বয়সে। কিন্তু অসম সাহসী তিনি মনে প্রাণে ও। দৈহিক শক্তিতে প্রচন্ড, এই নবীন লোকটি গৃহী জীবনের বদ্ধ বাতাস মোটেই সহ্য করতে পারলেন না। তাই অচিরেই প্রব্রজ্যা নিলেন মামাতো ভাই গিরিমানন্দ মহাথেরো মহোদয়ের কাছে। প্রব্রজ্যার মুক্ত জীবন লাভ করলে কি হবে বড়ুয়া সমাজে গৃহী পরিচালিত বিহার গুলোর বদ্ধ পরিবেশেও তিনি হাঁফিয়ে উঠলেন অল্পদিনের মধ্যে। দুর্গম পর্বত মালায় শান্ত-নিবিড় জন পদের নীলিম আকাশ তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগলো প্রবল ভাবে। একদিন নীরবে চলে গেলেন তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে। নিতান্ত অগত্বেক হেতু প্রথমে আশ্রয় নিলেন দিঘী নালায় বোয়াল খালী রাজ বিহারে ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথেরো মহোদয়ের সান্নিধ্যে। মহাথেরো সেখানে তখন অনাথ-আশ্রম শুরু করেছেন। আশ্রমের ছেলে ও ভিক্ষু শ্রমণদের অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খলতা ভিক্ষু জিনানন্দ কে ক্রমে প্রতিবাদী করে তুলল। তাই এক সময় নীরবে সে স্থান ও ত্যাগ করলেন তিনি। তারপর থেকে আবার শুরু হলো তাঁর সেই ফেলে আসা ভবঘুরে জীবন। আজ এই বিহারে, কাল অই বিহারে- এ ভাবে চষে বেড়াতে লাগলেন সমগ্র পার্বত্য অঞ্চল। তাঁর জীবনের এই পর্বেই গহিরা শান্তিময় বিহারে আমার সাথে ভস্মে মহোদয়ের সাক্ষাত। বলা প্রয়োজন যে, আমার জন্ম ভূমি জোবরা আর, গহিরা মাত্র দুই থেকে আড়াই মাইলের দূরত্ব। ছোট বেলায় আমার জ্যেষ্ঠ মল্লিকার মায়ের হাত ধরে এই হালদা নদীর সত্তার ঘাট নৌকা যোগে কতবার পারাপার হয়েছি, অথচ কোন বার গহিরা শান্তিময় বিহার বা তার আশে পাশের লোকজনকে জানার সুযোগ শান্তিময় বিহারে আগমনের পূর্ব পর্যন্ত কোন দিন হয়নি। বলতে গেলে ভিক্ষুদের সাথেও ব্যাপক কোন পরিচিতি লাভের সৌভাগ্য ঘটেনি। শ্রদ্ধেয় জিনানন্দ ভস্মের সাথে আমার এই প্রথম সাক্ষ্যাত পরিচিতি।

ভস্মে মহোদয় আমাকে অল্প আলাপে অন্তরঙ্গ করে নিলেন। দিন দুই না যেতেই প্রস্তাব করে বসলেন- আমাকে তিনি পাহাড়ে বেড়াতে নেবেন, কোন ধরনের বিহারে এবারে বর্ষাবাস যাপন করতে যাচ্ছেন তা দেখাবেন। আমিও ভস্মের প্রস্তাব মাত্রই রাজী হয়ে গেলাম- আমার আজন্ম লালিত ভবঘুরে প্রবৃত্তির তাগিদে।

একদিন রওনা দিলাম ভদন্ত মহোদয়ের সাথে। পার্বত্য চট্টগ্রামে এই প্রথম আমার পদার্পন। বলতে দ্বিধা নেই গৃহী জীবনে শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত আত্মীয়- স্বজনের গভির বাইরে বিশেষ কোন পদচারণাই আমার হয়নি। আর আমার আত্মীয়- স্বজনের কেহ কোন দূর-দূরান্তে অবস্থানও করতো না। যতদূর মনে পড়ে নাগরিক জীবনের কিঞ্চিৎ আভাস পেতাম চান্দগাঁও আমার বাবার পিসতু ভাই জ্ঞান বাবুর বাড়ীতে বেড়াতে গেলে। আর বড়ো কোন নদীর আশ্রাদ পেতাম দক্ষিণ ফটিকছড়ি অঞ্চলে ফিরিঙ্গির ঝিল আমার পিসি ও জেঠিমার বাপের বাড়ীতে যাওয়া আসাতে হালদা নদীর সত্তার ঘাট পার হতে গিয়ে। পাহাড়ী ছড়া-খালের আশ্রাদ পেতাম প্রতিনিয়ত

আমার স্বগ্রামেই। কিন্তু বিশাল পার্বত্য ভূমির সেই ধ্যান মৌন নিবীড় আশ্বাদন জীবনে এই প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামের গভীরে প্রবেশ করে। কাণ্ডাই জলবিদ্যুত প্রকল্পের বাঁধটি সৃষ্টি করেছে পাহাড় শীর্ষে বিশাল হ্রদ। ডুবিয়ে দিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্ধাংশ। এই বিদ্যুত প্রকল্প সমতল বাসীকে বৈদ্যুতিক আলোতে উদ্ভাসিত করলে ও অতলে তলিয়ে দিয়েছে লাঞ্ছা পার্বত্য বাসীর সমস্ত ঐশ্বর্য ও সৌভাগ্যকে। চারদিকে সাগরের মতো অথৈ জল। তারই মাঝে সু- উচ্চ পর্বতমালা আকাশের মেঘ আর পৃথিবীর এই বিস্তীর্ণ জলরাশির সাথে এক স্থির সম্পর্ক স্থাপন করে রেখেছে। কোথাও এক ফোটা সমতল ভূমি নেই চাষাবাদ করার। জলের উপরেই যেন ভাসমান সব কিছু। একান্ত শান্ত, নীরব, নিখর চার দিক। প্রকৃতি যেন ভীষণ রণক্লান্ত সৈনিক। রাজ্যমাটির রিজার্ভ বাজার হতে এক যাত্রীবাহী লঞ্চ আমাদের নিয়ে ছুটে চলেছে বরকল ও হরিণা বাজারের উদ্দেশ্যে। তখন বিকাল প্রায় ২টা। হ্রদের জলে আমাদের লঞ্চের চলার শব্দ এবং ভেতরে যাত্রীদের গুঞ্জন ছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই চারদিকে। হ্রদের বিশাল জলধি বক্ষে মাথা উচু করে দাঁড়ানো পর্বত গুলোকে কখনো দূরে কুয়াশাচ্ছন্ন রেখে, কখনো বা একেবারে গা ঘেঁষে অতিক্রম করে চলেছি ঘন্টার পর ঘন্টা। মাঝে মধ্যে দেখা যায় জেলেদের মাছ ধরার দৃশ্য। কখনো বা চোখে পড়ে পর্বতের গায়ে পাহাড়ীদের ছন্ বাঁশের তৈরী মাচাঘর এবং চার পাশে কিছু কলা, আনারস এর সারিবদ্ধ বাগান। বর্ণালী কিছু বুনো পাখী উড়ে যায় পাহাড়ের এক শীর্ষ থেকে অন্য শীর্ষে। শুধু একটি বার দেখতে পেলাম কিছু বানর এক গাছ থেকে অন্য গাছের ঢালে কিচির মিচির শব্দে লাফা-লাফি করছে। বড়ো মাপের কোন জীব জন্তুই এ দীর্ঘ যাত্রায় চোখে পড়লো না। অথচ শুনেছিলাম কতো বুনো হাতি, বাঘ, হরিণের লীলা ভূমি ছিল এই গভীর পার্বত্য অঞ্চল। পথিমধ্যে সুবলং, বরকল ইত্যাদি কিছু বাজারে দোকান পাট ও লোক সমাবেশ দেখলাম যেখানে পার্বত্য বাসীর চেয়ে সমতলের বাসিন্দাদের ব্যস্ততাই সবিশেষ লক্ষ্যণীয়।

দিনের সূর্য ক্রমে বিদায় নিল সু- উচ্চ পর্বতের মাথা হতে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো দেখতে না দেখতেই। লঞ্চের যাত্রীরা ঘাটে ঘাটে নামতে নামাতে আর অবশিষ্ট তেমন নেই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে কৃষ্ণ পক্ষের রাতের আঁধার আরো গভীর হয়ে এলো। সামনে হরিণা ঘাট। সে খানেই আমাদের গন্তব্যস্থল। লঞ্চ যাবে আরো উপরে প্রায় ভারত সীমান্তের কাছাকাছি ছোট হরিণা বাজার পর্যন্ত। এক সময় আমরা আবছা আলো আঁধারির মধ্যে নেমে গেলাম হরিণার চেয়ারম্যান প্রভাত দেওয়ানের বাড়ীর ঘাটে। আমাদের সাড়া পেয়ে তারা সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন বসানোর আসন তৈরীতে। মার্জিত শিক্ষিত পরিবেশ। মনেই হয়না তারাও সেই কুঁড়ে ঘরের পাহাড়ী বাসিন্দাদের কেহ হন। আমার জন্যে শরবত এবং জিনানন্দ ভণ্ডের জন্যে রং চাঁ-এর ব্যবস্থা হলো। চেয়ারম্যান মহোদয় তাঁর বাড়ীর দু'জন কাজের লোক দিলেন ভণ্ডের বোঝা বহন আর বিহার অবধি আমাদেরকে পথ প্রদর্শনের জন্যে। তারা বাঁশের

চোঙ্গায় কেরোসিন আর সলিতা দিয়ে উজালের উজ্জ্বল আভায় ঘোর অন্ধকার রজনী উদ্ভাসিত করে বিস্তীর্ণ চরভূমির রবি শস্যের মাঠ আর চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আমাদের নিয়ে উপস্থিত হলেন ছোট্ট চূড়া যুক্ত বাশের বেড়া আর টিনের ছাউনির একটি মাত্র ঘরে। আর সে-টাই হলো আমাদের গন্তব্যের প্রান্ত বিন্দু। এটা বিহার। এই বিহারেই বর্ষাবাস করবেন ভদ্র জিনানন্দ থেরো।

প্রায় সপ্তাধিক কাল পার্বত্য চট্টগ্রামে ভদ্র মহোদয়ের সাথে কাটলাম। আর পার্বত্য জীবনাচার, খাদ্য-ভোজ্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম প্রচুর। কিন্তু একটি মাত্র দিনের ঘটনা-চিত্র আমার সমগ্র জীবনের অমলীন বেদনাতুর স্মৃতি হয়ে বিরাজ করছে। ছোট হরিণা বাজার। বরকল লাইনে মিজোরাম, লুসাই হিলের কাছাকাছি পার্বত্য বাসীর জন্যে এই বাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্র। কর্ণফুলী নদীর উৎপত্তি উৎস দর্শনের প্রস্তাবে এক দিন খুব ভোরে কিছু খেয়ে এবং মধ্যাহ্ন ভোজের জন্যে আরো কিছু কলাপাতায় বেঁধে নিয়ে সাগ্রহে রওনা হলাম বাজার বারে, সেই ছোট হরিণা বাজার দেখতে। স্থানীয় বোট যোগেই নদী পথে যাত্রা করলাম শুরু। মধ্যাহ্ন ভোজের পূর্বেই পৌঁছে গেলাম বাজারে। দেখলাম বিস্তীর্ণ নদী কাঁঠাল, আনারস, কলা-এসব বাগানী ফসলে বোঝাই করা নৌকায় ভরাট হয়ে গেছে। একটি চাঁ এর দোকানে বসে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজ পর্ব সমাধা করতে গিয়ে কিছু চট্টগ্রামী মুসলমানদের সংলাপ শুনতে লাগলাম। তাদের বক্তব্য- আজকে পাহাড়ীরা একমত হয়ে গেছে ৫/৬শ টাকার নীচে কেহই নৌকা ছাড়বে না। দেখা যাক কতক্ষণ ধরে থাকে খাউপ্লারা। আমরাও কেউ হাত দেবো না। বুঝাতে বাকী রইলনা যে নদীরবুকে মাল বোঝাই নৌকা গুলোই তাদের লক্ষ্য। খাওয়া শেষ করে আমরা উভয়ে কিছু কেনা-কাটা আর বাজার ঘুরে দেখতে বের হলাম। পণ্য সামগ্রী বলতে চোখ ধাঁধানো তেমন কিছুই সমাবেশ নেই কোন দোকানে। কিছু নতুন আর পুরাতন বস্ত্রের দোকান, হাড়ি পাতিলের দোকান; কিছু চাল, ডাল, নুন, তেল আর শুকটি মাছের দোকান- এই মাত্র। তবে, অদূরে লোকজনের বেশ ভিড় জমেছে। দেখলাম পঁচামাছে তৈরী সীদল (নাপুফী) এর বেশ কয়েকটি ঝুড়ি সেখানে।

ধীরে ধীরে বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্য করলাম বস্ত্রতঃ পাহাড়ীরা কিছুই কিনছেন। কেবলই ঘুরাঘুরি ও জটলা করছে। ভক্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। ভক্ত, তাঁর তিষ্ঠ অভিজ্ঞতার ভাণ্ড খুললেন। তাঁর বর্ণনায় আমি সত্যিই দারুণ ক্ষুধ ও উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগলাম। তিনি বললেন শুনতে পাওনি চায়ের দোকানে বদমাশের দল কি যুক্তি করছে। সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকেরা এভাবে বন্দী জীবন যাপন করছে। বড়ো অসহায় এই পার্বত্য দুঃখী মানুষ গুলো। এই বাজারে তারা অনেকেই দু'তিন দিনের পথ অতিক্রম করে মাল বোঝাই নৌকা গুলো নিয়ে এসেছে। মাল-বিক্রি করবে। সেই টাকায় চাল, আলু, শুটকী, সীদল, নুন আর তেল নিয়ে ঘরে ফিরবে। সারা সপ্তাহের রসদ নিয়েই আজ তাদের ফিরতে হবে। কিন্তু, তাদের রক্ত জল করা

উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে বাঁচার ন্যূনতম সন্তুদা নিয়ে বাড়ীতে ফিরে উদ্ধীবি স্ত্রী-প্রত্নের মুখে হাসি ফুটাতে পারবে কি? রক্ত শোষক জোকের দলতো সে সৌভাগ্য তাদের দেবে না। সতিাই দেখলাম মুসলমান ব্যাপারীরা নীরব। মঝে মধ্যে দু'একজন দোকান থেকে উঠে গিয়ে শুধু দর কষাকষি করে, আবার দোকানে ঢুকে পড়ে। এদিকে বেলা যতই গড়াচ্ছে পাহাড়ী নারী পুরুষ গুলোর মুখ শুষ্ক হয়ে উঠছে। তারা চঞ্চল হয়ে উঠছে। হঠাৎ করে একজন হুকার দিয়ে বলে উঠল তোরা আয়। কত দিবি দেয়। মুই নয় খালত ফেলি দিম। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। একতা আর টিকল না। কাঁচা মাল বেপারীরা শুধু এই মোক্ষম সুযোগটার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। ধুম ধাম করে জলের উপরে নৌকার পর নৌকা কলা, আনারস, কাঁঠাল তাদের বড়ো বড়ো ডিঙ্গিতে তুলে নিল, যাদের পণ্য তাদেরই দিয়ে। আন্দাজ করে দেখলাম চার পাঁচটি বড় কলার ছরা রাস্তামাটি রিজার্ভ বাজারে যত টাকায় বিক্রি করা যাবে, আজকে পুরো নৌকার পণ্যের দাম ততও পাচ্ছেনা- এই দুঃখীরা। উৎপাদকের অব্যক্ত বেদনায় মন ভারাক্রান্ত করে ফেরার পথে পা বাড়ালাম। কেবলই কানে বাজতে লাগলো এই বিশ্ব চরাচরে রাজপুত্র সিদ্ধার্থের সেই বাল্যকালের উক্তি,- 'দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, হায়! কত নিষ্ঠুর নির্মম'।

[বিঃ দ্রঃ এ ঘটনাটি ১৯৭৩ ইংরেজীর। তার ঠিক দশ বছর পর ১৯৮৩ তে শ্রীলংকাস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনার মহোদয় বরাবরে বিক্ষুব্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম ও তার সমস্যার সমাধান শিরোনামে আমি একটি দীর্ঘ পত্র লিখেছিলাম গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে। আমার পত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার কয়েকটি দিক্ চিহ্নিত করা হয়েছিল। সে গুলো হলো (১) কাণ্ডাই বাঁধকে সংস্কার করে আধুনিকতম উপায়ে অল্প- জলে অধিক পরিমাণ বিদ্যুত উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এই পদক্ষেপে পার্বত্যবাসী তাদের হারানো ভূসম্পদ ফিরে পাবে। কৃষি নির্ভর পার্বত্যবাসীদের চলমান অস্থির জীবনে স্বস্থিও ফিরে আসবে। (২) সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা- প্রসারের সাথে সাথে নাম সর্বস্ব (ছাত্র-শিক্ষক বিহীন) প্রাইমারী স্কুল গুলোতে শিক্ষাকদের দায়িত্ব পালনকে নিশ্চিত করে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা। (৩) উচ্চ সুদের মহাজনী ব্যবসা বন্ধ করে সরকারী কৃষি ব্যাংক- এর কার্যক্রমে গ্রামীণ ব্যাংক পদ্ধতি ব্যবহারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। (৪) পার্বত্য কৃষি পণ্য উৎপাদকেরা ন্যায্য মূল্য পাওয়ার ব্যবস্থা করা। (৫) যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি ঘটানো। (৬) পার্বত্য বাসীকে বৃটিশ পদ্ধতিতে প্রশাসনিক সুবিধা প্রদান করা, (৭) তাদের স্বকীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি রক্ষার সুযোগ দান করা এবং (৮) এ দেশের বৃহত্তর জন গোষ্ঠীর সাথে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে নৈকট্য সম্পর্ক গড়ে তোলার দীর্ঘ মেয়াদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে বড়ুয়া ভিক্ষুদেরকে মাধ্যম হিসাবে কাজ করতে দেয়া।

শ্রীলঙ্কায় তখন আমি সহ আরো বেশ কয়েকজন বাঙ্গালী ডিস্কু শ্রমণ অধ্যয়নরত ছিলাম। একদিন ইংরেজী ও সিংহলী দৈনিকে দেখলাম পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারী বাহিনী ও শান্তিবাহিনীর সাথে ব্যাপক সংঘর্ষ ও বহু বৌদ্ধ নর-নারীর হতা-হতের খবর। এই সংবাদের প্রেক্ষিতেই বাংলাদেশ দূতাবাসে আমার উক্ত প্রত্ন লেখা।]

পূজ্য জিনানন্দ ভণ্ডে আমাকে শান্তিময় বিহারে পৌঁছে দেয়ার জন্যে আবার গহিরায় আসলেন। এসেই দিন বাদে চলে গেছেন। পহাড়ে সদ্য- আনারসের রস খেয়েছিলাম প্রচুর। মশা এবং পোকাকার কামড় ও প্রচুর। ক্রমে জ্বর জ্বর ভাব শুরু হতে না হতেই প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হলাম। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তার ভবতোষ বাবু ছুটি নিয়ে বাড়ীতে এসেছেন। শান্তিময় বিহারের পেছনেই তাঁর বাড়ী। তাঁকে বিহারে আসার জন্যে লোক পাঠানো হলো। তিনি আসলেন। দেখে শুনে কিছু ঔষধ ও বেশী করে গরুর দুধ খাওয়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু দুধ খেতে না খেতেই পেটে ভীষণ বায়ু সঞ্চর হলো। তরল বাহ্য ও সাথে সাথে বমি শুরু হলো। এক পর্যায়ে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। পরে জানতে পারলাম পরমানন্দ বাবুর মা নামে এক উপাসিকা আমার এই মরণ সংকট দেখে বাড়ীতে গিয়ে ছেলেকে বললেন- তোমরা বিহার কমিটির লোক। কেন নীরব রয়েছে? কোন মা- বাপের সন্তান আমাদের বিহারে এসে এমন অসহায় ভাবে মারা যাবে- তা কি ভালো হবে? দয়াবতী উপাসিকর এমন কাতর উক্তির প্রেক্ষিতেই নাকি আমার মতো অজ্ঞাত, অখ্যাত, নবাগত, তরুণ ডিস্কুর সেদিন জীবন রক্ষা পেয়েছিল। পরমানন্দ বাবু উদ্যোগী হয়ে পাড়াময় চাঁদা তুলে রাউজান ফকির হাট হতে নীরেন্দ্র সরকার নামে এক প্রবীণ অভিজ্ঞ ডাক্তারকে আমার চিকিৎসার জন্যে এনেছিলেন। ডাক্তার এসে সব দেখে শুনে ঔষধ নির্বাচন করলেন। বললেন, অবস্থা খুবই সংকট জনক। তিনি গরম স্যালাইন দিলেন। পরামর্শ দিলেন হুঁ ফিরে না আসা পর্যন্ত অবিরাম মাথায় জল ঢালতে হবে। ৩/৪ ঘণ্টার মধ্যে জ্ঞান না ফিরলে বাঁচার আশা নেই। সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। আমি অনুভব করলাম, আমি শুয়ে আছি। আমার মাথায় নল হতে অবিরাম জলধারা ঝরছে। প্রচুর লোকসমাগম হয়েছে। কেন এমন হয়েছে? আমি কোথায় আছি? আমার কি হয়েছে? এভাবে মনে মনে প্রশ্ন করতে করতে এক সময় চোখ খুললাম। চোখ খুলেই দেখলাম আমার মা। অশ্রু সজল নয়নে আমার দিকে চেয়ে আছেন। জোবরা গ্রামের আত্মীয় স্বজন অনেকেই আছেন। শান্তিময় বিহারের পাখবর্তী ছেলে-মেয়েরা নলকূপ থেকে অবিরাম জল টানছে। আমার শয়ন কক্ষ জলে একাকার হয়ে গেছে। সব দেখে আমার স্মরণ হলো আমি অসুস্থ ছিলাম। জানতে পারলাম গহিরা থেকে কে বা কারা গিয়ে আমার সংকটাবস্থার সংবাদ দিয়েছিলেন জোবরায়। মা ও আত্মীয়রা ছুটে এসে ছিলেন। আমার মরণাপন্ন অবস্থা দেখে মায়ের বুক ফাটা আতর্জনাদে উপস্থিত সকলেই না- কি শোকাভূত হয়ে পড়েছিল। এই তো সংসার। এই

তো জীবন। প্রিয়ের বিচ্ছেদ যজ্ঞাণা, অপ্রিয়ের সংযোগ যাতনায় নিত্য কবলিত এই জীবন।

আমার সার্বিক তদারকি ও রিপোর্ট পেশের ভার ডাঃ নীরেন বাবু নিজেই দিয়ে গিয়েছিলেন ডাঃ অনন্ত বাবুর উপর। জ্ঞান ফিরে আসার পর ডাক্তারের পরামর্শে বিকালে হরলিক্স খাওয়ার পরামর্শ এলো ডাক্তার হতে। গহিরার স্থানীয় সাধু মা মনসী বালা এবং রামু সীমাবিহারের দায়িকা অপর এক সাধু মা আমার সেবায় নিয়োজিত হলেন। তাঁদের এবং ডাঃ অনন্ত বাবু ও তাঁর পরিবারের অকৃত্রিম সেবা যত্ন আমার এই নশ্বর জীবনকে চির ঋণী করে রেখেছে। বিকালে হরলিক্স পান দু'একবার করার পর আর খেতে পারলাম না বিবেকের তাড়নায়। করণ, আমি জানি যে, এই হরলিক্স বিকালে খাওয়ার অযোগ্য অনেক উপাদানে তৈরী। তাই ভিক্ষু বিনয় বিরোধী বিকাল ভোজনের অন্তর্গত। আর এই পানীয় ব্যবহার করতে পারলাম না। ডাক্তারের পরামর্শে এক মাস যাবত পুরনো চালের ভাত এবং লঘু পাচ্য ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করতে হলো। তার দায়িত্ব নিলেন ডাঃ অনন্ত বাবু ও তাঁর সহ-ধর্মীনি নিজেই। এভাবে ক্রমে আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলাম।

দিনটি ছিল ২৫১৬ বুদ্ধ বর্ষের ১৩ শ্রাবণ ১৩৮০ বাংলা, ১৯শে জুলাই ১৯৭৩ ইংরেজী। শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা।

আমার পবিত্র ভিক্ষু জীবনের প্রথম বর্ষব্রত শুরু দিন এটি। এই পূর্ণিমার দিনে ডাঃ অনন্ত বাবুর ছেলে অপূর বিশেষ উৎসাহে পাড়াময় ঘুরে খোল-করতাল বাজিয়ে, কীর্তন গেয়ে গেয়ে মহা সমারোহে আয়োজন হয়েছিল বুদ্ধ পূজার। কিন্তু বিকালে প্রদীপ পূজায় মন্দিরে মাত্রাতিরিক্ত আরতি করতে গিয়েই বিহার পরিচালনা কমিটি ও মৈত্রী সংঘের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হলো। মৈত্রী সংঘকে বিহারে কার্যালয় স্থাপন করতে না দিলে, চলতে থাকলে তাদের অনুষ্ঠান বর্জন আন্দোলন। শুরুতেই তো সব বিকলাঙ্গ ভাব। যুবকদের প্রথমে যেই ঐক্যবদ্ধ প্রাণবন্ত ভাব দেখে ছিলাম তাতে আমি যথেষ্ট উদ্দীপিত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম তাদের ভ্রাতৃ প্রতিম হৃদয়তায় আমার অনেক দুর্বলতা কেটে যাবে। কিন্তু, আমার জন্মান্তরীন কর্মতো জটিল। অতি কষ্টের মাঝেই যেন কিছু মিলে। আষাঢ়ী পূর্ণিমা উৎসব দিনে বিহার কমিটি বনাম মৈত্রী সংঘের দ্বন্দ্ব, যুবকদের ক্রমাগত অসহযোগের মাঝে প্রতিটি অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা অনুষ্ঠানে আমার নিজস্ব উপায় কৌশল নির্ভরই আমাকে হতে হল। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের স্ব-রচিত গাথা ও কবিতা আবৃত্তি শিখায়ে এবং সংঘ দানে প্রাপ্ত খাল, গ্লাস, খাতা, কলম- এগুলো দিয়ে পুরস্কারের ব্যবস্থা করে উদ্দীপনা সৃষ্টির ব্যবস্থা করলাম। এই উপলক্ষে শিশুদের তাদের একত্রিত করে পূর্ণিমা উৎসবাদিতে গাছের ডাল-পালা দিয়ে বিহার সজ্জা, বিহারের কাঁচা বারান্দা লেপন, প্রাঙ্গন পরিচ্ছন্নতা- ইত্যাদি কাজ বেশ সুন্দর ভাবেই সমাধা করতে থাকলাম। এতে অভিভাবক মন্ডলীর মধ্যে ও

যথেষ্ট উৎসাহ, আগ্রহ পরিলক্ষিত হলো। পূর্বে উপোসথ দিবসে ডাঃ অনন্ত বাবু, কবিরাজ উপেন্দ্র বাবু এবং বাটুর বাপ তাঁদের বৈকলিক পুষ্টি পাঠ ও জাতক পাঠই ছিল উপোসথিকদের মনের খোরাক। আমি এ চিরাচরিত নিয়মে কিছু ব্যতিক্রম যোগ করলাম; ধ্যান এবং ধর্মদেশনা। বলাবাহুল্য মনের ভাব দশজনের সম্মুখে প্রকাশের চর্চা জেবরা পন্থী উন্নয়ন সমিতির কান্ডারী প্রীতিভূষণ চৌধুরী দৌলতে ছোট বেলা থেকেই হয়েছিল। আর ধ্যান ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের চর্চা হয়েছিল রামুর রামকোট বনাশ্রমে আমার প্রব্রজ্যা জীবনের একমাত্র প্রেরণা দাতা গুরুদেব ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাশয়ের সান্নিধ্যে এক বছর কালের শ্রামণ্য জীবনে। পুরোহিত জীবনে নবাগত হলেও গ্রামীণ জীবনে সৃষ্টিশীল রাজনৈতিক ও সমাজ কল্যাণ মূলক চেতনায় সমৃদ্ধ ছিলাম আমি। উপরোক্ত অনুকূল্যতায় গহিরা গ্রামের সর্বস্তরের বিমুক্ত শ্রদ্ধা ভক্তিতে অচিরেই আবদ্ধ হয়ে পড়লাম ভীষণ ভাবে। কিন্তু, এ বিহারে আমি তো তিনটি মাসের অতিথি মাত্র। একটি দু'টি করে দিন দ্রুত গড়িয়ে চললো। দেখতে না দেখতেই প্রাবরণা পূর্ণিমা উপস্থিত হলো। সকলের মুখে এক কথা- এ বারের বর্ষব্রতে গ্রামের আবাল- বৃদ্ধ- বণিতার যে রূপ অংশ গ্রহণ হয়েছে এ বিহারের ইতিহাসে এমনটি কোনবার হয়নি। চীবর দান সমাপ্তির পরে আমি চলে যাব- এ কথাটির প্রতি লক্ষ্য রেখেই সারাদিনের প্রতিটি বক্তব্যে সকলের প্রতি আমার সকল দুর্বলতা, ত্রুটি বিচ্ছুর্তির জন্যে ক্ষমা উদার দৃষ্টি কামনা করলাম। কারণ আপামর সকলের থেকে বিদায় নেয়ার একান্ত সুযোগ আর আসবে না। আমার বক্তব্যের উল্ঠো প্রতিক্রিয়া গুরু হলো বিদ্যুত গতিতে। গ্রামবাসীরা বিহার কমিটির উপর চাপ সৃষ্টি করলো, আমাকে যে কোন মূল্যে রাখতেই হবে। যে ভিক্ষুকে (জিনসেন ভণ্ডে) তারা স্থায়ীভাবে এ বিহারে থাকার অমন্ত্রন জানিয়েছেন সেই ভণ্ডের ফাং ঠিকই থাকবে। পাশাপাশি আমাকে ও চাই। শান্তিময় বিহারে দু'জনই দরকার, এই-ই হলো তাদের বক্তব্য। আমি জানি এ বিহার ত্যাগের প্রস্তাবিত নানুপুর বিহারে আমার যাওয়া সম্ভব নহে। কারণ, তখন আমি হাট হাজারী কলেজের আই, এ, ফাইনাল ইয়ারে অধ্যয়নরত। আমার অসহায়ত্ব সম্পর্কে সচেতন থেকে ও গহিরা শান্তিময় বিহারে থাকা অন্যায় মনে করলাম। এজন্যে যে, দয়কদের দৃষ্টিতে আমরা দু'জনের গুরুত্ব সমান হলে উভয়ের মধ্যে ব্যক্তিত্বের প্রশ্ন মাথা ছাড়া দিতে পারে। ফলে আমার অবস্থান জিনসেন ভণ্ডের মনো বেদনার কারণ হতে পারে, তাই আমি দায়কদের সকল আবেগ উপেক্ষা করে একদিন আপতঃ কালীন আমার গুরুর আশ্রয়ে চলে গেলাম গহিরা থেকে বহু দূরবর্তী স্থান বিবেচনা করে। কারণ আমার পূর্ব অবস্থান জোবরা গহিরার খুবই নিকটবর্তী। দায়কদের আনাগোনা, উপদ্রব বাড়ার সম্ভাবনা আছে।

ফল উল্ঠো হলো। কিছু দিন না যেতেই তৎকালীন বিহার কমিটির সেক্রেটারী কৃষ্ণ জীবন বাবু এক সন্ধ্যায় রামকোটে উপস্থিত। আমি আগমণ কারণ কিছুটা আন্দাজ

করতে পেরেও একটু আশ্চর্য ও কৌতুহলী হলাম। তাঁর মতে এই আগমনের উদ্দেশ্য আমাকে সাথে করে নিয়ে যাওয়া। গহিরার উপাসিকারা বিশেষ করে জোর প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে আমাকে বিহার কমিটি কেন যেতে দিল, এই প্রশ্নে। আমি বললাম, একান্তই যদি তারা আমাকে চায় আমার যাওয়া না যাওয়া সম্পূর্ণ নির্ভর করে জিনসেন ভণ্ডের মতামতের উপর। একথা বলতেই তিনি জিনসেন ভণ্ডের একটি চিঠিও বের করে দিলেন। ভণ্ডের বক্তব্য এই, আয়ুশ্মান প্রজ্ঞাবংশ; দেখলাম গহিরার লোকেরা তোমাকে পেলেই অধিক সুখি হবে। আমি তাই, শান্তিময় বিহারের দায়িত্ব ত্যাগ করে নানুপুরে অবস্থানই শ্রেয় মনে করি। ভণ্ডের এই চিঠিতে আশাভঙ্গের যে বেদনা পরিস্ফুট, তা আমাকে খুবই আহত করলো। তাই, শান্তিময় বিহারে ফিরে আসতে কিছুতেই সায় দিতে পারছিলাম না। কৃষ্ণ জীবন বাবু অনেক বলার পর শেষতক রাজি হলাম এ যুক্তিতে যে, আমি না গেলেও অন্য ভিক্ষু আসবে, কিন্তু জিনসেন ভিক্ষু আর আসবেন না। এক্ষেত্রে যারা আমাকে পাওয়ার জন্যে জিনসেন ভিক্ষুকে আশাভঙ্গের বেদনা দিল, তাদের চোখে আমার প্রত্যাখ্যানটা কোন পর্যায়ে দাঁড়াবে? সত্যি আমি এমন একটি বিতর্কের সমাধানে অক্ষম হয়েই-আবার গহিরা শান্তিময় বিহারে এলাম মনটা খুবই অপরাধীর মতো করে।

ক্রমে গহিরা শান্তিময় বিহার কে ঘিরে আমার জীবনের কর্ম মুখর এক নতুন অধ্যায় শুরু হলো। আমার সহায়তার জন্যে মা- বাবাকে রাজি করিয়ে আমার ছোট ভাই অশোককে নিয়ে আসলাম। সে তখন বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। পশ্চিম গহিরা স্কুলে তাকে ভর্তি করে দিলাম। বিহারের সম্মুখস্থ বিশাল বারান্দা তথা হলঘরের ছাঁদ ঢালাই এর জন্য ভিমরাজ মহাজনের বর্মী স্ত্রী বিহারের দীর্ঘ দিনের সাধু মা- এই অশীতি পর বৃদ্ধা একটি একটি করে অনবরত ইট- ভাঙতে ভাঙতে কংক্রীটের বিশাল স্তম্ভ করে ফেলেছিলেন আমি আসার বহু আগে। অন্যদিকে মহিপাল নামে এক ভিক্ষু ঘরে ঘরে মুষ্টি চাল ভিক্ষা করে করে ইট, লোহা, সিমেন্ট ক্রয়ের প্রাথমিক তহবিল করে দিয়েছিলেন গহিরা শান্তিময় বিহারে। হল ঘরের ছাদের ঢালাই কর্ম খুব জরুরী দেখে আমি আমার ছোট ভাইকে নিয়ে কাদা মাটিতে ডুবে যাওয়া কংকর গুলো পাশের কুঁয়োয় ধুঁয়ে ধুঁয়ে ঢালাই এর কাজে ব্যবহার যোগ্য করে দিলাম পূণ্য চেতনায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে। ক্রমে উপাসক উপাসিকাদের উদ্বুদ্ধ করে বিহারের দু'পাশে দু'টি কক্ষ সম্প্রসারিত করলাম। বিহারের সম্মুখে পুষ্করগী খননের পর সকলকে উদ্বুদ্ধ করে সর্বত্র নারিকেল, সুপারির চারা লাগিয়ে দিলাম। আমার আগমন সময়ের বৃক্ষ শূন্য বিহার চত্বরকে কালে ছায়া সুনিবীড় করে তোলা হলো।

শান্তিময় বিহারের এসকল উন্নয়ন মূলক কর্ম- কান্ডের পাশাপাশি আমার দীর্ঘ দিনের এক অব্যক্ত বেদনার উপশমে হাত দিলাম। ইতিমধ্যে আমি অই, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে বি, এ, অনার্স কোর্স এ ভর্তি হলাম। ইচ্ছা

ছিল পালি বিভাগে ভর্তি হবো। কিন্তু, তখনো পালিতে অনার্স কোর্স চালু হয়নি। প্রতিদিন সকাল ৮টায় সাধারণ যাত্রীবাহী গাড়িতে করে একজন প্রব্রজিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ করতে যাওয়া এবং ক্লাশ করার তিন্ত অভিজ্ঞতার কথা পরে বলবো। কিন্তু, মঘাশাস্ত্রী বাসটপেজ এর বট বৃক্ষের নীচে প্রতি দিনকার অপেক্ষামান মুহূর্ত গুলোর বেদনাময় ভাবনার কথাই আগে বলি। দেখতাম মুসলিম শিশুরা কিতাব গলায় ঝুলায়ে বসার আসন বগল দাবা করে আমার সম্মুখ দিয়ে প্রতিদিন চলে যায় সম্মুখের মসজিদ সংলগ্নে মন্ডবে। মৌলানা সাহেব সবাইকে দিয়ে উচ্চস্বরে আরবীতে নামাজ, কালাম ও ইসলামিক আচার বিধিগুলো শিক্ষা দেন। তাদের প্রতিটি শব্দ আমার বিবেককে দারুণ ভাবে বিদ্ধ করতো। নিজেকে প্রশ্ন করতাম হে বৌদ্ধ ধর্মগুরু প্রজ্ঞাবংশ! তুমি চলেছ কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়ে ক্লাশ করতে; আর মুসলিম ধর্ম গুরুরা ধর্ম শিক্ষা দিচ্ছেন তাদের সন্তানদের। কত বড়ো অভাগা, কর্তব্য জ্ঞানহীন ধর্মগুরু তুমি। কোনটি তোমার আসল কাজ? কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়া, না-কি যাদের চতুঃপ্রত্যয়ে ধর্মগুরু হিসেবে জীবন ধারণ করছো তাদের আগামী প্রজন্মকে ধর্মজ্ঞান দানে সমৃদ্ধ করা? বহুদিন যাবত এভাবে আত্ম দংশনের জ্বালায় ভোগ করার পর শান্তিময় বিহারে প্রভাতী ধর্ম শিক্ষার জন্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করলাম। যে হেতু আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ সকালে এবং ক্লাশ শেষে ফিরে এসে বিকালে খুবই পরিশ্রান্ত বোধ করি, তাই সপ্তাহে ছুটির দিনেই কেবল এ ধরনের ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার প্রচার চলাতে লাগলাম। প্রচারের প্রক্রিয়া হিসেবে সর্বপ্রথমে চন্দ্রনাইশ ধানাদীন হাসিমপুর সুনন্দারাম বিহারাদ্যক্ষ ভদন্ত বুদ্ধ রক্ষিত মহাথেরো মহোদয়কে আহ্বান করে রাতে এক ধর্ম সভার আয়োজন করলাম। উক্ত ধর্ম সভায় ভদন্ত মহোদয় তাঁর শ্রীলংকা অবস্থানকালীন শ্রীলংকায় বিহার গুলোতে শিশু ধর্ম শিক্ষার অভিজ্ঞতা এমন সুন্দর, এমন হৃদয় গ্রাহী করে বক্তব্য রাখলেন যে, তাতে উপস্থিত সকলে সবিশেষ উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। আমার প্রস্তাবে পরবর্তী সপ্তাহ হতেই সপ্তাহের ছুটির দিনে শান্তিময় বিহারে শিশু ধর্ম শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হলো। আমার দীর্ঘদিনের বিবেক দংশনের জ্বালা কিছুটা লঘব হলো। প্রথমে উপস্থিতি সংখ্যা ছিল মাত্র ১০/১২ জন। এতে আমি মোটেই হতোদ্যম হইনি। প্রচার চলাতে লাগলাম। ধর্ম শিক্ষার সুফল সম্পর্কে সেখানেই দু'চার জনকে একস্থানে পাই সেখানেই বলতে থাকলাম। আমার প্রচারের নমুনা ছিল- (১) ধর্ম অমানুষকে মানুষ বানায়। (২) ধর্মহীন লোক পশুর সমান। (৩) ধর্ম শিক্ষা করলেই মানুষ জানতে পারে, বুঝতে পারে কোনটা হিত, কোনটা অহিত। (৪) মা- বাবা সন্তান জন্ম দিয়ে গা গাতরে বড়ো করলে কি হবে, যদি সন্তানকে ধর্ম জ্ঞান দেয়া না যায়। কি হবে এম, এ, পাশ করেও যদি সন্তান ধর্মজ্ঞানের অভাবে বড়ো মা-বাবাকে বোঝা মনে করে অশেষ দুঃখ দেবে। ধর্মজ্ঞানের অভাবে বড়ো ছোট গুরু জ্ঞান হারা হয়ে থাকে। তাই সন্তানদের শৈশব থেকেই ধর্ম- শিক্ষা দিন; ইত্যাদি।

তিথি, শ্রাদ্ধ, সংঘদান, উপোসথ, পূর্ণিমা, মৃতবাসরে পর্যন্ত বক্তব্য রাখতে গেলেই প্রসঙ্গ ক্রমে শিশু ধর্ম শিক্ষার সুফল বর্ণনা করা যেন আমার একমাত্র ব্রত হয়ে উঠল। তার সুফল পেতে শুরু করলাম। শান্তিময় বিহারে শিশু ধর্ম শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমে বাড়তে বাড়তে নব্বুই জনে পর্যন্ত পৌঁছল। ত্রিশের কোটা অতিক্রম করেতেই আমি একার পক্ষে সামাল দেয়া কষ্টকর হয়ে পড়লো। সংঘরাজ শীলালংকার মহাধেরো মহোদয়ের শিষ্য জ্ঞানালোক (সুশান্তির মার ছেলে মাদল) তখন আমার শ্রমণ ছিল। সপ্তম শ্রেণীতে থাকা অবস্থায় তাকে প্রব্রজ্যা দিয়ে ছিলাম। নাম ছিল তিলোকাবংশ। দশম শ্রেণীতে টেষ্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে একরাতে সে পালিয়ে গিয়েছিল। মিরেরসরাই তুলাবাড়ীয়া থেকে সন্ধান করে এনে সংরাজ মহোদয়ের নিকট পরে শিক্ষার্থে দিয়েছিলাম। কিন্তু, আপন শিষ্য না হলে তিনি ধর্ম বিনয়ে শিক্ষাদানে অনীহা দেখালে তিলোকাবংশের উপর আমার সম্পূর্ণ দাবী প্রত্যাহার করলে, তিনি তার নাম, ধাম সব পরিবর্তন করে বিনাজুরী গিরিমানন্দ ভণ্ডের বিহার সীমায় উপসম্পদা প্রদান করলেন। সে জ্ঞানালোক ভিক্ষু নামে আত্ম-প্রকাশ করল। আমি বলতে চাইছিলাম গহিরা শান্তিময় বিহারের প্রভাতী শিশু শিক্ষা নিকেতনের শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আমার শ্রমণ তিলোকাবংশ এবং মাষ্টার প্রফুল্ল বাবুর সহায়তা আমাকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ দিল। তাদের সহায়তা পেয়ে ধর্মীয় শিক্ষার পাশা পাশি স্কুলের পাঠ্য বইও কিছু কিছু পড়াতে শুরু করলাম। ফলে শিশু ও তাদের অভিভাবকদের আশ্রয় আরো বেড়ে গেল। এভাবে শান্তিময় বিহারের প্রভাতী শিশু শিক্ষা একটি সাবলীল গতি লাভ করলো। কিন্তু বছর কয়েক না যেতেই হঠাৎ করে শ্রামণ তিলোকাবংশ যে শান্তিময় বিহার ত্যাগ করলো তা উল্লেখ করেছি। আমার ভাই অশোক অনেক আগেই জোবরায় চলে গেছে ফলে প্রভাতী স্কুলের গতি মছর হতে বাধ্য হলো। চেষ্টা করলাম বিহার উন্নয়নের ফাণ্ড দিয়ে একজন বেতন ভুক্ত গৃহী শিক্ষক নিয়োগ করার। কিন্তু, তা পাওয়া সম্ভব হলো না। তারা আমাকে মাসিক হাত খরচ স্বরূপ ৬০ টাকা করে দিত। তিথি শ্রাদ্ধ এসব থেকে যা পেতাম- শ্রামণ, সেবক এদের ভরণ পোষণ শিক্ষা- দীক্ষা, নিজের লেখাপড়ার খরচ সব মেঠাতে মাঝে মাঝে কষ্টকর হয়ে দাঁড়াতো। আমার কষ্ট দেখে শেষ পর্যন্ত তারা আমার জন্যে ১০০ টাকা পর্যন্ত বর্ধিত করেছিলেন। কিন্তু ১০০ টাকার নীচে কোন শিক্ষক নিয়োগ তখন অসম্ভব ছিল। তারপরও অতিকৃচ্ছতার মাধ্যমে চলছিল বিদ্যালয়টি।

ঃ আমার দৈনিক রুটিন ছিল :

ভোর - ৩টা- ৪টা-৩০মিঃ অধ্যয়ন অথবা লেখা, ৪-৩০মিঃ- টো যোগব্যায়াম, ৫টা- ৬-৩০টাঃ প্রাতঃকৃত্য ও স্নান এবং বন্দনা ও প্রাতঃরাশ গ্রহণ,
সকাল- ৬-৩০মিঃ- ৯-৩০মিঃ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, বাগান পরিচর্যা, শিশু শিক্ষা, ১০-৩০মিঃ-১১-৩০মিঃ স্নান এবং মধ্যাহ্ন ভোজ।

বিকাল- ১২টা-১২-৩০মিঃ বিশ্রাম, ১২-৩০মিঃ ২-৩০মিঃ অধ্যয়ন ও শিক্ষাদান, ২-৩০মিঃ-৪-৩০মিঃ গণ সংযোগ, অধ্যয়ন ৪-৩০- ৫-৩০ বাগান পরিচর্যা, ৫-৩০-৬-৩০মিঃ চংক্রমণ, পরিচ্ছন্নতা,

সন্ধ্যা- ৬-৩০মিঃ-৭টা বন্দনা, ৭টা-৭-৩০মিঃ গণ সংযোগ তথা ধর্মালোচনা, সূত্রপাঠ ইত্যাদি,

রাত- ৭-৩০মিঃ- ৯টা অধ্যয়ন, ডায়েরী লিখা।

বিগ্ধঃ সভা বৈঠকে রাতের কাজ সম্ভব না হলে অধিক ভোরে তা সমাপ্ত করতে হবে। এভাবেই দৈনিক রুটিন ভিত্তিক আমি সময়কে কাজে লাগাতাম।

আমার জীবনে প্রথম ডায়েরী লেখা শুরু হয় ১৯৭৭ ইংরেজীর ১লা সেপ্টেম্বর হতে অনিয়মিত ভাবে। দৈনান্দিন কার্যাবলী এবং গুরুত্ব পূর্ণ চিন্তা পরিকল্পনা সমূহের সংক্ষিপ্ত নোট গুলোর তারিখ উল্লেখ করে লিখে রাখতে পরামর্শ দিয়ে ছিল গহিরা শান্তিময় বিহারের দায়ক বাবু যামিনী বড়ুয়ার ছেলে আমার প্রিয় ভাজন স্বপন বড়ুয়া (আনার)। সে বয়সে আমার ছোট হলেও বিশ্ববিদ্যালয় জীবন হতে আমার সহপাঠী হয় একই বর্ষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা অনার্স এ ভর্তি হয়ে। ফলে ১৯৭৪ ইংরেজী হতে ১৯৮০ইংরেজীতে এম, এ, ফাইনাল পরীক্ষা পর্যন্ত সে আমার সহপাঠী হিসেবেই থাকে। এম, এ, পাশের পর সে আমার আবাল্য সাথী দিপাল বড়ুয়াদের পরিচালিত গ্রামীণ ব্যাংক এ চাকুরী নেয়। এই স্বপন একদিন আমার হাতে পুস্তক সাইজের বাঁধাই করা সাদা কাগজের একটি খাতা দিয়ে বলেছিল,- ভগ্নে আপনি এই খাতাকে দৈনন্দিন কাজ কর্মের সংক্ষিপ্ত নোট লিখে রাখার কাজে ব্যবহার করুন, ভবিষ্যতে কাজে আসবে। আমরা গৃহী মানুষদের আত্ম জীবনী মূল্যবান হয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বা বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন হতে পারলে। কিন্তু আমাদের সমাজে ভিক্ষুদের জীবনী তো অহরহ প্রকাশিত হচ্ছে অথচ সঠিক তথ্যের অভাবে অতিদ্রিষ্ট ভাবে, এবং প্রায়ক্ষেত্রে কাল্পনা আশ্রয়ে। তার কারণ, ভগ্নেরা তিথি- শ্রাদ্ধের তারিখ লিখেন, কিন্তু কেহই ডায়েরী লিখে রাখেন না।

স্বপনের সেদিনের কথা গুলো আমার নিকট বিশেষ তাৎপর্যবহ হয়ে ধরা দিল। আর সেই থেকে তার প্রদত্ত খাতাটিতেই শুরু হলো আমার জীবনে ডায়েরী লেখার অভিযাত্রা। প্রথম প্রথম ইহা লিখতে খুবই বিরক্তি বোধ হতো। কি লিখব তাও বুঝে উঠতে পারতাম না। তাই কেবল প্রতিদিন কার সাথে দেখা হচ্ছে, কোথায় রাত কাটালাম, সকাল ও মধ্যাহ্ন ভোজটা কোথা হলো- ঠিক এসব বিষয়েই লিখতাম। আর তা-ও লিখা হতো অনিয়মিত। ক্রমে প্রতিদিন ডায়েরী লিখা আমার নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়। সেই ১৯৭৭ ইংরেজী শেষার্ধ্বে এই ডায়েরী লিখা শুরু করে আজ ১৯৯৭ ইংরেজী মাঝামাঝি যখন সেদিনের ডায়েরীর পাতা গুলো উলঠাতে শুরু করলাম তখন স্বপনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় অন্তর ভরে ভরে উঠছে। তার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই আজ আমার আত্মজীবনী একটি নির্ভর যোগ্য দলিলে পরিণত হতে যাচ্ছে।

১৯৭৭ ইংরেজী :-

১/৯/১৯৭৭ ইংরেজী আমার প্রথম দিনের ডায়েরীতে নিম্নোক্ত বিক্ষিপ্ত তথ্য গুলো সংগৃহীত করা হলো- (১) মাথের নিকায়ের প্রধান রূপকার ও পৃষ্টপোষক উকিল উমেশ চন্দ্র মুৎসুদ্দি মহোদয়ের সাথে পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের যে কলম যুদ্ধ চলে তাতে নিকায় বিভ্রাট প্রসঙ্গে উমেশ মুৎসুদ্দি মহাশয়ের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হয়- (ক) সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির চট্টগ্রাম আগমনের সন উল্লেখ করতে গিয়ে শ্রিয়দর্শী স্থবির কৃত মূলতত্ত্বে দেখা যায়- ১২২৬ মঘাব্দ বা ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ, সদ্ধর্ম রত্নাকরে দেখা যায়- ১২২৭ মঘাব্দ বা ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ- এই পার্থক্য কেন? আসলে কোনটা সঠিক এবং তারা এই তথ্য সংগ্রহ করলেন কে কোথেকে? (খ) সারমেধ মহাস্থবিরকে রাধাচরণ মহাস্থবির ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম আনায়নের পূর্বে এখানকার প্রাচীন ভিক্ষুগণ সকলেই কি মহাযানী ছিলেন? (গ) মহাযানী ভিক্ষুগণের মধ্যে বিশ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে উপসম্পদা নেয়ার কি বিধান আছে? (ঘ) চট্টগ্রাম নিকায় বিভেদের মূল রহস্য কি? মুৎসুদ্দি মহাশয় পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের নিকট এসকল প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

(২) 'বৌদ্ধ বাণী' নামে একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। সে পত্রিকার ২য় বর্ষ ১৩৩৪ বাংলার ফাল্গুন ৫ম সংখ্যায় বৌদ্ধদের শবদাহ প্রথা নিয়ে কিছু লেখা হয়। এতে অভিযোগ করা হয় যে, বাঙ্গালী বৌদ্ধদের দারিদ্রতার প্রধান কারণ- ভোজন, বিবাহ, বিহার এবং শবদাহে অনাবশ্যক অর্থব্যয়।

(৩) রাউজান পরিবাস ব্রত অনুষ্ঠিত হয় ১৩৭৪ বাংলায়। আঁধারমানিক সুরেশসিং বিহারে পরিবাস ব্রত অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৬ ইংরেজী, কদলপুরে পরিবাস ব্রত অনুষ্ঠিত হয় ১৩৭৯ বাংলা, ১৯৭৩ ইংরেজী। বিনাজুরীতে গিরিমানন্দ মহাস্থবিরের শান্তি নিকেতনে-১৯৮০ ইংরেজী।

(৪) ১৫/১০/১৯৭৭ ইংরেজীর ডায়েরী পৃষ্ঠায় লিখিত হয়- ১. প্রজ্ঞাবংশ শ্রামণের প্রব্রজ্যার তারিখ ১৯৭১ ইংরেজীর আষাঢ় মাসে রামু লামার পাড়া বিহারাধ্যক্ষ ভদন্ত উ পান্ডবা মহাধেরোর নিকট। উপসম্পদা গ্রহণ হয়- ১১ই ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৭৯ বাংলা, ২৫১৬ বুদ্ধাব্দ, ১৯৭৩ ইংরেজী ২৩শে ফেব্রুয়ারী, কদলপুর সুধর্মানন্দ বিহারের পরিবাস ব্রত অনুষ্ঠান শুরু প্রথম দিবসে নতুন প্রতিষ্ঠিত সীমায়। সীমা নায়ক সাধক ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাস্থবির (ভারত), আচার্য উপাধ্যায় ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি স্থবির।

২. গহিরা শান্তিময় বিহারে আগমন- ১৭ই আষাঢ় ১৩৮০ বাংলা, ২রা জুলাই- ১৯৭৩ ইংরেজী। প্রথম বর্ষাবাস অধিষ্ঠান আষাঢ়ী পূর্ণিমা ১৩ই শ্রাবণ, ২৮শে জুলাই। ৩/২/১৯৭৮ ইংরেজী- বিকাল বেলা আমার বি, এ, অনার্স- পরীক্ষার (ফাইনাল) প্রস্তুতির জন্যে জোবরা সুগত বিহারে অবস্থান করছিলাম। সেখানে গহিরা শান্তিময় বিহারের প্রাক্তন সেক্রেটারী কৃষ্ণজীবন বড়ুয়ার ছেলে মৈত্রী সংঘের

সেক্রেটারী ক্ষেমেশ বড়ুয়া আমাকে উত্তপ্ত বাক্য ব্যবহার করতে গেল, তার বড় ভাই পরেশকে বিহার কমিটির সদস্য করার প্রতিবাদে। তখন আমি বিহার কমিটির সভাপতি ছিলাম। সে আমাকে বললো আমার সান্নিধ্যে যে যায় সে-ই নষ্ট হয়। একই ভাবে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করলো ডাঃ অনন্ত বাবুর ছেলে দিলীপ বড়ুয়া। তার মতে আমি শান্তিময় বিহার থেকে চলে যাব এই অজুহাতে গ্রামের লোকদের ক্ষেপিয়ে মৈত্রী সংঘকে বিহার থেকে বের করে দেয়ার ব্যবস্থা করেছি। আসলে মৈত্রী সংঘ গ্রামের সমস্ত যুবকদেরকে বিহারের কাজ-কর্ম হতে বিরত রাখার কারণে আমার পক্ষে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সৃষ্ট সম্পাদন কঠকর হয়ে পড়েছিল বলেই, আমি শান্তিময় বিহার ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিলাম। তারা বিহারের একটি কক্ষ ক্লাবের অফিস হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। কিন্তু, কিছু যুবক যুবতীদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণে বিহারে ক্লাব ঘরের অবস্থান আমি সমর্থন করতে পারিনি।

১৯৭৮ ইংরেজী :-

৩/৬/৭৮ ইংরেজী তারিখে আমি মীরের খীল গ্রামে (হাটহাজারী) গিয়েছিলাম। সেই গ্রামের সুধাংশু বিমল নামে আমার মাসতুত ভাই জানালেন যে, আমার মাতৃ বংশের নাম মুরাইধাং গোষ্ঠী। এ গোষ্ঠীর লোক সাতবাড়িয়া, উনইনপুরা, জুলদা, মহামুনি, রাউজান ও শিলক (রাসুনীয়া) এ সকল গ্রামেও আছে। ১/৪/৮০ ইংরেজী আমার মাসতুত ভাই সুধাংশু বাবু হাটফেল করে মারা যান। আমার বাবার মতে পিতৃবংশের নাম আনন্ডাজ্জেদি বা আনন্ডাপুণ্ড্রী। কারো মতে আরিপ পুণ্ড্রী।

৫/৬/৭৮ ইংরেজী। আমার বি, এ, (অনার্স) ফাইনাল লিখিত পরীক্ষা শেষ হয়। এ সময়ে আমার সাথে জোবরা সুগত বিহারে অবস্থানকারী রাজামাটি বরকল এলাকার হামু মহাজনের নাতি সুখ- শান্তি চাকমা সমাজতত্ত্ব বিভাগ হতে বি,এ, (অনার্স) ফাইনাল পরীক্ষা দেয়; এবং সুরেশ চাকমা এম, এ, প্রিলি পরীক্ষা ইতিহাস বিভাগ হতে প্রদান করে।

৭/৬/৭৮ ইংরেজী মীরেরখীল গ্রামে গিয়ে সেই গ্রামের বিহারাধ্যক্ষ আনন্দমিত্র ভিক্ষু হতে জানতে পারলাম, ঢাকায় নানুপুর গ্রামের ভিক্ষু জিনসেন চীবর ত্যাগ করেছেন। এই ভিক্ষু জিনসেনই আমাকে গহিরা শান্তিময় বিহারে বর্ষাবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। বর্তমানে তিনি জ্যোতিষ বড়ুয়া নামে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষা বিভাগে অধ্যাপনারত আছেন।

৮/৬/৭৮ ইংরেজী জোবরা সুগত বিহারে গুণলঙ্কার স্মৃতি মন্দিরের পাশে পুকুর পাড়ে কয়েকটি নারকেল চারা রোপনের ব্যবস্থা করি। পরে গহিরা শান্তিময় বিহারে থেকে চারা এনে তা রোপন করি।

১১/৬/৭৮ ইংরেজী, জোবরায় গিয়ে আমার বড়দা অমূল্য বাবুর সাথে তাঁর আয়ের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত প্রদান করি।

১৩/৬/৭৮ ইংরেজী, বাগোয়ান এক আমন্ত্রণে গিয়ে বেতাগী বনাশ্রমের ভিক্ষু সুমঙ্গল মহোদয়কে গহিরা শান্তিময় বিহারে ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাস্থবিরের সাথে ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের বৈঠকে দেখা করার সংবাদ প্রেরণ করি। এই ভিক্ষু মহোদয়ের একান্ত জেদের বশবর্তী হওয়ার কারণেই পরবর্তী কালে বেতাগী ঐক্যবদ্ধ গ্রামটির অধিকাংশ দায়ক পৃথক বিহার নির্মাণ করে মহাস্থবির নিকালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুমঙ্গল ভিক্ষু মহোদয়কে সংঘ কর্তৃক বিহারে ত্যাগের বারং বার অনুরোধ সত্ত্বে তিনি বেতাগী বনাশ্রম ত্যাগ না করায়, এক বিহারের দায়ক শেষ পর্যন্ত তিনটি বিহারে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

১৪/৬/৭৮ ইংরেজী জোবরা সুগত বিহারে ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাস্থবিরের সাথে আলোচনা করছিলাম, ভিক্ষুদের ক্রম বর্ধমান স্বৈরচারী প্রবৃত্তির কারণে বিভিন্ন বিহারে যে ভাবে সমস্যা সৃষ্টি হতে চলেছে, এই প্রবণতা বন্ধ করতে হলে অবশ্যই ভিক্ষু দায়ক সমন্বিত একটি জোরালো সংগঠন গড়ে তোলা দরকার। এখন সমস্যা হলো, গণচেতনাকে জাহত করতে যে সকল ভিক্ষুরা সক্ষম বর্তমানে সেই শিক্ষিত ভিক্ষুরাই চীবর ত্যাগ করে সংসার জীবনে ফিরে যাচ্ছে। এই কাজ করবে কে। গৃহী জীবনে অবসর প্রাপ্ত কিছু শিক্ষিত প্রবীণ লোক যদি ভিক্ষু হতো, তাদের দিয়ে বিহার গুলোর তিথি শ্রাদ্ধের কাজ সমাধা করে, যুবক ভিক্ষুদের একটি সাংঘিক বিহারে রেখে শাস্ত্র-শিক্ষা ও ধ্যান ভাবনা অনুশীলনে যদি নিয়োগ করা যেতো, তা হলে ধর্ম ও সমাজের কিছু উন্নয়ন মূলক কাজ করার সুযোগ পাওয়া যেত। এই লক্ষ্যে আমরা উভয়ে জোবরার যামিনী, প্রতিভার বাপু, আমার বাবা এবং আমার অশৈশব শিক্ষা-সাধী সুপালকে জোবরা সুগত বিহারে আসতে সংবাদ পাঠালাম তাদের প্রব্রজ্যা গ্রহণ বিষয়ে আলাপের জন্যে। (পরবর্তীতে যামিনী ও আমার বাবা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন।)

১৬/৬/৭৮ ইংরেজী। বিগত কিছু দিন ধরে অর্থাৎ বি,এ, অনার্স-পরীক্ষা সমাপ্তির পর ভোর ৬ টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত একটি রুটিনবদ্ধ জীবন-যাত্রা স্থির করেছিলাম। ফলে যোগ-ব্যায়ামের সময়টা ঘুমেরই চলে গেল। গতকাল সন্ধ্যা থেকে পেটে বদহজম জনিত অস্বস্তি ভোগ করছিলাম। ফলে রাতটা প্রায় অনিদ্রাও তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যেই কাটাতে হলো। প্রাঃতরাশের পর প্রতিদিনের অধ্যয়ন পর্বে ও ব্যাঘাত হলো, বিহারে দু'জন অতিথির আগমনে। গত কয়েক দিন ধরে যে বইটি পাঠ করছিলাম, চীনের নেতা মাওসেতুং এর; সেই জীবনী গ্রন্থটি আজকে সকাল ৭ টা হতে ১০ টার মধ্যে পাঠ শেষ করলাম। মধ্যাহ্ন ভোজের পর চট্টগ্রাম শহরে মেহেদিবাগস্থ নেয়াপাড়ার শাক্যাবুর বাসায় গেলাম। সেখানে জোবরা সুগত বিহার পর্বস্থ জ্ঞানশ্রী মহাস্থবিরের ক্রয় করা জমি, (বর্তমানে গুণালংকার অনাথাশ্রম ও স্কুল) জয়কান্তি ও প্রশান্ত বাবুদের কারণে ভুল জরিপটা সংশোধন বিষয়ে শাক্য বাবুর উপর দায়িত্ব ভার দিলাম। তার পরে গোলাম হাজী মহম্মদ মহসীন কলেজে কদলপুরের সুশীল বাবুর

সাথে যোগা যোগ করতে। সেখান থেকে সুশীল বাবু সহ আন্দরকিন্ধায় বুনিয়াদী প্রেসে গেলাম মহামণ্ডলের ভিক্ষু ও গৃহী উপোসথ তালিকাটি ছাপনো যায় কিনা দেখতে। কাজটি সমাধা করে জোবরায় গিয়ে জ্ঞানশ্রী মহাস্থবিরকে আজকের প্রদত্ত দায়িত্বের অগ্রগতি অবগত করে রাত ৯ টায় গহিরা শান্তিময় বিহারে ফিরে আসলাম। আর জানতে পারলাম শ্যামা বড়ুয়ার কন্যাটি মারা গেছে। তাকে দেখতে গেলাম।

১৭/৬/৭৮ ইংরেজী। গতরাত ও ঘুমাতে বিলম্ব হয়ে গেল। ফলে আজকে ঘুম থেকে উঠলাম ভোর সাড়ে ৪ টায়। শারিরীক ভাবে ভীষণ দুর্বলতা বোধ করায় কোন যোগ ব্যায়াম করলাম না। কোন লেখা-পড়া ও হলো না, প্রাতঃকৃত্যে মল ত্যাগের পরেও স্বস্তিঃ পাচ্ছি না। মন-মানসিকতা খুবই উদ্বেগ পূর্ণ। তার পরেও প্রাতঃরাশে কিছু খেলাম। সকাল সাড়ে ছয়টায় মহাপরিনির্বাণ সূত্র বইটি পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু, শারিরীক অবসন্নতার জন্যে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারলাম না। সারা দিনটা মোটে ভালো গেল না। আজ রাতে অনুষ্ঠিত হলো গহিরা শান্তিময় বিহারের বিশেষ সাধারণ সভা। আমার পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে জোবরায় গিয়ে স্কেমেশ যে দুর্ব্যবহার আমাকে করেছে, সে বিষয়ে গ্রামবাসীকে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা দিলাম। এমন পরিস্থিতির অবসান না হলে শান্তিময় বিহার ত্যাগের বিষয়টিও জানিয়ে দিলাম।

১৮/৬/৭৮ ইংরেজী। গতরাতে অধিক রাতে শয্যা গ্রহণ করায় আজ দৈনিক রুটিনের কিছুই রক্ষা সম্ভব হলো না। দুপুর ১টায় অনুষ্ঠিত হলো মহামণ্ডল ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের সাধারণ নির্বাচনী সভা। আমার গহিরা বিহারেই নতুন কমিটি গঠিত হলো। নবগঠিত কমিটির পরবর্তী বৈঠক স্থির হলো আগামী- ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, মীরের খিল বুদ্ধ মন্দিরে। রাতে সুমঙ্গল (বিনাজুরী) ও জ্ঞানশ্রী ভণ্ডে দ্বয়ের সাথে আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে বহুক্ষণ আলোচনা হল।

১৯/৬/৭৮ ইংরেজী। আজ ঘুম থেকে উঠলাম ৩টা ১৫ মিনিটে। হাত-মুখ ধুয়ে একটি কবিতা লিখলাম- বর্তমান যুগে ভিক্ষুদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য কেমন হওয়া উচিত, তার উপর। কবিতাটি লিখা শেষ করে প্রাত্যাহিক যোগ-ব্যায়াম সমাপন করলাম। যথারীতি বন্দনা ও প্রাতঃরাশ গ্রহণের পর সুমঙ্গল ও জ্ঞানশ্রী ভণ্ডের সাথে সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার বর্তমান সংবিধানের ত্রুটি- বিচ্যুতি নিয়ে আলাপ হলো। আমাদের এই আলোচনা পর্বে লক্ষ্য করলাম ভদন্ত সুমঙ্গল স্থবির এসকল বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী নহেন।

মধ্যাহ্ন ভোজের পরে সুমঙ্গল স্থবির চলে গেলেন। ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির ও শুমানমর্দনের ভিক্ষু বিমলানন্দকে নিয়ে বর্তমান ভিক্ষুদের সাংঘিক চেতনা বিহীন এবং শীল- বিনয়াচারে উদাসীনতায় ভরা শোচনীয় জীবন যাত্রা নিয়ে অনেক্ষণ আলাপ আলোচনা হয়। অতঃপর আমিও জ্ঞানশ্রী ভণ্ডে অসুস্থ বিশাখার মা এবং ডাঃ অনন্ত বাবুর স্ত্রীকে দেখে চলে গেলাম গহিরা জেতবন বিহারে, সেখানকার ভিক্ষু-দায়কের মধ্যে সৃষ্ট উত্তেজনা প্রশমনের জন্যে। তাদের সাথে নির্ধারিত আলোচনা সমাপ্ত করে

সন্ধ্যায় ফিরে আসলাম শান্তিময় বিহারে। ইতিমধ্যে জোবরা হতে যামিনী এবং রাস্তুনীয়ার যুবকটি এসে উপস্থিতিত হল, এবং তারা উভয়ের প্রব্রজ্যা অনুষ্ঠান সমাধা হলো। জোবরার যামিনীর নাম হলো ধর্মজ্যোতি শ্রামণ এবং রাস্তুনীয়ার যুবকটি নাম হলো পূর্ণজ্যোতি শ্রমণ। ধর্মজ্যোতি শ্রমণকে উপসম্পদা দানের জন্যে তারিখ সাব্যস্ত হলো ২৮/৬/৭৮ ইংরেজীতে কদলপুর বিহার সীমাতে।

২১/৬/৭৮ ইংরেজী, ভোর সাড়ে চারটায় ঘুম থেকে উঠি। স্নান ও বন্দনা শেষে সকাল ছয়টায় প্রাতঃরাশ গ্রহণ করি। তারপর ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাস্থবিরের সাথে কিছুক্ষণ মহামণ্ডল ও ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদ সংক্রান্ত আলোচনা সমাপ্ত করে নন্দীর হাট গমন করি আমার গলায় আটকে যাওয়া কাঁটার চিকিৎসার জন্যে। কিন্তু চিকিৎসক মহিলাটি যে পরিমাণ টাকা দাবী করেন, তা আমার নিকট না থাকায় তারই পরামর্শে কিছু হোমিও ঔষধ ক্রয় করে মধ্যাহ্ন ভোজের আগে ফিরে আসি গহিরা শান্তিময় বিহারে। মধ্যাহ্ন ভোজের পরে ধর্মজ্যোতি ও পূর্ণজ্যোতিকে কদলপুরের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিয়ে, বোধি বিহারেরর জ্ঞান জ্যোতির সাথে কিছুক্ষণ আলাপ করি শান্তিময় বিহারে আমার ভবিষ্যত নিয়ে।

সন্ধ্যায় দক্ষিণ পাড়ার বৈদ্যের বাড়ীর তরুনের সাথে ক্ষেমেশের দুঃখ জনক আচরণ বিষয়ে কিছু কথাবার্তা হয়; এবং মাষ্টার প্রফুল্ল বাবুর সাথে ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের সংবিধান রচনা নিয়ে কিছু আলোচনা হলো।

২২/৬/৭৮ ইংরেজী, ভোর পৌনে পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠলাম। গতকালের ডায়েরী লিখিতে গিয়ে আমি খুবই বিরক্তি বোধ করলাম, দৈনিক রুটিন অনুশীলনে অক্ষমতার জন্যে।

অদ্য সকালে বিহারে প্রাতঃরাশের পর প্রথমে গেলাম জোবরা। সেখানে প্রজ্ঞানন্দ ভক্তের সাথে প্রয়োজনীয় কাজ সারতে পারলাম না, তিনি বান্দরবান গমনের কারণে। জোবরা হতে গেলাম সংঘদানের উদ্দেশ্যে শুমানমর্দনে। সংঘদানে সংঘরাজ ভক্তের আদেশে ধর্মদেশনা করলাম, সংঘদানের তাৎপর্যের আলোকে বর্তমানের ধর্মীয় ও সামাজিক পরিস্থিতির উপর। সংঘরাজ ভক্তে উচ্চ প্রশংসা করলেন এই বক্তব্যের। সারা অপরাহ্ন ও সন্ধ্যা সংঘরাজের বিহারে অতিবাহিত করলাম। সংঘরাজ ভক্তে আমাকে জালালেন যে, গতকাল জোবরা গ্রামের ব্রজেন্দ্র বাবু সহ কয়েকজন লোক এসেছিলেন বিহার সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের অনুরোধ জানাতে।

সমস্যাটা কি? গুরুন চন্দ্র মহাজন শ্রদ্ধেয় পূর্ণানন্দ মহাস্থবিরের প্রেরণায় দশ গভা জমি জোবরা সুগত বিহারে বুদ্ধের সেবা- পূজার জন্যে দান করেন। ভক্তে, অন্যদেরকেও এভাবে দানে উৎসাহিত করতেই হউক, বা বুদ্ধের উদ্দেশ্যে দান করলো- এ অর্থেই হউক, গুরুন চন্দ্র মহাজন ও তাঁর জীবর নামে একটি শ্বেত প্রস্তরে ভূমিদানের বিষয়টি উল্লেখ করে বুদ্ধের আসনের সম্মুখে স্থাপন করেন। সারাবিশ্বে যে কোন দাতার স্মৃতি রক্ষায়, কেবল বুদ্ধাসন নহে, বুদ্ধের পদ্মাসনের নীচে পর্যন্ত এ

ভাবে দাতার নাম উৎকীর্ণ করার প্রমাণ অসংখ্য। কিন্তু, জোবরা গ্রামে শুধু নহে, প্রায় বড়ুয়া গ্রামে দেখা যায়, যে সকল লোক পৈতৃক সম্পদ মদ, জুয়া এবং চাঁ এর দোকানের অভাৱ গিয়ে নিঃশেষ করেছেন; ধর্মের নামে সমাজ কল্যাণার্থে স্মরণীয় কোন অবদান রাখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রুচি হীন সেই মাতব্বর গুলোতো কিছুই করে না। অথচ অন্যের দান বা স্মৃতি স্মরক যদি বিহারের কোথাও দেখেন, তখন তা তাদের অসহ্য গাৱদাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এই বিহারে তারা ও ভিক্ষুর জন্য পালার ছোয়াইং দেন, বুদ্ধ মূর্তিকে বন্দনা করতে যান। অতএব, তাদের পুরো অধিকার আছে, বিহারকে কেবল তাদের রুচি মতো জীর্ণ- শীর্ণ অবহেলিত অবস্থায় রেখে দিয়ে সার্বজনীন সম্পদের বৈশিষ্ট্য চির অক্ষুন্ন রাখতে। জোবরা গ্রামের ব্রজেন্দ্র, শুধাংশু, নিবারণ এবং বোচন নামক এই ব্যক্তিগুলো তাই গুরুন মহাজনের স্মৃতিফলকটি বুদ্ধাসনের নীচে প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিবাদে মরণ ভর বুদ্ধ মন্দিরে প্রবেশ করেননি, বিহারেও আসেননি। বড়ুয়া সমাজ ছাড়া আমি জীবনে এমন মানসিকতা অন্য কোন দেশেও সমাজে দেখলাম না। ইহা আশ্চর্যই বটে।

২২/৬/৭৮ ইংরেজীর এই দিন সংঘরাজ ভণ্ডে আমার গলায়কাটা আটকে যাওয়ার বিষয়টা শুনে, তিনি আমার ডায়েরীতে নিজের হাতে বায়োকেমিক চিকিৎসার ১২টি ঔষধের মধ্যে ৬টির গুণাগুণ ও ব্যবহার পদ্ধতি লিখে দিলেন। তিনি বললেন, আমি আজীবন নিজে এই ঔষধ ব্যবহার করছি, এবং বহুজনকে এই ঔষধ দানের পরিমাণ করা যাবেনা। কতলোক যে রোগারোগ্য হয়েছেন তারও সীমা নেই। ভূমিও তাই করো। ঔষধ দানে মহাপুণ্য, নিজেও জন্ম-জন্মান্তরে নিরোগী সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায়। ভণ্ডের সেদিনের এই উপদেশে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরবর্তীতে আমি বহু বায়োকেমিক এবং হোমিও চিকিৎসার বই সংগ্রহ করি। বহু বৎসর লোকদের এই ঔষধ বিতরণ করি। কেহ কেহ পুণঃ ঔষধ কেনার জন্যে টাকাও দিতেন। কিন্তু বায়োকেমিক ঔষধের দাম পরবর্তীতে এত বেড়ে গেলো যে, তা আমার সাধ্যাতীত হয়ে গেল। ফলে বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু, এই চিকিৎসার সুফল দেখে আমার মনে এক বদ্ধ মূল ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল প্রতিটি গ্রামে অন্ততঃ একটি করে হোমিও-বায়োকেমিক দাতব্য চিকিৎসালয় চালু করতে। তবে এই চিকিৎসায় ভিক্ষু- শ্রামণ না হয়ে অনাগারিক পুরুষ- মহিলাকে চিকিৎসা কর্মে নিয়োজিত করাকেই যথাযথ বলে আমি মনে করি। ভিক্ষুদের এ জাতীয় কর্ম- বুদ্ধ কেন নিষেধ করেছে তা নানুপুরের ভিক্ষু জিনসেনের চীররত্যাগের রহস্য সন্ধানই পাওয়া যাবে।

২৩/৬/৭৮ ইংরেজী, ভোর সাড়ে চারটায় সংঘরাজ ভণ্ডের বিহারে ঘুম থেকে জাগ্রত হই। হাত মুখ ধুয়ে সংক্ষিপ্ত বন্দনা ও প্রাতঃরাশ শেষে ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের সংবিধান রচনার জন্যে একটি রূপ রেখা তৈরী করে নিলাম। মধ্যাহ্ন ভোজের সংঘদানে গেলাম রুদ্রপুর। সেখান হতে গেলাম জোবরা প্রজ্ঞানন্দ ভণ্ডের সাথে এম, এ, ক্লাশ সম্পর্কে কিছু আলাপ করতে। সেখানে দেখা হলো সুমঙ্গল স্ববির

মহোদয়ের। তাঁকে নিয়ে আসলাম আমার বিহারে। উভয়ে রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত সংবিধান লিখলাম। অসম্পূর্ণ রেখেই শুয়ে পড়লাম।

২৪/৬/৭৮ ইংরেজী, ভোর চারটা ঘুম থেকে উঠলাম। দৈনিক রুটিন অনুশীলনে আজও অক্ষম হলাম। প্রাতঃরাশের পর মাষ্টার প্রফুল্ল বাবুর সাথে শিক্ষা পরিষদের সংবিধান রচনার আলোকে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর উপর আলোচনা হলো - ১. প্রতিটি বিহার হতে প্রতিনিধি গ্রহণের বিধিও বৈশিষ্ট্য নির্ণয়, ২. বার্ষিক ব্যয় নির্বাহে আয়ের উৎস নির্ধারণ, ৩. মনোনীত প্রতিনিধিদের সাথে নিয়মিত পত্র যোগাযোগ এবং তাদের উপর প্রদত্ত দায়িত্বের উপর নিয়মিত রিপোর্ট সংগ্রহ করে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা করা, ৪. প্রতিনিধিদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান, ৫. প্রতিনিধি রিপোর্ট- সহ ধর্মীয় ত্রৈমাসিক মুখপত্র ছাপানো, এবং বিলি-বিতরণের ব্যবস্থা করা, ৬. ভিক্ষুদের ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্র প্রকল্প বাস্তবায়নে ভিক্ষুদের নিকট হতে মাসিক ও বার্ষিক নিয়মিত দানের রীতি চালু করা।

অদ্য রাতে শান্তিময় বিহার কমিটির মিটিং হলো। স্কেমেশের আপত্তি জনক আচরণে উদ্ভূত সমস্যার নিরসনে। কিন্তু আশুতোষ বড়ুয়ার কারণে এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়নি।

২৫/৬/৭৮ ইংরেজী, সকাল ৯টায় গহিরা শান্তিময় বিহার হতে গেলাম জোবরা সুগত বিহারে নারিকেল চারা নিয়ে। বিকেলে কিছু আর্থিক প্রশ্নে মানিকদার সাথে দেখা করলাম। সন্ধ্যার দিকে জোবরা বিহারের উপস্থিত হলেন জ্যোতিষ বাবু (প্রাক্তন জিনসেন)। চীবর ত্যাগের পর মহোদয়ের সাথে এই প্রথম সাক্ষ্যাতে আমি এত অস্বস্তিঃ বোধ করলাম যে, দেখেও না দেখার মতো অন্যত্র সরে গেলাম।

২৬/৬/৭৮ ইংরেজী, জোবরা বিহারে প্রাতঃরাশ গ্রহণের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম আমার D D P I- এর ষ্টাইপেন্ড শুলো পাওয়া যায় কি- না দেখতে। Accounts Dert. হতে জানালেন জুলাই এর প্রথম সপ্তাহের দিকেই তা পাওয়া যাবে। মধ্যাহ্ন ভোজ জোবরা সুগত বিহারেই গ্রহণ করলাম। বিহারাধ্যক্ষ ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ স্ববির মহোদয় হতে পূর্বে গৃহীত বই শুলো ফেরত দিয়ে, তাঁর নিকট হতে এম,এ, ফাইনালের নোট শুলো গ্রহণ করলাম। বিকেলে গহিরা থেকে আনীত ফুলের চারা শুলোর চার পাশে ঘেরা দিলাম। সে রাত ও সুগত বিহারে গত করলাম।

২৭/৬/৭৮ ইংরেজী, রাত ৩টায় উঠে বিগত দিনের ডায়েরী লিখতে গিয়ে দৈনিক রুটিনের অনিয়মতায় মন বিষাদ ভারাক্রান্ত হলো। আসলে গহিরা শান্তিময় বিহারের বিরাজমান পরিস্থিতি আমাকে সত্যিই মানসিক ভাবে কাহিল করে ফেলেছে। জোবরায় স্নান ও প্রাতঃরাশ গ্রহণের পর শহরে মেহেদীবাগে শাক্য বাবুকে জোবরা সুগত বিহার সংলগ্ন জ্ঞানশ্রী ভাস্কের জমি সংক্রান্ত প্রদত্ত দায়িত্বের অগ্রগতি জানতে গেলাম। তিনি দায়িত্ব সম্পন্ন করতে পারেননি। সাড়ে দশটায় উপস্থিত হলাম

কদলপুর। মধ্যাহ্ন ভোজের পর জ্ঞানশ্রী ভক্তে সহ বেলা ১টায় রওনা দিলাম মহামুণি। শ্রদ্ধেয় জিনবংশ ভক্তের সাথে মহামণ্ডল ক্রেতারের জন্যে ভিক্ষু উপোসখের তালিকাটি প্রস্তুত করে রাত ৮টায় ফিরে এলাম কদলপুরে। ফেরার পথে সারা পথ ব্যাপী উভয়ে আলোচনা করলাম ধর্মীয় সামাজিক অবস্থাাদি এবং ভিক্ষুর শীল বিপ্লব জীবন সম্পর্কে। এ আলোচনায় আমি আপন জীবন প্রত্যবেক্ষণ করে খুবই প্রীতি অনুভব করলাম।

২৮/৬/৭৮ ইংরেজী, রাত ৩টায় জাগ্রত হলাম কদলপুর সুধর্মানন্দ বিহারে। প্রাত্যহিক প্রাতঃ কালীন জলপান করে প্রত্যবেক্ষণ ও স্মৃতি ভাবনা অনুশীলন করলাম, ডায়েরী লিখলাম; যোগ ব্যায়াম, প্রাতঃ কৃত্য, স্নান, বন্দনা ও প্রাতঃরাশ সমাপন করলাম। দৈনিক রুটিন বহুদিন পর আজকে মনের মতো অনুশীলন করে প্রীতি অনুভব করলাম।

সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মহামুণি হতে কোভাণ্যো স্থবির এবং রাউজান হতে ধর্মপ্রিয় ভক্তে উপাস্থিত হলেন। বেলা ১০টা পর্যন্ত তাঁদের সাথে ভিক্ষুর আজীব পরিপুষ্টি শীল বিষয়ক আলোচনা হলো।

এই বিনয় পালের কথাই বলি। আমি প্রথম বার যখন বড়ই গাঁও আশ্রম দেখতে যাই, তখন সে সেই আশ্রমের শ্রমণ শ্রীমন্তপাল ছিল। তাকে নিয়ে শ্রদ্ধেয় পূর্ণানন্দ ভক্তের জন্মস্থান (নৈরপাড়/নূরপুর) দেখতে গেলাম পদব্রজে। পথে হাঁটিতে হাঁটিতে আশ্রমের পরিবেশে থাকতে অনিচ্ছুক জেনে, চট্টগ্রামে আমাদের কাছে চলে আসতে বললাম। যথারীতি একদিন উপস্থিত হলো। তাকে জ্ঞানশ্রী ভক্তের সাথে রাখলাম। সে-ই থেকে অদ্যবধি সে রাউজানে আমাদের বিহার গুলেতেই ঘুরে ফিরে আছে। কিন্তু, আশ্চর্য হলোও সত্য যে, আমাদের সান্নিধ্যে তার জীবন ভিত্তি রচিত হলোও মনে প্রাণে সে কোন দিন আমাদের সাংঘিক কর্ম- কান্ডে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি। ১৯৮১ ইংরেজীতে আমি শ্রীলংকা যাওয়ার সময় গহিরা শান্তিময় বিহারের দায়িত্ব সহ ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের সম্পাদকের দায়িত্ব তার উপর দিয়ে গেলাম। সে খুর- চক্র আখ্যা দিয়ে এই সম্পাদকের দায়িত্ব সহসা ত্যাগ করলো। তার হাতে রেখে যাওয়া আমার বহু গ্রন্থের হৃদিস পেলাম না।

২৯/৬/৭৮ ইংরেজী, রাত সোয়া ৩টায় ঘুম থেকে উঠলাম। দৈনিক রুটিন অনুসারে প্রাতঃরাশ পর্যন্ত, সব কিছু সম্পন্ন করলাম। অতঃপর কদলপুর বিহারের আবাসিক সকল ভিক্ষুদের নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ আত্ম- সমালোচনায় বসলাম। সমাজ ও সঙ্ঘের কল্যাণে আমাদের সকলকে আত্ম কেন্দ্রিক মানসিকতা ত্যাগের প্রচেষ্টা চালাতে হবে, আমাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধ, বিশ্বাস ও নির্ভর শীলতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে বুদ্ধ প্রশংসিত সাংঘিক জীবনকে শক্তিশালী করার জন্যে। এই লক্ষ্য অর্জনে ব্যক্তিগত সঙ্ঘয় মানসিকতা ত্যাগ করে আমাদের প্রাপ্ত সমস্ত দান- দক্ষিণা একটি মাত্র ফান্ডে জমা হবে এবং প্রয়োজন মতো সেই ফান্ড হতে সাহায্য নেওয়া

হবে। এভাবে প্রত্যেকের প্রতি আহ্বান জানানো হলো। উপস্থিত সকলে মাথা নাড়ালেও এক মাত্র আমি বান্দা ছাড়া দ্বিতীয় কেহ ভদ্র জ্ঞানশ্রী মহাথেরোর হাতে আপন ব্যক্তিগত সঞ্চয় কোন দিন সমর্পন করেননি। অবশ্য শ্রীমন্ত পাল (বিনয়পাল) এই সঞ্চয় শক্তিতে তার বড়ো ভায়ের বিরাট সংসারের অনেক বোঝা লাঘব করতে সক্ষম হয়েছিল। তার এই অকৃত্রিম প্রয়াস বুদ্ধ দৃষ্টিতে কখনো নিন্দনীয় নহে, যদি নিজের ভিক্ষু জীবনের বিস্তৃতি রক্ষার মাধ্যমেই তা সম্পাদিত হয়ে থাকে।

মধ্যাহ্ন ভোজের পর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত জ্ঞানশ্রী ভণ্ডে এবং আমি, আমাদের সঞ্চয় তহবিল নিয়ে আলোচনা করি এবং ভবিষ্যতে এই ফাণ্ডকে সমৃদ্ধি দানের প্রচেষ্টায় একমত পোষণ করি।

বিকালে জোবরায় উপস্থিত হয়ে দেখলাম, শ্রদ্ধেয় সারানন্দ ভণ্ডে রামু পরিভ্রমণ শেষে উপস্থিত হয়েছেন। রাতে তিনি এবং প্রজ্ঞানন্দ ভণ্ডের সাথে বর্তমান শিক্ষিত ভিক্ষুদের পতনের মূল কারণ রাত্রি ভোজন, এই কথা উল্লেখ করতেই প্রজ্ঞানন্দ ভণ্ডে র চেহারা ভীষণ বিমর্ষ দেখলাম।

৩০/৬/৭৮ ইংরেজী, রাত পৌনে ৩টায় ঘুম থেকে উঠলাম। দৈনিক রুটিন অনুসারে সবকিছু সমাধার পর গেলাম জোবরা হতে মীরের খীল বিহারে। সেখানে আজকের আহুত ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের নব গঠিত কমিটির প্রথম বৈঠক। সভাপতি ভদ্র গিরিমানন্দ মহাথেরো বললেন, মহামণ্ডলের উচিত ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদকে সঠিক সহযোগীতা দান করা। ভণ্ডের এই বক্তব্যে আমি মনে করলাম তিনি মহামণ্ডলের ফাণ্ড হতে আর্থিক সহ যোগীতার প্রতিই ইংগিত করছেন। কারণ মহামণ্ডলের ফাণ্ড এখন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু, ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের জন্য লগ্নে এই মহাস্থবিরই সব চেয়ে বেশী স্বেচ্ছাচার ছিলেন যাতে মহামণ্ডলের এক কানা- কড়িও ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের গঠণে ব্যয় না করা হয়। আজ ভদ্র জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির ও আমার অক্লান্ত প্রয়াসে মহামণ্ডলের ফাণ্ড যেমন বৃদ্ধি পেল, একই ভাবে ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের ফাণ্ডও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু, আচার্য এই যে, আজ দীর্ঘ কাল যাবত যিনি ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতি, সেই গিরিমানন্দ মহাস্থবির নিজের বিহারে প্রতিবছর যে ভাবে অর্থব্যয় করে চীবরদানে ভূরি ভোজের ব্যবস্থা করেন, তার যৎ কিঞ্চিৎ ও যদি ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের ফাণ্ড শ্রীবৃদ্ধিতে দান করতেন এবং সংঘদান অনুষ্ঠানাদিতে যদি দু'একবারও ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের আদর্শ- উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা দিতেন, তা হলে বলতে পারতাম আমাদের সভাপতি তাঁর প্রিয় সংগঠনটির জন্যে কেবল কায়িক শ্রমই দিয়েছেন, তা নহে, তিনি আর্থিক এবং বাচনিক সহায়তা ও প্রদান করেছেন।

শিক্ষা পরিষদের বৈঠক শেষে জোবরা এসে দেখলাম জোবরার কিছু উপাসকের সাথে প্রজ্ঞানন্দ ভণ্ডের বেশ বিতর্ক জমে উঠেছে, ভিক্ষু জিনসেনের চীবর ত্যাগ প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে।

১/৭/৭৮ ইংরেজী, বিশ্ব বিদ্যালয় হতে ফেরার পথে ভদন্ত সুমঙ্গল সহ গহিরা শান্তি ময় বিহারে গিয়ে ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের সিলেবাস, নোটিশ ও আবেদন পত্র তৈরী করলাম।

২/৭/৭৮ ইংরেজী, ইদানিং আমি শারিরীক ভাবে দুর্বল এবং মানসিক ভাবে অশান্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি। রাত ৩টায় ঘুম থেকে উঠলেও কিছু লেখাপড়া করা অত্যন্ত জরুরী। কারণ আমার অনার্স ফাইনালের মৌখিক পরীক্ষা সন্নিহিত। এ- চিন্তায় ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে বিশেষ ভাবে।

পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতে আজ ১৮ খানা লাক্স সাবান এবং ২ খানা অন্তর্বাস চীবরের বিনিময়ে জোবরা সুগত বিহারের অধ্যক্ষ ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ স্থবির হতে একটি হোমিও প্যাথ- এর ঔষধ বক্স গ্রহণ করলাম।

৪/৭/৭৮ ইংরেজী, আজকে ভদন্ত জ্ঞানশ্রী ভণ্ডের সাথে জোবরা সুগত বিহারে ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের ফাও সংরক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা হলো। উভয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম- ভদন্ত গিরিমানন্দ, ধর্মপ্রিয়, আনন্দ, সুমঙ্গল, জ্ঞানশ্রী এবং প্রজ্ঞাবংশ সহ যারা সং এবং ত্যাগী, তাদের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র রিজার্ভ ফাও গঠনে উদ্যোগী হওয়া একান্ত আবশ্যক।

গতকাল মীরেরসরাই মায়ানী গ্রামের পণ্ডিত নামক উপাসকটি নিজামপুর অঞ্চলের ভিক্ষুদের গৃহাসক্তি এবং আত্ম কেন্দ্রিকতা নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন জোবরা সুগত বিহারে।

৫/৭/৭৮ ইংরেজী, অদ্য আমার বি, এ, অনার্স এর মৌখিক পরীক্ষা সমাপ্ত হলো। পরীক্ষা মোটেই সন্তোষ জনক নহে। হওয়ার কথা ও নহে। সাধারণ শিক্ষা প্রাপ্ত ভিক্ষুদের পরিণতি দেখে মন এমনিতেই উঠে গেছে, এসব অর্থহীন লেখা-পড়া হতে। তবুও একটা জেদ্ তো অবশ্যই আছে। যারা বলেন এম, এ, বি, এ, পাশ করলে কাপড় ছাড়ে, আর যে সকল পড়ুয়ারা বলেন স্কুল কলেজে পড়লে শীল- বিনয়ের ধার ধারা চলে না; এ সকল মিথ্যা সমালোচকদেরকে জবাব দেয়ার জন্যে হলেও আমাকে এই সাধারণ শিক্ষা অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে।

পরীক্ষা শেষে গহিরা শান্তিময় বিহারে গেলাম এবং সেবক আশু বাবুকে জানিয়ে দিলাম যে আমি বিহার কমিটিকে জানাতে যাচ্ছি, এই কিছু দিনের মধ্যে শান্তিময় বিহার ত্যাগ করতে যাচ্ছি। এই বলে জোবরায় পুণঃ ফিরে গেলাম।

৬/৭/৭৮ ইংরেজী, জোবরা হতে জ্ঞানশ্রী ভণ্ডে সহ সকাল ৮টায় মির্জাপুর গেলাম। ধর্মীয়- শিক্ষা সম্পর্কিত বৈঠক শেষে পদব্রজে গেলাম মদুনাখীল। রাতে বেশ কিছু লোকের আগমণ হলো। তাদেরকে কিন্তু, আমাদের আহ্বানে তেমন উদ্বুদ্ধ হলো বলে মনে হয়না।

৭/৭/৭৮ ইংরেজী, মদুনাখীল থেকে পায়ে হেঁটে সকাল সাড়ে ৮টায় উপস্থিত হলাম গহিরা মঘাশান্তী। সেখান থেকে জ্ঞানশ্রী ভণ্ডে চলে গেলেন কদলপুর।

রাতে শান্তিময় বিহার কমিটি মিটিং ডাকলো আমাকে আগামী বর্ষা বাসের আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে। আমি বললাম যেখানে আমার মানসিক শান্তি নাই, সেখানে কি ভাবে থাকবো? তাই আমি তাদের সমস্ত অনুরোধ উপেক্ষা করলাম।

৮/৭/৭৮ ইংরেজী, গতকাল জ্ঞানশ্রী ভণ্ডে বলে গেছেন যে, কদলপুরে তিথির আমন্ত্রণটা শেষ করে তিনি জোবরা আসবেন, আমি যেন সেখানে অবস্থান করি। আমি যথারীতি সেখানে গেলাম গহিরা হতে। সারাদিন অপেক্ষা করেও তাঁর সাক্ষাত পেলাম না। তবে ভদন্ত সুমঙ্গল স্থবিরকে নিয়ে জোবরার প্রশান্ত ও ভূপতি বাবুর আন্তরিক প্রচেষ্টায় কট্টোলার অফিস হতে ধর্মীয় শিক্ষার সিলেবাস, নোটিশ ও আবেদন পত্র গুলো টাইপ এবং সাইক্লোষ্টাইল করে আনলাম জোবরা সুগত বিহারে। ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক ভদন্ত সুমঙ্গল স্থবিরের স্বাক্ষর নিয়ে প্রতিটি বিহারের জন্যে পৃথক পৃথক পেকেট করে নাম ঠিকানা গুলো সারা দিনভার লিখে পোস্ট করার জন্যে তৈরী করলাম। বলতে গেলে দিনটা কাজে লাগলো।

৯/৭/৭৮ ইংরেজী, ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাশ্ববির সকাল ৮টায় এসে উপস্থিত হলেন জোবরায়। ৯টায় আমাকে সহ নিয়ে গেলেন হাটহাজারী ব্যাংকে। টাকা তুলে নেয়া মাত্র উভয়ে ছুটলাম শহরে জি, পি, ও তে টাকা গুলো ফিক্সড ডেপজিট করতে।

সন্ধ্যায় আমাকে নিয়ে উপস্থিত হলেন গহিরা শান্তিময় বিহারে। বিহার কমিটির কর্ম কর্তাদের সাথে বৈঠক হলো। আমার পরিবর্তে আগামী বর্ষায় অন্য একজন ভিক্ষু দেয়ার প্রস্তাব করলেন ভদন্ত মহোদয়। কর্ম কর্তারা রাজি না হয়ে চলে গেলেন।

১১/৭/৭৮ ইংরেজী, খুব সকালে প্রফুল্ল বাবু এসে জ্ঞানশ্রী ভণ্ডেকে প্রস্তাব করলেন, আমার জন্যে আর একটি মিটিং আহ্বান করতে। তাঁর মতে প্রজ্ঞাবংশ ভণ্ডে পরীক্ষামূলক ভাবে সামনের বর্ষাবাসটি শান্তিময় বিহারে অবস্থান করুক। তার পরে অবস্থা বুঝে আমরা তাঁকে সানন্দে বিদায় দেব। জ্ঞানশ্রী ভণ্ডে মাষ্টার বাবুর এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন।

অপরাহ্নেই বৈঠক হলো। আমি এই শর্তে বর্ষাবাসের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম যে, কোন পক্ষ যেন আমার উপর কোন বিষয়ে চাপ সৃষ্টি না করেন, এমনকি বিহার কমিটিও। আমি নিজস্ব নিয়মে কেবল ধর্মীয় বিষয়েই সকলের সাথে সম্পর্কিত থাকবো, কোন ক্লাব বা সমাজিক বিষয়ে নহে।

শান্তিময় বিহারের বৈঠক সমাপ্ত করে আমি ও জ্ঞানশ্রী ভণ্ডে গেলাম সুরঙ্গা বন বিহারে। সেখানে বিহার ভূমি নিয়ে গ্রামে যে দলাদলি চলছে তার সমাধান রাতভর মিটিং করেও কিছুই করতে পারলাম না।

১২/৭/৭৮ ইংরেজী, সকালে সুরঙ্গার অশ্বিনী বড়ুয়ার নিকট থেকে বিহারের ভূমি সংক্রান্ত দলিলটি দেখতে চাইলাম। কিন্তু, তাঁর ছেলে আমাদেরকে তা দেখাতে দিলনা।

মধ্যাহ্নে উপস্থিত হলাম হিজলায় শ্রদ্ধানন্দ ভণ্ডের নিকট। সুরঙ্গার বিষয়ে তাঁর সাথে আলাপ করে বিকল্প উপায়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার পরামর্শ দিলাম।

সন্ধ্যায় উপস্থিত হলাম কদলপুর; রাউজানের শীলানন্দ মহাস্থবির ও ধর্মপ্রিয় মহাস্থবিরকে সুরঙ্গার ঘটনাবলীল উপর নজর রাখার পরামর্শ দিয়ে।

১৩/৭/৭৮ ইংরেজী, সকাল বেলা কদলপুর হতে রওনা দিলাম মহামুণি হয়ে বাড়বকুণ্ড। মহামুণিতে গিয়ে যোগেন্দ্রারামে বর্ষাবাসের জন্যে সাগর ভিক্ষুকে মনোনীত করলাম। স্থানীয় বিহার গুলোতে উপোসথ তালিকা বিলি- বন্টনের দায়িত্ব দিলাম তাকে।

বিকালে গিয়ে বাড়বকুণ্ড পৌঁছলাম। অনেক্ষণ পর্যন্ত কিছু বৌদ্ধ মিল- শ্রমিকদের সাথে আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা নিয়ে আলাপ করলাম। প্রস্তাব দিলাম আমাদের ক্রম বর্ধমান ধর্মীয়, সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা মোকাবেলার জন্যে একটি শক্তি শালী ফাণ্ডগণের লক্ষ্যে কবে তাদের সকলের সাথে বসতে পারবো। তারা বিষয়টি অন্যান্যদের সাথে যোগাযোগ পূর্বক আমাদের জানানোর আশ্বাস দিলেন।

১৪/৭/৭৮ ইংরেজী, বাড়বকুণ্ডে মধ্যাহ্ন ভোজের পর আমরা গেলাম সীতাকুণ্ড। সেখানে আব্দুল্লাপুরের মেস্তানন্দ ভিক্ষুকে বর্ষাবাস যাপনের সুযোগ সুবিধা করতে গিয়ে, পূর্বে অবস্থানকারী বিজয় রক্ষিত ভিক্ষুর নোংরা আচরণ সম্পর্কে যা জানলাম— তা আমাদের রীতিমতো লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। সাংঘিক দুর্বলতার কারণে এসব ভিক্ষুর ধর্ম দূষণ প্রবৃত্তি রোধের কোন উপায়ই খুঁজে পেলাম না।

সীতাকুণ্ড হতে পাছশালায় গিয়ে রাতে মিটিং ডাকলাম বিহার কমিটি এবং কদলপুরের ভিক্ষু জিনানন্দের মধ্যে বিরাজিত সমস্যার নিরসনার্থে।

১৫/৭/৭৮ ইংরেজী, পাছশালা হতে সকালে রওনা দিলাম গহিরা শান্তিময় বিহারের উদ্দেশ্যে। আগামী কাল নিরঞ্জন বাবুর সংঘদানের আমন্ত্রণ আছে। অতএব, ঘোড়দৌড় শেষে একটি দিন বিশ্রামের সুযোগ পেলাম উভয়ে।

১৬/৭/৭৮ ইংরেজী, অপরাহ্নে হিজলার দায়কগণ তাদের বিহারে আরো একজন সহকারী ভিক্ষুর জন্যে আসলেন। সাথে সাথে জোবরা হতে প্রজ্ঞানন্দ ভণ্ডে চিঠি লিখলেন যে, খুব সম্ভবতঃ তিনি সমাগত বর্ষাবাস জোবরায় থাকতে পারবেন না। তাই সহসা জোবরা জন্য অন্য ভিক্ষুর ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু, তিনি কোথায় বর্ষাবাস করবেন সে সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। হঠাৎ এমন একটি সিদ্ধান্ত আমাদেরকে দুঃশ্চিন্তায় ফেলে দিল।

১৭/৭/৭৮ ইংরেজী, বিকালে জোবরা গেলাম। প্রজ্ঞানন্দ ভণ্ডের নিকট জানতে পারলাম তিনি রাজামাটি আনন্দ বিহারের অধ্যক্ষপদ গ্রহণের জন্যেই জোবরা ছেড়ে যাচ্ছেন।

রাজামাটির প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত এই আনন্দ বিহার ছিল চাকমা সার্কোলে মারমাদের একমাত্র শহর কেন্দ্রিক বিহার। উ জবনা মহাস্থবির কখন থেকে এই বিহারের দায়িত্ব

গ্রহণ করেছিলেন তা আসলে অনেকেই ভুলে গেছেন। তিনি স্বভাবের দিক থেকে চট্রাম বৌদ্ধ বিহারের প্রয়াতঃ অধ্যক্ষ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা শীলাচার শাস্ত্রীর মতই ছিলেন। জীবনে কোন উপযুক্ত শিষ্য গড়ে তোলার সৌভাগ্য তাই ভদন্ত উ জবনা মহাস্থবিরের ঘটেনি। বৃদ্ধ কালে রাজ্যমাটি হাসপাতালে অন্তিম শয্যায় শায়িত হলেও অন্য কোন মারমা ভিক্ষুকে বিহারের দায়িত্ব দিয়ে যাননি। এই সুবর্ণ সুযোগে লোভনীয় বিহারটি স্থানীয় চাক্‌মা বাবুরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিলেন, ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ স্থবিরের মতো একজন আধুনিক উচ্চ শিক্ষিত ভিক্ষু হাতে পেয়ে। অনেক বিলম্বে যখন মারমা মহলের চৈতন্যোদয় হলো, তখন এমন জবর দখলের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন। চাক্‌মা এবং মারমাদের এই দ্বন্দ্বে এক অশ্রুত পূর্ব তথ্য বেরিয়ে আসলো যে, রাজ্যমাটি আনন্দ বিহার টি আসলে চাক্‌মা বা মারমা কাহারো নহে- এটি বড়ুয়াদের বিহার। কারণ এই বিহারের প্রতিষ্ঠাতা সংঘরাজ নিকায়ের বিশিষ্ট ভিক্ষু দর্শনাচার্য বিজ্ঞানন্দ মহাস্থবির। অতএব, সেই সূত্রে সংঘরাজ নিকায়ের বড়ুয়া ভিক্ষু ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাস্থবিরের শিষ্য ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ মহাস্থবিরকে রাজ্যমাটি আনন্দ বিহারের অধ্যক্ষ পদে মনোনয়ন আইন সিদ্ধও যুক্তি যুক্ত। যদিও বা তিনি রক্তে খাঁটি চাক্‌মা।

১৯/৭/৭৮ ইংরেজী, আজ শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা। গহিরা গ্রামের তিনটি সংঘরাজ নিকায় ভুক্ত বিহার, একটি মাথের নিকায় ভুক্ত বিহার। সংঘরাজ নিকায় ভুক্ত শান্তিময় বিহারে আমি- প্রজ্ঞাবংশ ভিক্ষু, বোধি বিহারে ভিক্ষু জ্ঞান জ্যোতি (বাধুয়া) এবং জেতবনে ভদন্ত ধর্মদর্শী স্থবির, এই তিন জন বর্ষা ব্রত গ্রহণ করলাম। আমার ভিক্ষু জীবনে এবারে ৬ষ্ঠ বর্ষাবাস উদযাপিত হতে যাচ্ছে।

আমার পূর্বে ঘোষিত শর্তের কারণে আলোক সংঘ বা মৈত্রী সংঘের কেহই আজকের এই শুভদিনে বিহারে আসলো না। বিষয়টি আমার নিকট দারুণ অস্বস্তিঃ ও মর্ম বেদনার কারণ হলেও পরিস্থিতির হাতে আমি নিরুপায়।

আমার ও প্রতাপ বাবুর যৌথ প্রস্তাবে আজকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো শান্তিময় বিহারে একটি ভিক্ষু- সীমা সামনের চীবর দানের দিন প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

২০/৭/৭৮ ইংরেজী, উপোসথিকদের বুদ্ধ পূজা সমাধা করে আমিও বোধি বিহারের ভিক্ষু জ্ঞান জ্যোতি রওনা হলাম হিজলায় একটি সংঘদানে যোগদান করতে। পথে রাউজানের শীলানন্দ ভণ্ডে এবং ধর্মপ্রিয় ভণ্ডের দেখা পেলাম। শীলানন্দ ভণ্ডে বললেন যে, হেমেন্দু বাবু তাঁকে চিঠি দিয়েছেন। এবং সেই চিঠিতে আমার প্রস্তাবিত বাংলাদেশে ভিক্ষু শিক্ষা কেন্দ্রের বিষয়ে তাঁর মতামত জানতে চেয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, হেমেন্দু বাবু জ্ঞানশ্রী ভণ্ডে সহ আরো কয়েক জন মহাস্থবির কে চিঠি লিখেছিলেন সামনে প্রতিবছর একজন করে বিশিষ্ট মহাস্থবিরের জয়ন্তী তিনি করতে উচ্চুক এবং কদলপুরে একটি ভিক্ষু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতে একান্ত আগ্রহী। এ বিষয়ে মহাস্থবির গণের মতামত কি। বিষয়টি জানতে পেরে আমি তাঁকে চিঠি লিখে

হিলাম দেশে সরকারী পরিচালিত বিরাট ব্যয় বহুল অনেক হাসপাতাল আছে। সম্মানের সাথে হউক বা না হউক, তাতে ভিক্ষুদের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করা যায়। কিন্তু, বাংলাদেশে কোথাও ভিক্ষুদের ধর্ম প্রাণ বাঁচানোর জন্যে কোন ধর্ম-বিনয় ও পালি শিক্ষার সত্যিকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। দেশ বিভাগের আগে বার্মায় ও শ্রীলংকায় গিয়ে সহজে ধর্ম বিনয় শিক্ষার সুযোগ ছিল, এখন সে সুযোগ না থাকায় বিগত ত্রিশ চল্লিশ বছর যাবত কোন ভিক্ষু- শ্রমণ ধর্ম বিনয় শিক্ষার্থে লঙ্কায় বা বার্মায় যেতে পারেননি। মহামুণিতে পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির পালিও ধর্ম বিনয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেষ্টা করতে গিয়ে তাঁর হাতে সমাজের যে কয়জন ভিক্ষু কিছু ধর্ম- বিনয়ও পালি ভাষা জ্ঞান লাভ করেছিলেন, আজ সেই গুটি কয় ভিক্ষুরাই বর্তমান ভিক্ষু সংঘে একমাত্র পণ্ডিত ভিক্ষু হিসেবে সমাদৃত। তার পরে আর নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলেই তো আপনি যুগ যুগ ধরে খ্যাত নামা বিশিষ্ট মহাস্থবির লাভ করবেন এবং প্রতিবছর তাঁদের জয়ন্তী করতে পারবেন। এখন দু'চার বছর জয়ন্তী করার পর আর কোন পণ্ডিত খ্যাতনামা ভিক্ষুর জয়ন্তী করা আপনার ভাগ্যে ধরবে না। অতএব, একদিনের অনুষ্ঠানে শক্তিক্রয় করার চাইতে ভিক্ষু- শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার স্থায়ী ব্যবস্থাই প্রাজেকের কাজ হবে বলে মনে করি।

প্রিয় উপাসক, আপনার ন্যায় ধন সম্পদ, এই সমাজ খুঁজলে আরো মিলবে, কিন্তু আপনার ন্যায় মনের মানুষ বিরল বলেই এদেশের বুদ্ধ শাসন ও সদ্ধর্মের সমস্যা নিয়ে কারো মাথা ব্যথা হয়নি। অতএব, আমার প্রস্তাবটি গভীর ভাবে চিন্তা করার অনুরোধ জানাই।

[বিঃ দ্রঃ - আসামের মেঘালয় রাজ্যের শিলং এ সামান্য একটি ব্যবসায়ী আমাদের সন্তান হেমেন্দু বিকাশ বড়ুয়া, সেদিন আমার চিঠির মর্মার্থ যথাযথ অনুধাবন করেছিলেন। পরবর্তীকালে কদলপুরে ভিক্ষু শিক্ষা কেন্দ্র করার প্রাথমিক ভিত্তি হলেও তিনি দিয়ে ছিলেন। বড়ো আশা করে আমি একজন শ্রীলংকার আচার্য ভদন্ত গোনুয়ে অস্‌সজী থেরো সহ সুগত প্রিয়কে দেশে নিয়ে এসেছিলাম, এই ভিক্ষু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করার জন্যে। কিন্তু, এদেশের গৃহী এবং ভিক্ষুদের চরম উদাসীনতা আমার সেই স্বপ্ন পূর্ণ হতে দিলনা।]

২৩/৭/৭৮ ইংরেজী, এত দিন আমার পরীক্ষাকালীন অনুপস্থিতিতে শান্তিময় শিশু ধর্মীয় স্কুলটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আজকে পুণঃ তা চালু করলাম। শিশুদের পড়াতে গিয়ে আমার মনে চিন্তা জাগলো - ১. আমার পক্ষ থেকে শিক্ষা পদ্ধতি গতানুগতিক মুখস্থ সর্বস্ব না হয়ে শিশুদের মন- মানসিকতা ভিত্তিক হওয়া দরকার। ২. বেশী সময় শিশুদের ধরে রেখে বিরক্তি উৎপাদন শিশু মনের অনুকূল নহে। আনন্দ এবং আশ্রয় নিয়ে নিয়ে দু'টি শব্দ বা একটি লাইন যদি শক্তি প্রমাণে উপমাও অর্থ সহ আয়ত্ত্ব করতে পারে তা- ই হবে যথাযথ। ৩. শিশুদের চলাফেরা, পরিচ্ছন্নতা ও চারিত্রিক জ্ঞান

উন্মেষের জন্যে পঞ্চশীল, মঙ্গল সূত্র এবং সেখিয়া ধর্ম গুলোর আকর্ষণীয় সহজ বোধ্য ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনা দরকার।

এখন আমার সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো জ্ঞানশ্রী ভক্তের সাথে ছায়ার ন্যায় ঘুরে ঘুরে থাকতে হয়। ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক সুমঙ্গল স্ববির। কিন্তু আমি ঝাঁপিয়ে না পড়লে, তিনি সহজে পা বাড়ান না। মহামন্ত্রের সম্পাদক জ্ঞানশ্রী ভক্তে। সেখানে ও ঘোড়ার মতো দৌড়তে হয় আমাকে- ই। এমতাবস্থায়, একা কি করে এই শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়মিত করা যায়?

গহিরা শান্তিময় বিহারে আমার স্বাধীন চলার ঘোষণার সুফল দেখা দিয়েছে। জানতে পারলাম প্রতাপ বাবুর ছেলে আশুতোষ আলোক সংঘ ও মৈত্রী সংঘ উভয় দলকে প্রস্তুত দিয়েছেন সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে। এর চেয়ে আনন্দ বার্তা আর কি ই বা হতে পারে। কিন্তু, প্রফুল্ল বাবু কি এত উদার হবেন? মূলতঃ মানুষটি ক্ষমতা লোভী।

২৪/৭/৭৮ ইংরেজী, আজকে কেন জানিনা আমার মন আনন্দে বার বার ভরে উঠছে খুব সকাল থেকেই। সাড়ে তিনটায় ঘুম থেকে উঠেছি। বিশ্ববিদ্যালয় হতে জোবরা হয়ে ফেরার পথে প্রজ্ঞানন্দ ভক্তের পরিত্যক্ত জোবরার এক ছোট শ্রমণকে আমার বাবা হাতে তুলে দিল মানুষ করার জন্যে। তার শ্রমণ নাম জ্ঞানরত্ন। ঠাকুর মায়ের মৃত্যুর সপ্তাহিক ক্রিয়া উপলক্ষ্যে প্রব্রজ্যা দান করা হয়েছে। তার বাবা নাকি চীবর ত্যাগ করনোর মুখে আমার বাবা বাঁধা দিয়ে রেখে দিয়েছেন। ছেলেটির গৃহী নাম নরেশ। পিতার বড়ো সন্তান। তাকে আমি খুব ছোট বেলা হতে দেখেছি। দুই কি তিন বছরের শিশু অবস্থায় তাকে কোলে করে তার মা ও বাবা ভারত থেকে এসেছে। তার বাবা খুব ক্রীড়া প্রিয় লোক ছিলেন। বড়ো হলেও আমাদের সাথে তাদের বাড়ীর সম্মুখ মাঠে দাড়ি বান্ধা খেলতো খুব। বর্তমানে পরিবার বড়ো হয়েছে। পৈতৃক জমি-জমা পৃথক হয়ে যাওয়ার পর যৎ সামান্য যা পেছে তা ইতিমধ্যে বিক্রি শেষ। চরম আর্থিক অনটনে আছে। শ্রমণটির মা- এক প্রকার বিনে চিকিৎসার মারা গেছে। আমার বাবা বলেছেন কাপড় ছাড়া মাত্রই ছেলেটিকে কারো বাড়ীতে পেটে ভাতে কাজে লাগিয়ে দেবে। বাবা পরীক্ষা করে দেখেছেন ছেলেটির নাকি মাথা ভালো, লেখাপড়ায় আগ্রহ আছে। সে সবে মাত্র চতুর্থ শ্রেণী হতে পঞ্চম শ্রেণীতে উঠেছে। স্ব গ্রামী জ্ঞাতী- গোত্রের মতো ছেলে। দেখা যাক তার ভাগ্যে কি আছে।

আজকে আমার সুখের কারণ- ক্লেমেশের ভাই ক্রিতিশ প্রাণ ভরে আমার সাথে কথা বলেছে। বহুদিন ধরে তাদের পরিবারের কেহ এযাবত কথা বলেনি ক্লেমেশের ঘটনার পর থেকে। আজকে গ্রামের সমস্যা সমাধানে পরমানন্দ বাবু এবং মণি ড্রাইভার ও খুব উৎসাহ পূর্ণ কথা বলেছেন। আসলে আজকে ভোরে আমার এত প্রীতি জাহত হওয়ার কারণ এ গুলোই মনে হয়।

২৫/৭/৭৮ ইংরেজী, গহিরা সত্তার ঘাটের উপাসক ডাঃ পঞ্চানন বড়ুয়ার প্রব্রজ্যা গ্রহণ বিষয়ে দিন তারিখ নির্ধারণের জ্ঞানশ্রী ভক্তের নিকট গেলাম। তিনি শিলং হতে

হেমেন্দু বাবু প্রদত্ত একটি চিঠি আমার হাতে দিলেন। চিঠিটি আমরা উভয়কে যৌথ ভাবে লিখিত। এই সুপত্রে তিনি আমার প্রস্তাবিত ভিক্ষু শিক্ষা কেন্দ্রকে অনুমোদন করেছেন। আমরা উভয়ের উপর ইহা বাস্তবায়নের নির্ভরতা প্রকাশ করেছেন। ক্রমান্বয়ে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ ভদন্ত শীলাচার শাস্ত্রীর নিকট টাকা প্রেরণের আশ্বাস দিয়েছেন। তবে শর্ত থাকছে- এই প্রতিষ্ঠান কদলপুরে তাঁর পৈতৃক বসত বাড়ীতে পাশে ভরাট কৃত জমির উপরেই হতে হবে।

২৬/৭/৭৮ ইংরেজী, রাতে মাষ্টার প্রফুল্ল বাবু আমাকে অভিযুক্ত করে বললেন, ক্ষেমেশ তার কৃত অপরাধ হতে রেহাই পেয়ে গেল, তার দাপটই বজায় রইল, আমার নমনীয়তার কারণে। মাষ্টার বাবুর ইচ্ছা আমি ক্ষেমেশের বিরুদ্ধে সালীশী ব্যবস্থা গ্রহণ করি। বিহার কমিটির ভাষ্য নেই বলে সতীনের পুত্ দিয়ে গোখরো সাপ ধরানোর ব্যবস্থা। আসলে দুষ্ট রাজনীতির চরিত্রটাই এমন হয়।

২৭/৭/৭৮ ইংরেজী, শান্তিময় বিহারে আজ সমঝোতা বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো মৈত্রী সংঘও আলোক সংঘের মধ্যে। এ পাড়ার যুবকদের আমি এমন একতা সম্প্রীতিই কামনা করে এসেছি এই বিহারে আমার আগমনের দিন থেকে। আজ তাই আমার আনন্দের সীমা নেই, যদিও আজকের বৈঠকে অংশ গ্রহণ করছি না নিরপেক্ষতার প্রশ্নে।

২৮/৭/৭৮ ইংরেজী, আজ থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি শ্রমণ জ্ঞানরত্ন সহ বিহারের সেবক ও কয়েকজন দারিদ্র ছেলেকে দৈনিক কিছুক্ষণ করে নিজে পড়াবো। তাই বিশ্ব বিদ্যালয়ে এম, এ, ক্লাশ শুরু না হওয়া পর্যন্ত সকাল ও বিকাল দুই বেলা, অতঃপর শুধু বিকেল বেলা তাদের পাঠ নেব। এই সিদ্ধান্তে শ্রমণ জ্ঞানরত্ন, রণধীর, রাখাল, এবং সুদর্শন এই চারজনকে পড়ানো শুরু করলাম।

৬/৭/৭৮ ইংরেজী, বিকেলে মাষ্টার প্রফুল্ল বাবুও সমীরের সাথে বুদ্ধের দেশনা বিধিও বর্তমান ভিক্ষুদের বক্তব্য উপস্থাপনা নিয়ে অনেক কথা হয়ে গেল। বস্তুতঃ বুদ্ধ প্রতিদিন ভিক্ষান্ন সংগ্রহের মাধ্যমে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সংকট, দুঃখ, উপদ্রব খুবই নিকট থেকে দেখতেন এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে এসব বিষয়ের উপর ভিত্তি করে স্থান- কাল-সমকালীন অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, আচার বিশ্বাস সব কিছুর সন্ধান পেয়ে যেতেন। কিন্তু, বর্তমানের ভিক্ষুদের দেশনা সম্পূর্ণ আকাশচারী, মাটির সাথে কোন সম্পর্কই এদের নেই। স্বর্গ এবং পরকাল নির্ভর এসব দেশনা মানুষকে কল্প লোকের শাস্তনা দিতে পারে, দৈনন্দিন জীবনে বুদ্ধদেশিত দুঃখ সত্যের অনুভূতি জাগাতে পারে না। আজকের আলোচনা আমার নিকট খুবই গুরুত্ব পূর্ণ মনে হলো।

৮/৮/৭৮ ইংরেজী, আজকে রাত সাড়ে তিনটে হতে লিখা শুরু করলাম চতুর্থ সংঘরাজ বরজ্জান (অংখী) মহাস্থবিরের জীবনী আলোচ্য। মধ্যাহ্ন ভোজ গ্রহণ করলাম চট্টগ্রাম বুদ্ধ মন্দিরে ভদন্ত শীলাচার শাস্ত্রী আয়োজিত সংঘদানে।

সংঘরাজ বরজ্জান মহাস্থবিরের জীবনী তথ্য সংগ্রহের জন্যে তিনিও আমাকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করলেন। কিন্তু, হেমেন্দু বাবু টাকা নিয়ে ভদ্র মহোদয়ের সাথে চিঠিখ্য করছেন - শাস্ত্রী ভণ্ডের এমন উক্তিটি মোটেই ভালো লাগলো না। খুব সম্ভবতঃ শাস্ত্রী ভণ্ডের নিকট হেমেন্দু বাবুর সংরক্ষিত অর্থ তিনি চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের কোন কাজে লাগাতে চেয়েছেন। এক্ষণে ঐ টাকা কদলপুরে ভিক্ষু শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে জ্ঞাত হয়েই তিনি হেমেন্দু বাবুর উপর চটে গেছেন।

চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারে সংঘদান অনুষ্ঠান শেষ করে আমি মেহেদীবাগ সরকারী কলোনীতে শাক্য বাবুর (শান্ত বাবুর জামাতা) বাসায় গেলাম। শাক্য বাবুর সাথে জোবরাহু জ্ঞানশ্রী ভণ্ডের জমি, আমার জন্যে একটি পাসপোর্ট এবং গহিরা শান্তিময় বিহারে সরকার অনুমোদিত একটি পালিটোল চালু করার বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম। পালিটোল বিষয়ে তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি প্রথমে রাউজান থানার শিক্ষা অফিসার দ্বারা পরিদর্শন করাতে হবে। সেই পরিদর্শন রিপোর্ট ডি, সি, অফিসে আসলেই তিনি সাহায্য করতে পারবেন। আমি সন্ধ্যায় মাষ্টার প্রফুল্ল বাবুর সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলাম, থানা শিক্ষা অফিসারের পরিদর্শন প্রস্তুতির জন্যে। এখন, সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ালো পালিটোলের জন্যে পৃথক ঘর এবং প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র।

১৭/৮/৭৮ ইংরেজী, আজকে বর্ষা ব্রতের দ্বিতীয় পূর্ণিমা। বিকালের ধর্ম আলোচনা সভায় মিলিন্দ প্রশ্নের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষু- গৃহীদের জীবনে ধ্যান অনুশীলনের অপরিহার্যতা নিয়ে অনেক কথা বললাম। উপোসধিকদের সাথে ধর্মালোচনা শেষ করে কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিতে গিয়ে নিজের মনে প্রশ্ন জাগলো আমি একজন ভিক্ষু হয়ে এখন যেই জীবন যাপন করছি- এমন জীবন কি করে বুদ্ধ প্রশংসিত হতে পারে? বুদ্ধ যদি থাকতেন তাহলে নিশ্চয় তিনি আমাকে মূর্খ, বিপথগামী ভিক্ষু বলে ভর্ৎসনা করতেন। হায়! আমি কবে এমন জীবন থেকে রেহাই পাবো? ধর্ম ও সমাজ কল্যাণের নামে দিন- রাত দৌড়- ঝাঁপ দিতে গিয়ে আমার মন- মানসিকতা দিন দিন কোন্ অতলে তলিয়ে যাচ্ছে?

১৮/৮/৭৮ ইংরেজী, মধ্যাহ্ন ভোজের পর শ্রমণদের কিছুক্ষন অংক শিক্ষা দিয়ে জ্যোতিঃপাল মহাথেরো লিখিত মালয়েশিয়া ভ্রমণ কাহিনী পড়লাম কিছু অংশ।

১৯/৮/৭৮ ইংরেজী, রাত সাড়ে বারোটায় জাগ্রত হয়ে গতকালের ভ্রমণ কাহিনীটি পাঠ আবার শুরু করলাম। প্রাতঃরাশের পর শহরে গেলাম পাস- পোর্ট বিষয়ে। কাজ অসমাপ্ত রেখে সকাল ১০টায় আবার বিহারে ফিরলাম। সারা বিকেলটা অতিবাহিত করলাম সেই মালয়েশিয়া ভ্রমণ কাহিনী পড়তে পড়তে।

২২/৮/৭৮ ইংরেজী, রাত ৩টায় ঘুম থেকে উঠে ভিক্ষু মহামন্ডলের সেক্রেটারী এবং পোমরার অবস্থানরত ভিক্ষু বিমলানন্দকে (গুরানমার্কনের) দুটি চিঠি লিখলাম। বিষয়টা হলো বিমলানন্দ ভিক্ষু আমার বই এর আলমিরার তালা ভেঙ্গে মূলবান প্রায়

ধর্মগ্রন্থ গুলো নিয়ে গেছে। এই ভিক্ষু বই গুলোর কয়েকটি মীরের খিলের ভিক্ষু আনন্দের নিকট বিক্রি করেছে। আনন্দ পুস্তকে আমার নাম দেখতে পেয়ে ফেরত দিয়েছে। ভিক্ষুটিকে আমার অনার্স পরীক্ষা চলা কালে শান্তিময় বিহারের সাময়িক দায়িত্ব প্রদান করে আমি জোবরায় ছিলাম। ভিক্ষু মহামন্ডলকে তার এহেন অপকর্ম অবগত করে বাকী বইগুলো ফেরত পাওয়ার আবেদন জানালাম।

প্রাতঃরাশের পর জোবরা গেলাম। মা বললেন ছোট ভাই অশোক একটি লেদ মেশিন ক্রয়ের জন্যে বাবা মার কাছে টাকার জন্যে ভীষণ পীড়া পীড়ি করছে। জোবরা হতে বিশ্ব বিদ্যালয় গিয়ে আমার ষ্টাইপেন্ডটা লাভ করলাম, মহামন্ডল ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের কিছু চিঠি টাইপ করে পাঠ করলাম। তার পরে ট্রেন যোগে রওনা হলাম শহরে পাসপোর্ট সংক্রান্ত কাজে। ট্রেনে আমাদের বাংলা বিভাগের সাথী পরীক্ষার্থীর মুখে শুনলাম- এবারে আমাদের বাংলা বিভাগের বি,এ, অনার্স পরীক্ষার ফল খুব খারাপ হবে।

২৬/৮/৭৮ ইংরেজী, আজ সকালে শান্তিময় বিহারে ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক ভদন্ত সুমঙ্গল স্ববির সংঘরক্ষিত ভণ্ডেকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি জানালেন যে, কিছু দিনের মধ্যে তিনি ময়মনসিংহে একটি কলেজে অধ্যাপনার জন্যে চলে যাবেন। উল্লেখ্য যে, তিনি ইংরেজী বিভাগে এম, এ, পাশ করেছেন। অতএব, মহামন্ডল ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের দায়িত্ব পালনে অক্ষম। ভণ্ডে এম, এ, পাশ করেছেন চাকুরী করবেন, এতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু, বৌদ্ধ সমাজ ও সংঘ হতে সম্পূর্ণ বিবর্জিত ময়মনসিংহে! আমার সন্দেহ জাগলো দৈহিক ভাবে অর্ধপঙ্গু- এমন শান্ত- দান্ত লোকটিও কি শেষ পর্যন্ত ভিক্ষু জিনসেনের পথ ধরবেন? আমার মনে শিক্ষিত ভিক্ষুদের এই তুচ্ছ চাকুরীর মোহের প্রতি সাংঘাতিক ঘণাভাব জাগ্রত হলো। ভণ্ডেকে বললাম, চট্টগ্রাম বা কুমিল্লার দিকে কোথাও পেলেন না? ইংরেজী অধ্যাপকের ডিমান্ড তো যথেষ্ট আছে বিভিন্ন কলেজে। আসলে সমস্যা হলো তিনি বি,এ,পাস কোর্সে এম, এ, তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ। তাই ডিমান্ড অপ্রতুল।

যাই হউক সিদ্ধান্ত নিলাম ভদন্ত মহোদয়কে নিয়ে জ্ঞানশ্রী ভণ্ডের সাথে দেখা করবো। আজকে উভয়ে মিলে ১৯৭৮ ইংরেজী ধর্মীয় বৃত্তি পরীক্ষা বিজ্ঞপ্তি বিভিন্ন বিহারে পাঠানোর ব্যবস্থা করলাম।

২৭/৮/৭৮ ইংরেজী, আজকে শান্তিময় বিহার পালিটোলার তৃতীয় শ্রেণী হতে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রদের সাময়িক পরীক্ষা গ্রহণ করলাম।

বিকালে সমীর ও বুদ্ধ আত্ন বাবুর সাথে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও আমাদের দেশ নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ হলো।

৩/৯/৭৮ ইংরেজী, জ্ঞানশ্রী ভণ্ডের সাথে দেখা করার জন্যে সুমঙ্গল ভণ্ডেকে নিয়ে পশ্চিম আর্থার মানিক এক সংঘদানে উপস্থিত হলাম। জ্ঞানশ্রী ভণ্ডে চাকুরী করতে যাওয়া পছন্দ করলেন না। সুমঙ্গল ভণ্ডেকে এই চাকুরী মানসিকতা ত্যাগের উপদেশ

দিলেন। কিন্তু, ভদন্ত মহোদয় সম্মতিসূচক কিছুই বললেন না। আর্থার মানিক হতে ফেরার পথে মধ্যম বিনাজুরীতে ধর্মানন্দ ভণ্ডের স্মৃতি মন্দিরটি দেখতে গেলাম। সংঘরক্ষিত ভণ্ডে স্বীয় গুরুর এমন মনোজ্ঞ রুচি সম্পন্ন পূজা দিতে পারাটা সত্যি সৌভাগ্যের। নিজের থেকে পঞ্চগ্নটি টাকা ভণ্ডের হাতে তুলেদিয়ে তাঁর গুরু পূজায় অংশ গ্রহণ করলাম। এই সংঘরক্ষিত ভণ্ডের সকল জ্ঞাতি স্বজন ভারতে। কিন্তু, পুত্রাধিক স্নেহে লালিত হয়েছেন পূজ্য ধর্মানন্দ ভণ্ডের অভয় আশ্রয়ে। আর মরণ কালে পিতৃতুল্য সেবা দিলেন তিনি গুরুকে। সত্যি, ব্রহ্মচর্য জীবনে এমন ভাবে পরম্পর নির্ভর শীল হতে না পারলে সুখ কোথায়? শান্তনা কোথায়? আশ্বাস কোথায়? আশ্রয়-ই বা কোথায়?

৮/৯/৭৮ ইংরেজী, গহিরা দক্ষিণ পাড়ায় এক সংঘদানে শ্রদ্ধেয় গিরিমানন্দ ভণ্ডে আসলেন। ভণ্ডের বিহারে ধর্মীয় শিক্ষা কেমন চলছে জানতে চাইলে তিনি বললেন ছেলেদের বিহারে তো কিছুতেই আনতে পরছি না। ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি আগ্রহ তেমন নেই। এখন সপ্তাহে খাওয়ার ব্যবস্থা করেও বিহারে উপস্থিত করাতে পারছি না। ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতি মহোদয়ের বিহারে ধর্মশিক্ষার এমন দুর্াবস্থার কথা শুনে মনে মনে হাসলাম বটে, কিন্তু, সবার দ্বারা সব কাজ যেমন হয় না, তেমনি গণ জাগরণে বয়স- কালও একটি যে বড়ো প্রশ্ন সেই চিন্তাও তো করতে হয়। নব যৌবনের প্রাণ বন্যায় যে ভাবে সব কিছুকে ভাসিয়ে নেয়া চলে, অন্তগামী যৌবনের অবসাদ গ্রস্ত মনে সেই উদ্যম উৎসাহ কোথায়? ভণ্ডেকে পরামর্শ দিলাম বিভিন্ন সভা- অনুষ্ঠান এবং তিথি নিমন্ত্রণে ধর্মীয় শিক্ষার উপকারীতা নিয়ে সব সময় কিছু বলতে।

৯/৯/৭৮ ইংরেজী, আজকে বর্ষাবাসের অষ্টমী তিথি। বিকালের ধর্মালোচনা সভায় অষ্টশীলধারী উপোসথিক ছাড়া ও অনেক কুলবধু ও মহিলার আগমণ হয়েছে ধর্মশ্রবণ করতে। আমি মিলিন্দ প্রশ্নের আলোকে তাদের ধর্ম দেশনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গ ক্রমে বললাম- আমাদের সমাজে গৃহীরা ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে শুধুনহে দৈনন্দিন কাজ কর্মে কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ- এই সামান্য বিচার টুকু পর্যন্ত করতে ইচ্ছুক নহেন। এমন মাতা পিতার ঘরে রাজা মিলিন্দের ন্যায় বিজ্ঞ প্রশ্নকর্তা বা ভদন্ত নাগসেনের ন্যায় এমন মহাপ্রাজ্ঞ উত্তর দাতার জন্ম হবে কি করে? আমাদের সমাজে সেই মাতা- পিতাও নেই, সেই গুরু শিষ্যও নেই। বর্তমান সমাজের এই দৈন্যতার জন্যে মৌলিক ভাবে ভিক্ষু সঙ্ঘকে-ই দায়ী করা যায়। কারণ, ভিক্ষুরা যদি পালার ছোয়াইং এবং তিথি-শ্রাদ্ধের-দান-দক্ষিণার সন্ধানে সারা জীবন গত না করে, ভিক্ষান্ন জীবি হয়ে বুদ্ধের ন্যায় গণ জাগরণে ঘুরে বেড়াতেন, তা হলে সমাজের পরিস্থিতি এমন শোচনীয় হয়ে পড়তো না।

রাতে মাষ্টার প্রফুল্ল বাবু আসলে তাঁকে অনুরোধ জানালাম তিনি বুদ্ধের জীবন ও জাতক অবলম্বনে যেন স্বল্প সময়ের কীর্তন, নাটক ও গান রচনা করেন, যা- দিয়ে মানুষের অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার অপনোদন হয়। তিনি মন্তব্য করলেন আমাদের এই

চিন্তা খুবই কার্যকর ও আকর্ষণীয় হবে যদি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে পারঙ্গম একটি ছোট দল গঠন করা যায়।

মহামন্ডল ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের জন্মলগ্নের বাস্তব চিত্র

১০/৯/৭৮ ইংরেজী, গত কয়েকদিন ধরে লিখতে লিখতে আজ ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের প্রশ্ন পত্রগুলো তৈরীর কাজ সমাপ্ত করলাম। প্রাতঃরাশের পর এগুলো নিয়ে জোবরা গেলাম। সাইক্লোস্টাইলের জন্যে এক্সটেনসিল কাটার জন্যে প্রশান্তের নিকট উপস্থিত হলাম। সে খুবই বিরক্তি ভাব প্রদর্শন করলো। তার ব্যবহারে আমি মনঃক্ষুব্ধ হলাম। বললাম, তুমি আমার উপর যে কারণে বিরক্ত হচ্ছে, আমি ও একই কারণে ক্ষুব্ধ যে, সমাজের মঙ্গল চিন্তা করতে গিয়ে এই কয়েকদিন ধরে আমার রাতের ঘুম পর্যন্ত চলে গেছে। আজকেও ঘুম থেকে উঠেছি রাত ২টায়। এই সমাজের কাজের জন্যেই আমার কলেজের পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারিনি, এবারে অনার্স পরীক্ষার রেজাল্টও শুনলাম ভালো হবে না। আমি তোও তোমারই মতো নিজের স্বার্থ, সুখ, শান্তি জলাঞ্জলী দিয়ে এসব করে যাচ্ছি সমাজের মঙ্গল কামনা করে। তুমি তো নিশ্চয় শুনেছ সুমঙ্গল ভণ্ডে ও চীবর রাখবেন কি না সন্দেহ, জিনসেন ভিক্ষুতো এখন জ্যোতিষ বাবু হয়ে তোমাদের বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রভাষক হচ্ছেন। তুমি তো দেখতেই পাচ্ছ, এক আমি ছাড়া অন্যকোন শিক্ষিত ভিক্ষু সমাজের এই কল্যাণ মূলক কাজে কী করেছে। মহামন্ডল ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের জন্ম লগ্ন হতে তুমি, ভূপতি বাবু এবং জয়কান্তি কাকা, জোবরার এই তিনজনের অকৃত্রিম সহায়তা না পেলে এই কার্যক্রম কবে জানি বন্ধ হয়ে যেত। তোমাদের এই ত্যাগ এ সমাজ কোন দিন স্মরণ রাখবে কি-না জানিনা; তবে এই বলে শান্তনা পাবে যে, আজ বড়ুয়া সমাজের দুই তিনশ শিশু এই ধর্মীয় শিক্ষায় অংশ গ্রহণ করছে। তোমরা সত্যিই মহাপুণ্যময় কাজে আমাকে সহায়তা করছ।

সে বললো, ভণ্ডে জানেন একটি এক্সটেনসিল পেপারের দাম কতো? আমার টাইপ করার শ্রমের কথা তো বলছি। কিন্তু, আপনাকে এতদিন লজ্জায় বলিনি, আপনার কাজ নিয়ে আফিসে আমি বহু অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি। একই সমস্যার কথা বলেছেন ভূপতি বাবুও। কিন্তু, উপায় কি? জ্ঞানশ্রী ভণ্ডের হাত থেকে তো এসব কাজে এক ফোটা পানিও ঝরে না। সব খরচ আমারই ঘাঁড়ে।

১১/৯/৭৮ ইংরেজী, গত কালের কথাই বলছি। প্রশান্তের ব্যবহার মনে দুঃখ পেয়েছি। কিন্তু, তা- কেই বা দোষ দিই কি করে? বিগত দু'তিন বছর ধরে ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের যত টাইপের কাজ সে অস্মান- বদনে আমাকে করে দিয়েছে। সাইক্লোস্টাইলে ছাপবার কাজ সবই তো ভূপতি বাবুও জয়কান্তি বাবুর সহায়তায়। মুসলিম ষ্টাপদের মনরক্ষায় জন্যে দশ- বিশ টাকা যা দিতাম। তাঁদের এই অকৃত্রিম সাহায্যের ঋণ অস্বীকার করবো কি করে? পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র ছাড়াও সারা বছরের সমস্ত বিজ্ঞপ্তি, সভা- আহ্বানের নোটিশ, সব গুলো তো তাদের সাহায্যেই করে

আসছি। দু'চার টাকা চাঁ পানের জন্যে দিতে চাইলে ও নেয়নি কেহ। জ্ঞানশ্রী ভণ্ডে তো এসমস্ত ব্যাপারে চির উদাসীন। গিরিমানন্দ ভাণ্ডে সভাপতির গদিতেই দায়িত্ব শেষ। সকলে মনে করেন এসব প্রজ্ঞাবংশের সৃষ্ট উপদ্রব। নানা সভা- সমাবেশে আমার সমালোচনার ভয়েই তাঁরা আমার কথায় না করেন না বটে, কিন্তু অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারলেন কৈ? গহিরার বোধি বিহারে ভিক্ষু জ্ঞান জ্যোতি বিশ্ব বিদ্যালয়ের ক্রাশ নিয়ে যে ভাবে ব্যস্ত, আমার হাতের পাশে থেকেও, এত অনুরোধের পরেও কোন দিন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এগিয়ে এলো না। বহু চেষ্টা যত্নের পর সুমঙ্গল ভণ্ডে যে কয়দিন সহানুভূতি দেখালেন, তিনিও চাকুরীর নামে এখন সড়ে পড়লেন। আমার একার পক্ষে এভাবে আর কতদিন সম্ভব?

১২/৯/৭৮ ইংরেজী, আজ সারদিন ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের পরীক্ষা কেন্দ্র বিজ্ঞপ্তি বিলির কাজেই চলে গেল। রাতে প্রফুল্ল বাবু আলাপ প্রসঙ্গে বলে বসলেন, আমি যদি সারা জীবন এই বিহারে থাকার প্রতিশ্রুতি দিই, তবেই তিনি এই বিহারের সুবিধার্থে তার পক্ষ থেকে যা যা করা সম্ভব সবই করবেন। তাঁর অভিমত হলো আজ-বাজে ভিক্ষু বিহারে রাখলে কাজের চেয় অকাজই বেশী হয়। তখন তো বিহার আর ধর্মস্থান থাকে না, নোংরা গ্রাম্য রাজনীতির আখড়া হয়ে দাঁড়ায়। তাই এতদিন তিনি বিহারের সাল্লিখ্য হতে নিজে থেকে দূরে রেখেছিলেন।

আমি বললাম বুদ্ধ যেখানে রাজা মহারাজদের কথায় আজীবন শ্রাবস্তী বা রাজগৃহে কাটাতে পারলেন না, সেখানে আমি কি করে আপনাকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি?

১৬/৯/৭৮ ইংরেজী, আজ পবিত্র বর্ষাব্রতের শুভ মধুপূর্ণিমা। গত পরশু থেকে একক চেষ্টার পর আজ সকালে সম্ভব হলো শান্তিময় বিহারে দেয়াল পত্রিকার মধুপূর্ণিমা সংখ্যা প্রকাশ করা। গতকাল বোধি বিহার হতে উপোসথ কর্ম সম্পন্ন করে আসার পর থেকে, ছোট ছেলেদের নিয়ে রাত ভর কাজ করে বিহার সজ্জা ও দেয়াল পত্রিকা প্রকাশনায়, সত্যিই বিহারে উৎসবের আমেজ এসেছে। প্রাতঃকালীন বুদ্ধ পূজায় জন সমাগম ও আশাতীত হলো। বিকেলে জনতার চাপে ধর্মলোচনায় ব্যাঘাত হলেও বলতে হবে, সফল একটি পূর্ণিমা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলাম।

রাতে বিহারে আসলেন নানুপুর হরকিশোর মহাজনের বড় ছেলেটি। তিনি বললেন, কামে উন্মত্ত হলেও স্বীয় মা-কে কেমন করে একজন ভিক্ষু- এমন জঘন্য ব্যবহার করা সম্ভব?

১৮/৯/৭৮ ইংরেজী, অতিরিক্ত খাটুনি, আর রাত জাগার কারণে শরীরের দুর্বলতা বেড়েছে। আজ একটু জ্বর জ্বর লাগছে সর্দির সাথে। কিছুই করতে ইচ্ছে জাগছেনা। তবুও ভোর সাড়ে চারটা হতে রুটিন অনুসারে চলার চেষ্টা হলো।

গতকাল প্রফুল্ল মাষ্টার কমিউনিষ্ট পার্টির কেডার তৈরীর প্রণালীর বর্ণনা দিলেন। বুদ্ধের প্রণীত বিনয় নীতিও তো একই বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। কিন্তু, অভাবে স্বভাব নষ্ট। ব্যাঙএর ছাতার মতো গজিয়ে উঠা বিহার গুলোতে পুরোহিত ভিক্ষুর যোগান দিতে

গিয়ে, আমরা কি সেই বিনয় নীতি মানতে পারছি? ভিক্ষু হয়ে পাঁচ বছর গুরুর অধীনে থাকা দূরে থাক, পাঁচ দিনের মধ্যেই তো অনেক ভিক্ষুকে বিহারের দায়িত্ব দিতে হচ্ছে।

প্রফুল্ল বাবু আর একটি গুরুত্ব পূর্ণ কথা বললেন, তিনি পরামর্শ দিলেন প্রতিটি অঞ্চল হতে প্রচলিত গ্রাম্য প্রবাদ ও উপখ্যানগুলো সংগ্রহ করে সেগুলোর উপর একটি রচনা সংগ্রহ প্রকাশ করতে। এতে করে হারিয়ে যাওয়া অনেক ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধৃতিতে হবে।

১৯/৯/৭৮ ইংরেজী। মধ্যাহ্ন ভোজের পর জ্ঞানশ্রী ভাস্তে সহ শহরে গেলাম, কিছু বায়োকেমিক ঔষধ ক্রয় এবং শাক্য বাবুর নিকট আমার পাস পোর্ট এর কাজের অগ্রগতি জানতে। শহরের বিহারে থেকে গেলাম। উভয়ের মধ্যে আলোচনা হলো, আমাদের জয়েন্ট একাউন্টকে ট্রাস্টি- বোর্ড- এ রূপান্তরিত করে- তাকে রেজিস্ট্রী কৃত করার চেষ্টা করতে। আমার কথা হলো ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের টাকা নিরাপদে রাখার চিন্তা তিনি এভাবে করলেন, নিলেন কিন্তু বাদ বাকী কাজ করতে তো আমার জিহ্বা বের হয়ে যাওয়া উপক্রম হচ্ছে।

২০/৯/৭৮ ইংরেজী, সাড়ে চার টায় ঘুম থেকে উঠার পর এস, এস, সি, পরীক্ষার্থীদের জন্যে কিছু পালির নোট তৈরীর কাজে হাত দিলাম। গত কয়েকদিন ধরে যোগব্যায়াম বন্ধ করেছি শারিরীক অসুস্থতা ও দুর্বলতার কারণে। জ্ঞান রত্ন, হরিপদ (জোবরা) ও সম্মিত (গহিরা) কে আগের মতো Extra কিছু শেখানো সম্ভব হচ্ছে না। কেবল তাদের স্কুলের পড়া আদায়ের সাহায্যই করতে হচ্ছে।

আজকে মাষ্টার প্রফুল্ল বাবু কমিউনিষ্ট পার্টির জেলাকর্মী কমরেড আব্দুর সাত্তার এর উদাহরণ দিয়ে বললেন, বর্তমান ভিক্ষুরা বুকের 'চরখ ভিক্ষুবে চারিকং বহজান হিতায় ...' কথাটির অর্থ বুঝতে পারলে এই সত্তার সাহেবের মতই জীবন যাপন করতেন।

২১/৯/৭৮ ইংরেজী। শ্রামণ আর ছেলেদের পড়ানোর সাথে সাথে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আমার কিছু রচনা একটি নির্দিষ্ট খাতায় সংগ্রহ করার কাজে হাত দিলাম। রাত ২-৪৫ মিঃ হতে চেষ্টা করছি দৈনিক বুটিন মত চলতে।

আজকে সন্ধ্যায় প্রফুল্ল বাবু মহাসভা ও মহামণ্ডলের সংবিধানকে যুগোপযোগী করে প্রণয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিলেন। আমি বললাম সংবিধান রচনা করা তো যায়, কিন্তু প্রবীণ ভিক্ষুরা এই সংবিধানের মর্ম বুঝতে অক্ষম। নবীন শিক্ষিত ভিক্ষু বলতে যা বুঝায়, ভিক্ষু জীবন তো তাদের জন্য উদর পূর্তির নিশ্চয়তা ছাড়া আর কিছু নয়। তাই বি.এ. এম. এ. পাশের পর একটি মাষ্টারী চাকুরীই তাদের মূল লক্ষ্য। এমনাবস্থায় আপনার সংবিধান যত আধুনিকই হোকনা কেন, সবই বেকার। তিনি বললেন, মহাসভা ও মহামণ্ডলের কমপক্ষে একটি বিহার নিয়ন্ত্রন বিধিমালা প্রণয়ন

একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে প্রতিটি বিহারের সমস্যা সমাধানের জন্য অন্য কোন কিছু করতে পারবেন না। আমি এই মতের সমর্থন করি।

২২/৯/৭৮ ইংরেজী। সকালে বিপুলদের বাড়ীতে প্রাতঃরাশ গ্রহণের পর বিহারে পৌঁছলে আমাকে জানানো হলো, বাবা নাকি খুব অসুস্থ। সহসা জোবরা গেলাম, দেখলাম খবরটি সম্পূর্ণ ভূয়া। যাক, জ্ঞানশ্রী ভাঙে বললেন দুপুরে সংঘদানে মীরেরখীলের আনন্দরা আসবে তাদের নিয়ে তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবেন, এই হলো আসল কথা।

আনন্দ ভিক্ষু আসল, সংঘদান হলো, আর ভাঙে শোনালেন যে, হেমেন্দু বাবু ভিক্ষু শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য দুইলক্ষ টাকা ব্যায়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তার পর ১৯৮১ সালের মধ্যে আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের ফাণ্ডটি ও পূর্ণ শক্তি অর্জনে সক্ষম হবে। তখন হেমেন্দু বাবু যদি আমাদের কোন প্রকার সাহায্য আমাদের নাও করেন, কোন অসুবিধা হবেনা। আমরা নিজস্ব শক্তিতেই অগ্রসর হতে পারব। তখন আমাদের ফাণ্ডের লভ্যাংশ যা পাওয়া যাবে তা দিয়েই অনায়াসে শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা যাবে। অতএব দ্বীপুণ উৎসাহে আমাদের শক্তিকে আরো নিরাপদ পর্যায়ে দাঁড় করানোর জন্য এখন থেকেই প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

২৪/৯/৭৮ ইংরেজী। আজ উপোসথ দিবস। প্রফুল্ল বাবু এসে আলাপ প্রসঙ্গে বললেন, বর্তমানে আমাদের ভিক্ষুরা বুদ্ধের ন্যায় লোক চরিত্র সংশোধনের কোন চেষ্টা না করে, কেবল দান দক্ষিণা সংগ্রহকেই সমধিক গুরুত্ব দিয়ে বসেছেন। দাতারা দুষ্ট চরিত্রের হলেও, তাদের প্রশংসাই কেবল করেন। অথচ বুদ্ধের শিক্ষা হলো, অজ্ঞতা দূর করতে প্রয়োজনে সরাসরি তার দোষ দেখিয়ে দেয়া।

২৫/৯/৭৮ ইংরেজী। সন্ধ্যায় প্রফুল্ল বাবু সহ আমরা কয়েকজন ‘বুদ্ধ নীতি সমুচ্চয়’ নামক পুস্তক হতে ‘পণ্ডিত কান্ড’ পর্যালোচনা শুরু করলাম। আমি একটি গাথা পাঠ করি, প্রফুল্ল বাবু তা আলোচনা করেন। সমগ্র অধ্যায়টি এভাবে আলোচনার পর পণ্ডিত পুরুষের স্বভাব, আচরণ, চিন্তন, মনন এবং সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর আমরা কিছু মত বিনিময় করলাম-বর্তমান সমাজ মানস ও মানুষের উপর।

২৬/৯/৭৮ ইংরেজী। রাত সাড়ে তিনটায় ঘুম হতে উঠে সমাগত ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদ সম্মেলনের বার্ষিক রিপোর্ট তৈরির কাজে হাত দিলাম। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর হাটহাজারী ও জোবরা হয়ে, গেলাম শহরে। জ্ঞানশ্রী ভাঙে প্রদত্ত টাকা জি পি ও তে জমা দিয়ে আমার ব্যবহারের কিছু চিড়া, গুড় ও ঔষধ ক্রয় করে বিকাল সাড়ে চারটায় গহিরা পৌঁছলাম। প্রতিদিনের ন্যায় সন্ধ্যা বন্দনার আগ পর্যন্ত গতদিনের সংবাদ পত্র পড়লাম। রাত ৯টা ১৫মি. পর্যন্ত প্রফুল্ল বাবুর সাথে বুদ্ধ নীতি সমুচ্চয়ের সৃজন কান্ডের উপর পাঠ ও আলোচনা হলো।

২৭/৯/৭৮ ইংরেজী আজকে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক সেকশনে গেলাম, আমার এম,এ, ফাইনালটা প্রাইভেট হিসেবে দেয়ার বিধি নিয়ম জানতে। কিন্তু, হিন্দু

কেরানী ভূপতি বাবু বললেন, অনার্স নিয়মিত থাকতে পারলেন এত কষ্ট করে, আর মাত্র একটা বছর সময়, কেন প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হয়ে নিজের ক্যারিয়ারটাকে নষ্ট করবেন। আমি কি করে বলবো যে, নিয়মিত ভাবে এম.এ ডিগ্রী নিলে, অন্য ভিক্ষুদের মত আমার ও চাকুরী করার, এমনকি চীবর ত্যাগ করার দুয়ার উন্মুক্ত থাকবে। প্রাইভেটে এম.এ নিলে এই হীন চিন্তা বন্ধ হবে। কিন্তু ভূপতি বাবু কিছুতেই সম্মতি দিলেন না।

২৮/৯/৭৮ ইংরেজী। গতকাল একাডেমিক সেকশন হতে এম.এ. ফাইনালে ভর্তি ফরম এনেছিলাম অনেক চিন্তা বিতর্কের মাধ্যমে। কারণ আমার ইচ্ছা সেই রেগুলার হিসেবে এম.এ পাশ করি। তারপরও শাহজালাল হলের অনাবাসিক ছাত্র হিসেবে ফরমটা পূর্ণ করলাম। উল্লেখ্য যে অনার্স এর মধ্যে আমি আমার মেঝদা ভূপতির প্রেরণায় এ,এফ রহমান হলের অনাবাসিক ছাত্র হিসেবে ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু প্রভোষ্টের কেরানীটি অমার্জিত প্রকৃতির বিধায়, এবারে হল পরিবর্তন করলাম। শাহজালাল হলে জুনিয়র ক্লার্ক হিসেবে আমার শৈশবের সাথী প্রশান্ত আছে, এমনিতেও নানা কাজে তার সহায়তা নিতে হয়- তাই এবারে শাহজালাল হলের ছাত্র হওয়া গেল।

এম.এ ভর্তি ফরম পূরণের সাথে সাথে, আমার গৃহী নাম সুব্রত কুমার বড়ুয়াটা ও বাদ দেওয়ার জন্য রেজিস্টার বরাবর দরখাস্ত করলাম। এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি. পরীক্ষার সার্টিফিকেট ইস্যু হয়ে যাওয়ায়, বহু চেষ্টা করেও বি.এ. অনার্স এর ভর্তির সময়ে নাম পরিবর্তন করতে পারিনি।

দক্ষিণ পাড়া হতে আসার পর বিহারে এসে দেখলাম জয়মঙ্গল দা ও নিরঞ্জন বাবু উভয়ে বিতর্কে লিপ্ত। নিরঞ্জন বাবু বললেন, মধু পূর্ণিমার দিনে মাছ মারার ফলে জয়মঙ্গল দাদার রোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি এ বিতর্কে যোগ না দিয়ে সীমা প্রতিষ্ঠার পিলার তৈরীর জন্য কংক্রীট ভাঙার কাজে লেগে গেলাম।

২৯/৯/৭৮ ইংরেজী। সন্ধ্যায় প্রফুল্ল বাবুর সাথে আলোচনা শুরু হল। তিনি বললেন শান্তিময় বিহারের পুরো পরিবেশ তিনি পাস্টে দিতেন, যদি কিছু নিবেদিত প্রাণ কর্মী পেতেন। আমাকে বললেন, বর্তমান ভিক্ষুদের দ্বারা কিছু হবেনা যতদিন সত্যের জন্য তারা জীবন বিসর্জন দেয়ার মত মানসিক শক্তির অধিকারী না হন। এখনতো সর্বত্রই চলছে দায়কের মনতোষণ গিরি।

আজকে আমি শ্রদ্ধেয় ধর্মাধার স্ববিরের সম্পাদকত্ব কালীণ মহামণ্ডলের সংবিধানটা পরে দেখলাম- এই সংবিধানটি বর্তমানের চেয়ে বহুগুনে উন্নত। ধর্ম ও সমাজ কল্যাণ চেতনা এই সংবিধানে যেভাবে বিধৃত, তা বর্তমান সংবিধানে প্রায় নাই বললেই চলে। তাই আগামী সভায় আমি ভিক্ষু সংঘকে ধর্মাধার ভণ্ডে প্রণীত সংবিধানের উপর বক্তব্য রাখার ইচ্ছা করছি। আমার ইচ্ছা কিছু সংশোধন করে ধর্মাধার ভণ্ডের গঠনতন্ত্রটিই মহামণ্ডল বাস্তবায়িত করুক।

৩০/৯/৭৮ ইংরেজী। সকালে জিনানন্দ ভাঙের ভাই শরত বাবুর বাড়ীতে আমন্ত্রণে গিয়ে বুদ্ধের দর্শন ও তার অনুশীলিত মার্গ শ্রী অনুকূল ঠাকুরের প্রভাবে তাঁর নিজের জীবনে অনেক অলৌকিক কল্যাণ সাধন করেছে। তাই কোন যুক্তিতেই এই মতের প্রতি তার অনাস্থা আসা অসম্ভব দেখলাম। মূলতঃ চরম ভক্তিবাদ, মিথ্যাদৃষ্টির কারণ হলেও অন্ধ মিথ্যাদৃষ্টির মতো পরমত ধ্বংসকারী নহে। তারা সমন্বয়বাদী। হিন্দু ধর্ম এই বৈশিষ্ট্যের গুণেই ভারতে টিকলো। আমার প্রস্তাবে একটি বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক দল গঠনের ইচ্ছায় প্রফুল্ল বাবু আজকে রণধীর, সঞ্জিত ও হরিপদ- বিহারের এই তিন ছেলেকে নিয়ে গান শেখানো শুরু করলেন।

১/১০/৭৮ ইংরেজী। আজকে মাষ্টার প্রফুল্ল বাবু রণধীর ও সঞ্জিতকে নিয়ে আমার লিখিত একটি বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘের গুণাবলী ভিত্তিক বন্দনা গাথাকে সংগীত হিসেবে উপস্থাপন করা যায় কি-না তা পরীক্ষা করলেন। দু'এক স্থানে সামান্য ছন্দ পতন ছাড়া, গানটির অনুশীলনে কোন অসুবিধে হলো না বটে, তবে প্রফুল্ল বাবু প্রদত্ত সুর তো প্রার্থনা সঙ্গীতের ভাব-গান্ধীর্থতা এবং হৃদয় তন্ময়তার অনুকূল নহে। এ-তো পালা কীর্তনের সুর।

২/১০/৭৮ ইংরেজী। আজ বিকেলে জোবরায় জ্ঞানশ্রী ভাঙের নিকট প্রীতি বাবু, রাউজানের প্রভাকর বাবু এবং হাইদচকিয়ার নৃপেন বাবু সহ বৈঠকে বসলাম। অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠির প্রকাশিত স্মরণিকায় আমাদের মহামণ্ডল ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের একটি প্রতিবেদন ছাপানোর জন্যে প্রস্তুত খসড়াটি; সকলে অনুমোদন করলেন। অতঃপর রাত ১১টা পর্যন্ত আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক নানা প্রাসঙ্গিক আলাপ করতে গিয়ে প্রভাকর বাবু বললেন- আগামী কঠিন চীবর মাসে ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের আদর্শ উদ্দেশ্যের ব্যাপক প্রচার এবং ফাণ্ড সংগ্রহের জন্যে একটি ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ বিশেষ প্রয়োজন। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, আগামীতে আপনারা একটি শক্তিশালী কর্মী বাহিনী সৃষ্টি করতে না পারলে বিত্তদানন্দ মহাথেরোর চ্যালেঞ্জ- এর মোকাবেলায় পর্যুদস্ত হয়ে যাবেন। এই প্রভাকর বাবু এবং নৃপেন বাবু উভয়ে কৃষ্টি প্রচার সংঘের সদস্য। কিন্তু, নিজের নিকায়ের প্রতি তাদের মমত্ববোধ ও হিতৈষণা মনোবৃত্তি দেখলে, ভদন্ত জ্যোতিপাল মহাথেরোকে সংঘরাজ নিকায়ের একটি পরগাছা বলেই প্রতীয়মান হয়।

৩/১০/৭৮ ইংরেজী। সকাল ৭টায় গহিরা হতে ভিক্ষু শুভাচার জোবরায় এসে আমাদের জানানলেন যে, মহামুণি মহানন্দ সংঘরাজ বিহারের বিহার কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সমাগত কঠিন চীবর দানে মণ্ডলের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠান করতে তারা আর আগ্রহী নহেন। কারণ, রাতভর এই সভা চলার কারণে পরবর্তী দিনে চীবর দানের সভায় ভিক্ষুরা প্রায় থাকেন না, স্ব স্ব বিহারে চলে যান। সিদ্ধান্তটির সত্যতা যাচাইয়ে জ্ঞানশ্রী ভাঙে শুভাচার ভিক্ষু সহ মির্জাপুরে সংঘরাজ ভাঙের সাথে এ প্রসঙ্গে আলাপ করে মহামুণি যাওয়ার জন্যে বের হলেন। আমার দায়িত্ব ছিল বিনাজুরীতে গিয়ে

সারানন্দ ভাস্কেকে জ্ঞানশ্রী ভাস্কো প্রদত্ত টাকা এক হাজার দিয়ে আসতে। কিন্তু, সারানন্দ ভাস্কো জোবরা উপস্থিত হওয়ায়, আমার আর যাওয়া দরকার হলো না। সারানন্দ ভাস্কো বললেন, এই টাকা আমি নেব না, তা জ্ঞানশ্রীকে দিয়ে দেবে, কাউটিলার পাশে অনিলদের জমিটা কিনে নিতে।

৪/১০/৭৮ ইংরেজী। রাত ৩টায় ঘুম থেকে উঠে বিনাজুরী ভাবনাশ্রম এবং শান্তিময় বিহারের সীমা ঘর তৈরীর চাঁদার হিসাব করলাম। মধ্যাহ্ন ভোজের পর বিনাজুরী রওনা হয়ে প্রথমে গিরিমানন্দ ভাস্কেকে জানাতে গেলাম, মহামুণি গ্রামে মণ্ডলের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠানের বিব্রাটের কথা। দীর্ঘ শতাব্দী কালের ঐতিহ্য ভঙ্গের এই সংবাদে তিনি মর্মাহত হলেন। সেখান থেকে আমার বিদর্শন ধ্যান শুরু পূজ্য শান্ত রক্ষিত ভাস্কের নিকটে গেলাম। ভাবনাশ্রম নির্মাণের দান গুলো দিয়ে চলে আসতে চাইলে, তিনি বাধ্য করলে রাতে অবস্থানের জন্যে। সারা বিকেল থেকে রাতভর বিদর্শন ভাবনা, ভাবনা কেন্দ্র ও ইহার সংবিধান, মহামণ্ডলের ক্যালেন্ডার ও উপোসথ তালিকার ক্রটি বিচ্যুতি নিয়ে অনেক আলাপ হয়। এক পর্যায়ে বর্তমানে বাংলায় অনুদিত পালি ব্যাকরণ গুলোর মধ্যে শ্রদ্ধেয় জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবিরের পালি প্রবেশকে উৎকৃষ্টতর বলে মত প্রকাশ করেন।

৭/১০/৭৮ ইংরেজী, সকালে প্রাতঃরাশের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম, কবে ক্লাশ শুরু হবে জানতে। কিন্তু দেখতে পেলাম পাঁচ দিন আগেই ক্লাশ শুরু হয়ে গেছে। অপ্রস্তুত বিধায় আজকেও ক্লাশ করলাম না। মনে মনে হাসলাম, আমার মতো দায়িত্ববান ভিক্ষু-ছাত্র যদি আরো থাকতো, খুব ভালো হতো বড়ুাদের জন্যে। জোবরায় কিছু কাজ সমাধা করে চলে আসলাম শান্তিময় বিহারে। বিকালে যথারীতি পালিটোলার ছাত্রদের কিছুক্ষণ পড়িয়ে সামান্য বিশ্রাম নিলাম, রাতে শান্তিময় বিহারের সাধারণ সভার জন্যে। রাতে সভা আরম্ভ হলে প্রবারণা, চীবর দান, সীমা ঘর প্রতিষ্ঠা এবং আমরা বিহার আবাসিকদের সংকট ও সমস্যাবলীর উপর আমি বক্তব্য রাখলাম। কিন্তু, দেখা গেল আমাদের প্রয়োজন মেটানোর, জন্যে তাদের আহ্বাহ তেমন নেই। প্রথানুগত বর্ষাবাস আমন্ত্রণের চিরাচরিত স্বরূপ স্পষ্ট উপলব্ধি করলাম আমি।

১১/১০/৭৮ ইংরেজী। প্রাতঃ রাশের পর পালিটোলার শিশুদের পড়াতে বসেছি। সাড়ে আটটা পর্যন্ত পড়িয়ে সারানন্দ ভাস্কো সহ কদলপুর রওনা দিলাম। সেখানে ১০/৩০মিঃ পৌঁছে মধ্যাহ্ন ভোজ গ্রহণ করলাম। বিকেলে জ্ঞানশ্রী ভাস্কো সহ আমাদের নিয়ে বিহারের দায়কদের সভা হলো। তাতে আমাকে বক্তব্য রাখতে বলা হলো সংঘ ও সমাজের উন্নতিতে হেমেন্দু বাবু সহ আমরা মুষ্টিমেয় ভিক্ষুরা কি চেষ্টা করছি।

১২/১০/৭৮ ইংরেজী। কদলপুরে প্রাতঃরাশের পর মহামণ্ডলের দ্বিতীয় বার্ষিক সভার সম্পাদকীয় রিপোর্টটি তৈরী করে দিলাম জ্ঞানশ্রী ভাস্কোকে। মধ্যাহ্ন ভোজের পরে

আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে বিভিন্ন আলাপ হলো জ্ঞানশ্রী ভাস্করের সাথে। সন্ধ্যায় আসলাম গহিরায়।

১৩/১০/৭৮ ইংরেজী। প্রায় সপ্তাহ ধরে, ঘড়ি বন্ধ হয়ে আছে। সময়ের অভাবে ও অবহেলায় মেকারের নিকট যেতে পারছিলাম না। ভোরে ঘুম থেকে উঠে জলপান, ঔষধ সেবন, যোগব্যায়াম, প্রাতঃকৃত্য শেষে শান্তিময় বিহার পালিটোলের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র তৈরী করলাম। সে সময়ে আমার মনে ইচ্ছা উৎপন্ন হলো, মহামণ্ডলের আগামী সভায় এই প্রস্তাবটি করতে বিত্তদ্বানন্দ ও প্রিয়ানন্দ মহাথেরোর সাথে ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগীতা কিভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব, এই নিয়ে উভয়ের সাথে মত বিনিময় করা। প্রাতঃ বন্দনা হতে উঠেই দেখি জোবরা হতে আমার মেঝেদিক জামাতা কমলকান্ত বারু উপস্থিত। তিনি জানালেন যে, গত বুধবারে আমার ছোট বোন কণিকার স্বামীকে তাদের মানিকছড়ি খামার বাড়ীতে হত্যা করা হয়েছে। এ দুঃসংবাদ শোনার সাথ সাথেই হাইদচকিয়া রওনা হলাম। অসম্ভব শ্রান্ত ও বিপর্যস্থ চিত্তে উপস্থিত হলাম মরদেহের পাশে, কিন্তু মুখটা পর্যন্ত দেখার সুযোগ হলো না। তারা বললো আঘাতে সম্পূর্ণ বিকৃত করে ফেলা হয়েছে চেহারা। আমি কিছুক্ষণ পাথরের মতো বসেছিলাম। কিন্তু কণিকার শিশু সন্তান বিটন যখন আমার কোল ঘেসে দাঁড়ালো তখনতার মাথায় হাত বুলাতে গিয়ে অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। কোথায় যাবে তারা? কে দেবে তাদের আশ্রয়? আমি আর বসে থাকতে পারলাম না। নীরবে অনন্ত জিজ্ঞাসা বুকে নিয়ে জানার খিল বিহারে চলে আসলাম। মধ্যাহ্ন ভোজ সেখানেই মুখে দিলাম কোন মতে। সন্ধ্যায় গহিরা ফিরে এসে কোন প্রকারে বন্দনা সমাপ্ত করে বিটনের বাবাও তাদের মঙ্গল কামনায় পুণ্যদান করতে করতে সোজা বিছানায় গিয়ে পড়ে রইলাম।

১৪/১০/৭৮ ইংরেজী। কিভাবে রাত গেল; কিভাবে ভোর হলো বুঝিনি। বার বার অবোধ শিশু বিটন, তার আশ্রয়হীনা মা, তার নিহত পিতার মুখ ভেসে ভেসে উঠছে। আমি বার বার চেষ্টা করছি এই স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে। কিন্তু, পারছি কৈ? সকাল ৭টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। আজকেই আমার পক্ষে সম্ভব হলো এম.এ. ফাইনাল এর ক্লাশে প্রথম যোগদানের। ক্লাশ পেলাম ডঃ আবুহেনা মোস্তফা কামাল স্যারের। তিনি খুবই হতাশার সুরে বললেন, আজকাল ছাত্রদের অধ্যয়ন স্পৃহা সীমাবদ্ধতা দেখে আমি অবাক হয়ে যাই, কেন তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে। স্যারের এই উক্তিটি আমাকে ভীষণ ভাবে পীড়িত করলো। সমাজ কল্যাণ, ধর্ম কল্যাণ করতে করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া যে আমার কাছে নেয়েহাত গৌণ বিষয় হয়ে পড়েছে। আসলে এমন সীমাবদ্ধতা নিয়ে এই ডিম্বী না নেয়াই ভালো। ভবিষ্যতে বড়ো লজ্জাকর বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। আগামীকাল প্রবারণা পূর্ণিমা। তাই বিহারে এসেই বিহার সজ্জার কাজে লেগে গেলাম ছেলেদের নিয়ে। কিছুক্ষণ মনকে কাজে ডুবিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু, জোবরা হতে ভাগিনা নিধু এসে যখন বিটনের বাবার

সপ্তাহিক ক্রিয়ার আমন্ত্রণ জানাল তখন আবার আমি মুষড়ে পড়লাম। কিছুতেই তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারলাম না। দক্ষিণ পাড়া বিহারে গিয়ে কোন প্রকারে প্রবারণা বিনয় কর্ম করে এসেই শয্যা গ্রহণ করলাম শোকাভিভূত চিত্তে।

১৫/১০/৭৮ ইংরেজী। আজ শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা। ভোরে ঘুম থেকে উঠে, কিছুক্ষণ আমার স্বরচিত কিছু বন্দনা গীতি সংশোধন করলাম। নিরঞ্জন বাবুদের পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভোরের বুদ্ধ পূজা উৎসর্গ করলাম। স্নান ও প্রাতঃরাশের পর সাড়ে নয়টায় সার্বজনীন পূজা উৎসর্গ হলো। বিকেলে জাতক পড়ে শোনালাম। সন্ধ্যায় প্রদীপ পূজা ও পঞ্চশীল দিতে দিতে রাত ১০টার দিকে শয্যা নিতে পারলাম। মোটামুটি দিনটা কেটে গেলো কোন প্রকারে।

১৬/১০/৭৮ ইংরেজী। আজ আমার মনের অবস্থা তুলনামূলক ভাবে ভালো। পবিত্র ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত উদযাপিত হলো। সকালে উপোসখিকগণ আসলেন বর্ষাব্রতের অন্তিম বুদ্ধপূজা প্রদানে, পরস্পরকে বিদায় সম্বাষণ জ্ঞাপনে। ত্রিরত্নের শরণাগত থেকে পঞ্চশীলকে দৈনন্দিন জীবনে কিভাবে পালন করা যাবে এবং তাতে তাঁরা পরিবারে ও সমাজে কেমন শান্তিতে বসবাস করতে পারবে তার উপর ধর্মদেশনা করলাম। উপোসখিকদের পক্ষ হতে প্রস্তাব আসলো তাঁরা প্রতি রবিবার বিকেলে নিয়মিত বিহারে আসবেন ধর্ম শ্রবণের জন্যে। আমি সাধুবাদ জানালাম তাঁদের এই সদিচ্ছাকে।

১৭/১০/৭৮ ইংরেজী। আজ থেকে শুরু হলো মাস ব্যাপী কঠিন চীবর দান উৎসব। সকালে মীরের খিল রঙনা দিলাম। তথায় কঠিন চীবর দান সভায় আমাকে পূর্ব সিদ্ধান্ত মতে বক্তব্য রাখতে হলো, মহামণ্ডল ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্যোগে আজ বিভিন্ন গ্রামের শিশুরা ধর্মীয় শিক্ষায় কতদূর অগ্রসর হয়েছে। শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব যে মাতা পিতার অন্তিম জীবনে সুখে কাল কাটানোর পূর্বশর্ত তা বিশদ ভাবে তুলে ধরলাম।

বিকলে গহিরা জেতবনারামে সংঘরাজ ভিক্ষু মহামণ্ডলের বার্ষিক সাধারণ সভা। কিন্তু, শুরু থেকে দেখা দিল বিশৃঙ্খলা। মূলতঃ সত্যিকার কোন আলোচনা সিদ্ধান্তের প্রতি কারো আগ্রহ দেখলাম না। এ-টা যেন লোক দেখানো সমাবেশ মাত্র, পাহাড়তলী করতে পারেনি তাই এখানে করা হচ্ছে। সকলের মুখেই কেবল সেই আলোচনা সমালোচনা। মহামণ্ডলের এমনতরো মিটিং ইতিপূর্বে আর দেখিনি।

১৮/১০/৭৮ ইংরেজী। গহিরা জেতবনারামে আজ চীবর দান। কিন্তু, আশ্চর্য! সভার শুরুতে শুরু হলো মুষল ধারায় বৃষ্টি, আর বৃষ্টি। সব পণ্ডা রাতে আর্থশ্রী ভাঙে সহ কিছু যুবক ভিক্ষু আমার বিহারে চলে আসলেন। আর্থশ্রী ভাঙের সাথে সকলে অনেকগুলি সূত্রপাঠ করলেন এক আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করে। পরদিন বোধি বিহারে চীবর দানোৎসব।

২০/১০/৭৮ ইংরেজী। আমার অবস্থান স্থল গহিরা শান্তিময় বিহারে আজ কঠিন চীবর দান। বিকাল ২টায় পূর্ণ গণ জমায়েতের মধ্যে প্রথমে শুরু করলাম শান্তিময় বিহার পালিটোলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। সমস্ত পুরস্কার আমার সংঘদান সামগ্রী হলেও, দর্শক ও পুরস্কার বিজয়ীদের জন্য তা আকর্ষণীয়ই হলো বরাবরের মতো। সভায় প্রত্যেক বক্তার বক্তব্যেই ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব আলোচিত হলো। মনে হলো পুরো পরিবেশটাই প্রভাবিত করলো আমাদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটি। পরদিন চীবর দান হলো জোবরায়। জ্ঞানশ্রী ভাণ্ডে আমাকে দেখার সাথে সাথেই বলে উঠলেন- তোমার গ্রামের সকলেই তো ত্রিপিটক বিশারদ, তাদের তাই গহিরা শান্তিময় বিহারের ন্যায় ধর্ম শিক্ষার প্রয়োজন নেই। আজকে ধর্ম সভায় একটু কিছু বলবে। কেন যে মানুষ গুলো দিন দিন এমন হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না।

৩/১১/৭৮ ইংরেজী। আজ সংঘনায়ক ভাণ্ডের মির্জাপুর শান্তিধাম বিহারে চীবর দান। মধ্যাহ্ন ভোজের পর লোকানন্দ মহাস্থবির ও জ্ঞানশ্রী ভাণ্ডেদের নিয়ে ধর্মপ্রিয় ভাণ্ডে আলাপ করছিলেন। তিনি বললেন, প্রতি বছর কদলপুরে ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদ সম্মেলনে আমাদের উচিত সংঘরাজ নিকায়ের বিশিষ্ট গুণী ও পণ্ডিত ভিক্ষুদের উপাধি প্রদান ও সনদ পত্র প্রদান করা। ভাণ্ডের এই সুন্দর প্রস্তাবটি আমিও সমর্থন করলাম। অপরদিকে আজকে সকালে শুভানন্দনের শান্তি বিহারে শ্রদ্ধেয় শীলানন্দ ভাণ্ডে ধর্মাধার ভাণ্ডের অসাধারণ স্মৃতি শক্তি, সহনশীলতা, ক্ষমা গুণের পাশাপাশি আনন্দমিত্র ভাণ্ডের নৈতিক বিপর্যয়ের বিষয়ে অনেক কথা বললেন।

৩/১১/৭৮ ইংরেজী। আজকে আমার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনের সনদপত্রে ‘সুব্রত কুমার বড়ুয়ার’ স্থলে ‘প্রজ্ঞাবংশ ভিক্ষু’ নামটি প্রতিষ্ঠা লাভ করলো বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমীক সেকশনে। গহিরার মিলন বাবু এবং জোবরার ভূপতি বাবু এ দু’জন আমার এই নাম পরিবর্তনে যথেষ্ট সাহায্য করেন। তারা উভয়ে খুশি হয়ে বললেন, আমাদের ভাণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া ভিক্ষুদের মধ্যে একটি ব্যতিক্রমধর্মী উদাহরণ সৃষ্টি করলেন। এতদিন তো আমরা দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম বি,এ. এম,এ. ক্লাশে ভর্তি হতে গিয়ে ভিক্ষু-শ্রমণেরা কেবলই গৃহী নাম ধারণ করতে আসেন এখানে। আর আপনি আসলেন গৃহী নাম বাদ দিয়ে ভিক্ষু নাম গ্রহণ করতে। আমরা আপনার এই মহৎ চেতনার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। আমি বললাম আপনাদের নিকটে আমি সেই পুণ্যদানই কামনা করি।

বলতেই হয়, আমার নাম পরিবর্তনের প্রয়াস দেখে বিনাজুরী শাশান বিহারের অধ্যক্ষ ভদন্ত সংঘপাল আমাকে নিষেধ করেছিলেন। তিনি বললেন, ভবিষ্যতে কি থেকে কি হয়, তোমাকে ভুঁতে পেয়েছে বুঝি? আসলে এমন ভুঁতে পেয়েছে বলেই এই প্রজ্ঞাবংশ গৈরিক জীবনে টিকে আছে। আর তার অগ্রজ ও অনুজ সকলেই একে একে চীবর ত্যাগ করে সংসারী হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্বর বাতাসে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম পরিবর্তনের শুভকাজ সমাধার পর জোবরায় এসে জানতে পারলাম, আমার ছোট

ভাই অশোক প্রতিবেশী অনঙ্গের ছোট মেয়ের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে কোর্টে গিয়ে।

৪/১১/৭৮ ইংরেজী। গহিরা বোধি বিহারের ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি সহ গেলাম চট্রাম বৌদ্ধ বিহারের চীবর দানে। গুমানমর্দনের রণজয় বাবু তাদের বিহারের চীবর দান সভায় আমার আলোচনা শুনে এখানে বিশেষ চেষ্টার পর আমার নাম তালিকাভুক্ত করালেন কিছু বক্তব্য রাখার জন্যে। শেষ বক্তা হিসেবে আমার নাম ঘোষিত হলেও শ্রোতারা আমার বক্তব্যের বিষয় নিয়ে অনেকেই আনন্দ সন্তুষ্টি প্রকাশ করতে এলেন আমার কাছে।

৫/১১/৭৮ ইংরেজী। আজকে চীবর দান অনুষ্ঠিত হলো পশ্চিম আধারমানিক প্রিয়দর্শী ভাস্কর বিহার নিগ্রোধারামে। সকালে প্রতিষ্ঠা করা হলো ভিক্ষু সীমা, তেইশ জন ভিক্ষুর উপস্থিতিতে। মধ্যাহ্ন ভোজের পর জ্ঞানশ্রী ভাস্ক্রে, কোণাণ্যো ভাস্ক্রে এবং আমি একটি সাংঘিক বিহারে ভিক্ষুদের রেখে ধর্ম বিনয়ে শিক্ষা ও পবিত্র জীবন যাপনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কিছুক্ষণ আলাপ করলাম। পশ্চিম আধারমানিক চীবর দান শেষে গহিরার নিরঞ্জন বাবু সহ রওনা দিলাম। পথে উভয়ে ভিক্ষু জীবনের শীল বিতৃষ্ণিতা নিয়ে অনেক আলাপ করলাম। এক পর্যায়ে তিনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, মণ্ডলের ফাণ্ডে তিনি ধর্মের উন্নতি কল্পে দুই হাজার টাকা দান করবেন। আমি সাধুবাদ জানালাম।

১১/১১/৭৮ ইংরেজী। গত কয়েক দিন ধরে জ্বর ও সর্দি-কাশিতে ভুগছিলাম। গতরাত ভালো ঘুম হলো। ভোরে সুস্থ বোধ হওয়ায়- রাহুল সংকৃত্যায়নের 'মানব সমাজ' এবং জিতেন ঘোষের- 'এই লেলিনের দেশ' নামক বই দু'টি পড়তে শুরু করি। আজ মুসলমানদের কোরবান। তাই সকাল বেলা না গিয়ে বিকালে গেলাম বিনাজুরী শ্মশান বিহারের চীবর দানে। আজকে আমার বিশেষ আকর্ষণ অধ্যাপক রনজিৎ চক্রবর্তীর ভাষণ। অনেক বিলম্বে তিনি আসলেন। তাঁর ভাষণ শোনার সৌভাগ্য এই প্রথম। বক্তব্যের গভীরতা নেই কিন্তু উপস্থাপনার চমৎকারিত্ব আছে। তবে, লোকের শ্রুতি আকর্ষণের চেষ্টায় টেনে টেনে শব্দ উচ্চারণ রীতিটা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ঠেকলো আমার কাছে।

১২/১১/৭৮ ইংরেজী। শান্তিময় বিহারে আমার কক্ষে রাত ২.৩০ মিনিটে উঠলাম ঘুম থেকে। জ্ঞান সংবর ও বীর্য সংবর বিষয়ে কিছু নোট তৈরী করলাম। প্রাতঃরাশের পর গেলাম লাঠিছড়ি চুলামণি বিহারের চীবর দানে। সেখানে প্রিয়দর্শী ভাস্ক্রে শিক্ষা পরিষদের ধর্মীয় বৃত্তি সংগ্রহরত দেখে আমিও মাদল এবং তাঁর কাকা হরিমোহন বাবুকে উদ্বুদ্ধ করলাম। স্মৃতি বৃত্তি দানে তারা সম্মত হলেন। চীবর দান শেষে কর্ম ও কর্ম বিপাক নিয়ে আলোচনা করতে করতে আমি ও লোকানন্দ ভাস্ক্রে এলাম কোর্টের পাড় আমার গুরু ভাস্কর জ্যেষ্ঠ কবিরাজ রাজকিশোর বাবু হতে ঔষধ নিতে। পরদিন সকালে কবিরাজ বাবু আমাকে তাঁর পরিচর্যাধীন কোঠের পাড় শ্মশানটি দেখাতে

নিলেন। আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। এমন সুসজ্জিত শ্মশান এই প্রথম বার আমার চোখে পড়লো। শান্তিময় বিহারে এসেই শান্তি উবে গেল শ্রামণ জ্ঞানরত্ন ও হরিপদ দুই জনের মারামারির কথা শুনে। এই প্রথম উভয়কে খুব করে বেত মারলাম।

২০/১১/৭৮ ইংরেজী। সকাল ৭টায় গহিরা হতে জোবরা উপস্থিত হলে আমার চান্দগাঁ এর কাকা জ্ঞানবংশ আমার সাথে দেখা করতে বিহারে আসলেন। তিনি বললেন, আমার বড়দা না-কি কিছু ভিটের অংশ কাকুকে বিক্রি করবেন, তাই আসা। তিনি জোবরাতে চলে আসতে চাহেন। কাকুর এই ইচ্ছায় আমি খুবই খুশি হলাম। কিন্তু, অমূল্যদা কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি সরাসরি অস্বীকার করলেন। বাবাকে অনুরোধ জানালাম নতুন বাড়ীর ভিটে হতে কাকুকে কিছু দান করা হউক। কিন্তু, না-কেহই রাজি হলেন না। আমি খুবই মর্মান্বিত হলাম। মেঝদার মামলা নিয়ে এই কাকু কত শ্রম দিয়েছেন, কতবার তাদের স্নেহ আদর ভোগ করেছি চান্দগাঁও বেড়াতে গিয়ে। আর আজ সেই কাকু আর্থিক দৈন্যতার শিকার হওয়াতে এই অবস্থা। আমার বাবাকে বিশেষ অনুরোধ করায় তিনি শেষে বললেন, আমি শুধু আপনার কাকা ও কাকী মাকে শর্ত সাপেক্ষে জায়গা দান করতে পারি। তাদের মৃত্যুর পর তার অধিকার আমার সম্ভানেরা পাবে। কিন্তু অপুত্রক কাকা, পালিত সম্ভানের দিকে চেয়ে বাবার এ দান গ্রহণ করলেন না।

এ দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে সহপাঠী ফেরদৌসি বেগম থেকে জ্ঞানতে পারলাম, আমার প্রিয় ছাত্র বন্ধু আবুহাসান খান মারা গেছেন। খুবই মর্মান্বিত হলাম এই দুঃসংবাদে। আজকে আমার B.A (Hons.) এর ফাইনাল পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলো। অধিকাংশের সাথে আমিও তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলাম। এই খারাপ ফলাফলে আমার মনে বিন্দুমাত্রও দুঃখ হলো না। কারণ পূর্ব হতেই ধারণা ছিল এমনই হবে। অধিকন্তু, এতে আমার প্রব্রজ্যা জীবন রক্ষার সহায়তা ও পেলাম।

২১/১১/৭৮ ইংরেজী। গহিরা শান্তিময় বিহারে জ্ঞানশ্রী ভাঙের সাথে আলাপ করলাম ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের আগামী সম্মেলন শান্তিময় বিহারে আহ্বান করার জন্যে। বিমলজ্যোতি প্রমুখ ভিকুরা আমাদের কাজে অংশ গ্রহণ না করার কারণ অনুসন্ধান করলাম উভয়ে। মধ্যাহ্ন ভোজের পর ভাঙেকে বিহারে রেখে উভয়ের দান প্রাপ্ত সর্বমোট টাকা ৪,০০০/- চট্টগ্রাম জি,পি,ও, তে জমা দিতে গেলাম।

২২/১১/৭৮ ইংরেজী। গহিরার স্বপন (আনার) আমাকে পুনঃ পুনঃ উৎসাহিত করে নিয়ে গেল রণধীর বাবুর কাছে, পালিতে এম,এ, প্রিলিমিনারী ক্লাশে ভর্তি হওয়ার বিষয়ে আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণের জন্যে। রণধীর বাবুও উৎসাহিত করলেন। কিন্তু, আমার মন আর কিছুতেই অগ্রসর হচ্ছিল না- এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় সংশ্লিষ্ট থাকতে। স্বপন কে বললাম তুমি ভর্তি হও, আমাকে দিয়ে হবে না। সামাজিক সাংগঠনিক কাজেই আমাকে অধিক সময় দিতে হচ্ছে বিধায় বাংলার এম,এ, টা

পর্যন্ত আমি প্রাইভেট দিতে চাইছিলাম। আমি অমত করায় স্বপনও আর অগ্রসর হলো না।

২৩/১১/৭৮ ইংরেজী। গহিরা অকুর ঘোণায় তড়িৎ বাবুর বাড়ীতে সংঘদানে শীলানন্দ ভাণ্ডে এবং ধর্মপ্রিয় ভাণ্ডে আসলেন। সংঘদান শেষে উভয়ে শান্তিময় বিহারে এসে ডোমখালি গ্রামের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেন। ধর্মপ্রিয় ভাণ্ডে বললেন শাক্য বোধি ভাণ্ডের বিরোধীরা এখন পুরোপুরি প্রস্তুতি নিয়েছেন ডোমখালীতে আর একটি বিহার তৈরী করতে। আমরা সম্মতি দেয়া মাত্রই কাজ শুরু করবে। কিন্তু, এই ছোট্ট গ্রামে দু'টি বিহারের জন্ম নেয়া মানে চিরদিনের জন্যে গ্রামবাসী দুই ভাগ হয়ে যাওয়া। আমরা সকলে পরামর্শ করলাম। আমাদের দায়িত্ব দেয়া হলো বিনাজুরী গিয়ে সংঘরক্ষিত ও সুমঙ্গল ভাণ্ডের সাথে সহসা গিয়ে তাদের মাধ্যমে শাক্য বোধি মহাস্থবিরকে রাজি করতে, বিরোধী পক্ষের সাথে শেষ বারের মতো একটি শান্তি সমঝোতার বৈঠকের আয়োজন যেন করেন। প্রয়োজনে আমরাও উপস্থিত থাকবো।

২৪/১১/৭৮ ইংরেজী। গতকাল ধর্মপ্রিয় ভাণ্ডে জানালেন, সংঘরাজ ভাণ্ডের বিহারে আজকে থাইল্যান্ডের উপাসিকা রত্নারা আসবেন। আমি যেন সেখানে যাই, এবং আমাদের কিছু শিক্ষার্থী থাইল্যান্ডে পাঠানোর জন্যে রত্নার সাথে কথা বলি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ শেষে আমি দেড়টার দিকে মির্জাপুর গেলাম। সংঘরাজ ভাণ্ডে কেও অভ্যর্থনা জানালাম। কিন্তু রত্নারা আসলে, কেহই আমাকে তার সাথে কথা বলার সুযোগ দিলেন না। আসলে ব্যক্তি স্বার্থের বাইরে সাংঘিক চেতনা আমাদের সংঘনায়কের কাছে নেই বললে ও চলে।

২৫/১১/৭৮ ইংরেজী। সকালে রওনা দিলাম মধ্যম বিনাজুরী হয়ে ডোমখালী শাক্যবোধি বিরোধী গ্রুপের সংঘদান অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে। সংঘরক্ষিত ও সুমঙ্গল ভাণ্ডের সাথে গতকালের দায়িত্বটি নিয়ে আলোচনা করলাম। তাঁরা উভয়ে মত দিলেন প্রথমে ডোমখালীর বিবাদমান উভয় পক্ষের সাথে পৃথক বৈঠক করে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারলে, শাক্যবোধি ভাণ্ডেকে পরে রাজি করানো সম্ভব হবে। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সংঘদানে পৌঁছতে উৎসর্গ পর্ব শেষ হয়ে গেল। উপস্থিত হওয়া মাত্রই নির্দেশ দেয়া হলো ধর্মদেশনা করতে। ধর্মপ্রিয় ভাণ্ডেদেরকে সংঘরক্ষিত ভাণ্ডেদের পরামর্শ অবগত করানো হলো। অন্যান্য আলাপের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের কার্য নির্বাহী বৈঠক গহিরা শান্তিময় বিহারে আহ্বান করার একটি তারিখ নির্ধারিত হলো।

২৬/১১/৭৮ ইংরেজী। মধ্যাহ্ন ভোজের পর একটু বিশ্রাম, গতরাতে ঔষধ সেবনের প্রতিক্রিয়া জনিত অনিদ্রার দুর্বলতা কাটানোর জন্যে। আড়াইটায় রওনা দিলাম কোঠের পাড় রাজ কিশোর কবিরাজ হতে শুরু ভাণ্ডের ঔষধ নিয়ে আসতে। সেখানে লোকানন্দ ভাণ্ডেকে ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের আগামী বৈঠকের তারিখটা ও জানালাম।

সাড়ে ছয়টায় গহিরা ফিরে এসে সন্ধ্যায় পঞ্চানন ডাক্তার বাড়ীর দায়িত্ব সমাধার পর শয্যা গ্রহণ করলেও সারা রাত ঘুমই আসলোনা।

৫/১২/৭৮ ইংরেজী। জোবরা সুগত বিহারেই অবস্থান করছি। সকালে প্রাতঃরাশের পর ভার্টিটিতে গেলাম। ক্লাশ শেষে জোবরা সুগত বিহারের বিহার উন্ময়ন ফাণ্ডের কিছু হিসাব নিকাশ সমাধা করলাম, আমার বাবা ও জ্ঞানশ্রী ভাঙের মধ্যে। জ্ঞানশ্রী ভাঙে সহ উভয়ে হেমেন্দু বাবুর সাথে যোগাযোগ করে ভারতে গমনের বিষয়ে ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। প্রজ্ঞাতিষ্য ভিক্ষু (চাকমা) এখন জোবরা সুগত বিহারের দায়িত্বে আছে। তার মন-মানসিকতা কিছু বুঝা যাচ্ছে না। তাই চেষ্টা করলাম তার ভবিষ্যত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি জানতে। আসলে সে মুখ খোলতে নারাজ।

৮/১২/৭৮ ইংরেজী। জোবরায় আমাদের বাড়ীতে জ্ঞানশ্রী ভাঙে সহ প্রাতঃরাশ গ্রহণের পর উভয়ে প্রথমে আসলাম গহিরায় আমার বিহারে। এক বাঙাল শিক্ষা পরিষদের বিজ্ঞপ্তি নিয়ে গেলাম হিজলার সংঘদানে। সেখানে জানতে পারলাম তিন দিন আগে বিনাজুরীতে প্রেমলাল বাবুর সংঘদান অনুষ্ঠানে ভদ্র শাক্যবোধি কর্তৃক গিরিমানন্দ ভাঙেকে অপদস্থ করার ঘটনাটি। যাক শীলরক্ষিত ভাঙের সাথে শিক্ষা পরিষদের বিগত গহিরা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা শেষ করে জ্ঞানশ্রী ভাঙে সহ ফিরে আসলাম জোবরা। রাতে আমার ছোট ভাই অশোকের বিয়ে অনুষ্ঠানে সূত্রপাঠ করলাম।

৯/১২/৭৮ ইংরেজী। বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশ হচ্ছে না দেখে হাটহাজারী পুবালা ব্যাংকে গিয়ে জ্ঞানশ্রী ভাঙের প্রদত্ত দায়িত্ব সমাপ্তির পর জোবরায় গেলাম। ভাঙে সহ আন্ততঃমের বাড়ীতে মধ্যাহ্ন ভোজের পর উভয়ে গেলাম মির্জাপুর। সংঘরাজের সাথে শাক্যবোধি মহাস্থবিরের অসৌজন্য আচরণ বিষয়ে আলোচনা করে, মহাসভাকে মহোদয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। ঘটনাটি সংগঠিত হওয়ার পর গিরিমানন্দ ভাঙে মানসিক ভাবে এমন বিপর্যস্ত যে, কারো সাথে কোন কথাই বলছেন না।

১০/১২/৭৮ ইংরেজী, রবিবার। সকালে উদয়নের বাড়ীতে প্রাতঃরাশ গ্রহণের পর দ্রুত চলে আসলাম বিহারে, পাণিটোলার ছাত্রদের পড়াতে। ইদানিং দেখতে পাচ্ছি ছাত্র সংখ্যা অনেক কমে গেছে। কারণ আর কিছু নহে- আমি আগে যেভাবে সব সময় তিথি শ্রাদ্ধে শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা দানের জন্যে অভিভাবকদের বলতাম এখন তা বন্ধ করার ফলেই এই দশা। আজকে মাত্র ত্রিশ জন ছেলে মেয়ের উপস্থিতি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তবুও পূর্বের মতো, তাদেরকে দশটা পর্যন্ত শিক্ষা দিলাম।

১১/১২/৭৮ ইংরেজী। রাত ৩টায় জেগে উঠলাম। গতরাত ঘুম গেলাম মাত্র ১ ঘন্টা। রাত ২টা অবধি উপন্যাস পড়েছি শরত চন্দ্রের গৃহ দাহ। বিগত মাসকাল শরত রচনাবলী পড়তে গিয়ে এমন বিন্দ্র রজনী কত গেল হিসেব নেই। এটা আমার এক মস্ত বড় অভ্যাস, উপন্যাস বই হাতে এলে দিন রাত কেমন করে যায়, সেদিকে

খেয়াল থাকে না। মধ্যাহ্ন ভোজ বাবুলদের বাড়ীতে গ্রহণের পরে সাড়ে বারোটায় রওনা দিলাম কদলপুরের উদ্দেশ্যে রাউজান হয়ে। শীলানন্দ ভাস্কের বিহারে যাওয়ার মুখে বটতলায় ভাস্কেকে এক দোকানে পেয়ে গেলাম। ভাগ্য ভালো যে, সেই দোকানের বড়ুয়া মালিকটি বাড়বকুণ্ড মিলের মধ্যে চাকুরী করেন। আমি উভয়কে ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের প্রচার বিজ্ঞপ্তির বাঙল হাতে দিলাম- একটি নিজামপুর এলাকায় বিলির জন্যে, অপরটি রাউজান এলাকায় বিলির জন্যে। কদলপুর উপস্থিত হলাম আড়াইটায়। জ্ঞানশ্রী ভাস্কের সাথে জোবরা গ্রামের কিছু সমস্যা নিয়ে আলাপের পর সুধর্মানন্দ বিহার প্রাঙ্গণে সুপারী ও নারিকেল চারা লাগানোর কাজে লেগে গেলাম।

১২/১২/৭৮ ইংরেজী। আমার ডায়েরী লিখা সমাপ্ত করে ভোর সাড়ে চারটায় জ্ঞানশ্রী ভাস্কের সাথে তাঁর শিষ্য সংঘের গতকালের আচরণ নিয়ে কিছু কথা বললাম। বাগানের কাজে এই শ্রমণ ও সেবকদের অনীহা শুধু নহে বিহারের সামগ্রিক দায়িত্ব পালনেও তাদের উদাসীনতার ছাপ সর্বত্র। ভাস্কে তাদের সবাইকে আমার সামনে আসতে নির্দেশ দিলেন। আমি তাদের কাজ কর্মের ক্রটি বিচ্যুতি গুলো দেখিয়ে দিয়ে সরাসরি কিছু কথা বললাম। দেখা গেল এতেও তাদের তেমন কোন প্রতিক্রিয়া নেই। এক অস্বাভাবিক নির্লিপ্ত উদাসীনতা তাদের মনকে যেন পাথর চাপার মতো আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমি ভাস্কেকে বললাম- এই ছেলেদের নষ্ট করছি আমরাই। সারাক্ষণ যদি দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে কাটাই, তাদের ভালো মন্দের প্রতি নজর দেয়ার অবসর কোথায়? ভাস্কে, আপনার এখন উচিত, কোন একটি বিহারে সারাক্ষণ অবস্থান করা। আর এই ছেলেদের শিক্ষা ও স্বভাব চরিত্র গঠন করা। আমাদের সমস্ত শ্রম এদেরকে মানুষ করার জন্যেই। আর আমাদের যত্নের অভাবে তারাই যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে রাত-দিন এত দৌড়-ঝাঁপ, এত শ্রম, এত চিন্তা-ভাবনার সার্থকতা কোথায়? আমাদের একজনকে অন্তত সমস্ত সামাজিক সাংঘিক ও সাংগঠনিক দায়-দায়িত্ব বর্জন করতে হবে। তা-না হলে সব শ্রমই ব্যর্থ হবে। ভাস্কে মন্তব্য করলেন- সবক্ষেত্রে তো আছি দু'জনই মাত্র। মহামণ্ডল বলো, ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদ বলো- দু'জনে ঝাঁপিয়ে না পড়লে কেহই তো স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে দায়িত্ব নেয় না। উপায় কি? সকাল ৯টায় উভয়ে কদলপুর হতে রওনা দিলাম রাজ্যমাটির বরকলের উদ্দেশ্যে। সন্ধ্যার একটু আগে গিয়ে পৌঁছলাম লতিবাঁশ ছড়ায়। রাতে রাজ্যমাটি মৈত্রী বিহারের বিমলবংশ ভাস্কের সাথে আলাপ হলো অনেক্ষণ।

১৪/১২/৭৮ ইংরেজী। ভোর সাড়ে চারটায় বরকলের লতিবাঁশ ছড়া বুদ্ধ মন্দিরে শ্রদ্ধেয় গিরিমানন্দ ভাস্কে, জ্ঞানশ্রী ভাস্কে এবং বিমলবংশ ভাস্কে সহ আমি বসলাম আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে। সমতল ও পার্বত্য ভিক্ষু সংঘের ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচির উপরেই নির্ভর করবে এদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় গুলোর মধ্যে সামাজিক নৈকট্য ও সহমর্মিতা- এই মন্তব্য করলাম আমি। বললাম

পার্বত্য অনেক ভিক্ষু-শ্রমণ আমাদের সান্নিধ্যে সমতলে থাকছে, কেবল মাত্র স্কুল কলেজে পড়ার জন্যে। আর আমরা ও শুধু সেই সহযোগীতা-ই তাদের দিয়ে চলেছি। কিন্তু, সাথে সাথে যেটা ছিল প্রধান দায়িত্ব পারম্পরিক ঐক্য বন্ধনের চেতনা বোধ, সেটা জাহত করার দায়িত্ব পালন করছি কৈ? আর সে কারণেই- আমাদের সান্নিধ্যে গড়ে উঠা কোন পার্বত্য ভিক্ষু স্ব স্থানে ফিরে এসে পার্বত্য ও সমতলের মধ্যে ঐক্য বন্ধন গড়ে তোলার ডাক দেননি। তাই আমাদের উচিত একটি সাংখ্যিক বিহারে সমতল ও পার্বত্য ভিক্ষু শ্রমণদেবকে একই নীতি আদর্শে উপযুক্ত ভিক্ষু হিসেবে গড়ে তোলা।

প্রাতঃরাশ সমাপ্তির পর সকাল ৭টায় আমরা রান্নামাটির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সাড়ে এগারোটায় পৌঁছে বিনাজুরীর সরোজ দজীর বাসায়, সাথে আনা মধ্যাহ্ন ভোজ গ্রহণ করলাম। তারপর রান্নামাটি হাসপাতালে উ জবনা মহাস্থবিরকে দেখতে গেলাম। বেলা ১টায় বাসে করে রওনা দিয়ে সাড়ে তিনটায় আমি নেমে গেলাম মঘাশালী। পথে গিরিমানন্দ ভাণ্ডের সাথে শাক্যবোধি মহাস্থবিরের বিষয়ে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ সহ নানা সাংগঠনিক বিষয়ে অনেক কথা বার্তা হলো।

১৫/১২/৭৮ ইংরেজী। সকাল থেকে এগারোটো পর্যন্ত চীবর সেলাই ও রং এর কাজে চলে গেল। কৃষ্ণ জীবন বাবুর বাড়ীতে মধ্যাহ্ন ভোজের পর প্রফুল্ল বাবুর সাথে ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের কার্যক্রম নিয়ে কিছু কথা হলো। বিকালে গহিরা কলেজে ভর্তি ইচ্ছুক কিছু চাকমা ছাত্র, আমার সাথে দেখা করতে আসলো। তাদের সাথে পার্বত্য ও সমতল বৌদ্ধদের সম্পর্কে গভীর আত্মীয়তার ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে শিক্ষিত ভিক্ষু ও যুবকদের এগিয়ে আসার জন্যে অনুপ্রাণিত করি। এদেশে সংখ্যালঘু মুষ্টিমেয় বৌদ্ধরা নিজেদের ভৌগলিক ও সংস্কৃতিগত সীমাবদ্ধতাকে প্রাধান্য না দিয়ে, ধর্মীয় চেতনার আলোকে যদি ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে না পারি, তা-হলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বাধ্য।

১৬/১২/৭৮ ইংরেজী। বিকেল বেলার দিকে শ্রমণ বোধিপাল সহ আমার গুরুদেব (প্রজ্ঞাজ্যোতি থেরো) আসলেন শান্তিময় বিহারে। আমি পানীয় দিয়ে উভয়কে আপ্যায়ন করলাম। ভাঙে বন্দনার সময় লক্ষ্য করলাম তাঁর নিকট একটি সোয়েটার ছাড়া অন্য কোন শীত বস্ত্র নেই। আমি অতি শ্রদ্ধা ভরে আমার পশমের শালটা ভাঙে দান করলাম। ভাঙে আমাকে বললেন, তাঁর সাথে গিয়ে রামকোটে অবস্থান করে ধ্যান-ভাবনা শুরু করতে, এবং ভাঙেও ধ্যানের সুযোগ দিতে। বর্তমানে আমি যে সকল কাজে ডুবে আছি, যে সকল ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে চলছি, ভাঙের এই প্রস্তাব কিছুতেই গ্রহণ করতে পারলাম না। তাই ভাঙে পরামর্শ দিলাম- আগে তিনি একাচারী হয়ে গভীর ধ্যানে আত্ম নিয়োগ করেছেন দেখলেই আমি সিদ্ধান্ত নেব যে, আমার বর্তমান সব কিছু বাদ দিয়ে তাঁর সাথে অবস্থান করার।

১৭/১২/৭৮ ইংরেজী। সকাল বেলা পালিটোলের ছাত্রদের শিক্ষাদান সময়ে জোবরা হতে বাবু খগেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দি আসলেন। তিনি তাঁর ছোট বোনের স্বামী পরেশকে নিয়ে কৃষ্ণজীবন বাবুদের সাথে সৃষ্ট সমস্যা, খুবই দুঃখের সাথে আমাকে জানালেন। মধ্যাহ্ন ভোজের পর বেলা ১টায় গুরু ভাঙে ও বোধিপাল শ্রমণ সহ প্রাক্তনের ঘাসের উপর বসে, ভারতে ভদন্ত আনন্দমিত্র ও অন্যান্য ভিক্ষুদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচার নিয়ে তাঁরা অনেক প্রকার মন্তব্য করলেন। সন্ধ্যায় বোধিপাল ও সমীরের মধ্যে বিতর্ক শুরু হলো ভারতীয় ভিক্ষুদের মধ্যে যারা নিজেদের সাধক, অরহত, এসব বলে, তাদের প্রকৃত স্বভাব চরিত্র নিয়ে। সমীর দীর্ঘকাল পশ্চিম বঙ্গের শিলিগুড়ীতে ছিল, তাই অনেক কিছুই সে প্রত্যক্ষদর্শী ও বটে। আমি ও জ্ঞানশ্রী ভাঙে গহিরা জেতবন এবং সুরঙ্গা বন বিহারের সমস্যা নিয়ে কিছুক্ষণ আলাপ করলাম। ইতিমধ্যে শান্তিময় বিহার কমিটি, আমরা বিহার আবাসিকদের দৈনন্দিন খরচ নিয়ে আলোচনা বৈঠক করে, আমাকে চলতি বছরের বাদবাকী মাসগুলোর জন্যে আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানাতে আসলেন। জ্ঞানশ্রী ভাঙের সম্মতি ক্রমে পুনঃ আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

১৮/১২/৭৮ ইংরেজী, সোমবার। ভোর ৪টায় উঠে, ডায়েরী লিখলাম। জ্ঞানশ্রী ভাঙে র সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করলাম। প্রাতঃরাশের পর প্রাক্তনের রোদে বসে আলাপ করার সময়ে নিরঞ্জন বাবুর সাথে তাঁর প্রতিশ্রুত দান ২,০০০/- টাকা বিষয়ে জ্ঞানশ্রী ভাঙে আলাপ করলেন। মধ্যাহ্ন ভোজের পর আমার গুরু ভাঙেকে বাসে তুলে দিয়ে এসে, জ্ঞানশ্রী ভাঙের সাথে আমার ১৯৭৮ ইংরেজীর সঞ্চয়ের হিসাব সমাপ্ত করলাম।

[বিঃদ্রঃ পাঠক, আমার জীবন দৃষ্টির মৌলিক পরিবর্তনকারী গুরুদেব ১৬/১২/৭৮ ইংরেজী তারিখে এসেছিলেন আমাকে পুনঃ রামকোটে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। আমি বি,এ অনার্স তখন পাশ করেছি, এম,এ, ফাইনালে ভর্তি হয়েছি। জ্ঞানশ্রী মহাস্থবিরের সাথে সমাজ কর্মে আকর্ষণ নিমজ্জিত আছি। গুরুদেব সব কিছুই খবর রাখেন। তিনি আমাকে বললেন, এই জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির তোমাকে একদিন ডুবাবে, শেষ করবে। গুরুদেবের আধ্যাত্মিক সান্নিধ্য সব সময় কামনা করতাম। কিন্তু, রামকোটের মতো বৈরী পরিবেশ, ভাঙের কথায়ও কাজে অসংলগ্নতা আমার মনে এক সম্পূর্ণ বিরূপ ভাব স্থায়ী বাসা গড়েছিল। আর তার বিপরীতে জ্ঞানশ্রী মহাস্থবিরের সমাজ হিতৈষী চেতনা, কথায় ও আচরণে সামঞ্জস্যতা, আমাকে আকর্ষণ করে রেখেছিল সম্পূর্ণ ভাবে। ফলে, গুরুদেব কি গভীর হতাশা ও মর্মবেদনা নিয়ে ১৮/১২/৭৮ ইংরেজী আমার নিকট থেকে বিদায় নিয়েছিলেন- তা আমি অনুভব করতে পেরেছি কি-না ডায়েরীর পৃষ্ঠায় উল্লেখ নেই। আজ ১৯৯৭ ইংরেজীর ১৭ই মে শনিবার পার্বত্য চট্টগ্রামের গভীর অরণ্য সারোয়াতলী রিজার্ভ এ বেলা সাড়ে দশটায় ৭৮ ইংরেজীর ডায়েরীর এই পৃষ্ঠাগুলো উল্টাতে গিয়ে আমার মনের অবস্থা এমন হয়ে গেল যে, এই আত্মজীবনী লিখতে মোটেই ইচ্ছা হচ্ছিল না। মনের পর্দায় পুনঃ পুনঃ ভেসে উঠছে

গুরুদেবের দুঃখ ভারাক্রান্ত বিদায়ের দৃশ্য। চোখের পাতা বার বার ভারী হয়ে আসছে অনুশোচনার অশ্রুতে। তারপরও আমার মনের একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না এখনো- আমার জীবনটা কেমন হতো, এই গুরুদেবের ইচ্ছানুবর্তী হয়ে চলতে গেলো? ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাহুবিরের স্বপ্ন স্বাদ পূরণে তাঁর আজীবন দাসানুদাস হয়ে ভিক্ষু জীবনের স্বর্ণালী চক্ৰশিটি বছরের পুরস্কার হিসেবে তার নিকট থেকে যে অবিশ্বাস, বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার শিকার হলাম, তাতে আমার আজ স্বেচ্ছায় বনবাস হল, সমাজ অনেক পার্থিব সম্পদ লাভ করলো। কিন্তু, আমার গুরুদেবের সান্নিধ্যে আমার কি হতো? পাঠক, আমার বর্তমান অবস্থার কথা ১৯৯৪ ইংরেজীর ৮ই অক্টোবর এর লেখার সাথে যুক্ত হচ্ছে। বর্তমান লেখা আগের লেখাগুলোতে বিবৃত হয়েছে আমার গুরুদেব ও ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাহুবিরের সান্নিধ্যে আমার জীবনে পরবর্তীতে কি কি ঘটেছে। উক্ত ঘটনা গুলোর সার সংক্ষেপ করলে এই দাঁড়ায় আমার গুরুদেবের সান্নিধ্যে আমি নিশ্চয় বর্তমান বয়সে একজন শাস্ত্র অভিজ্ঞ অথবা ধ্যান অভিজ্ঞ প্রচারক ভিক্ষু হতে পারতাম, এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজের একটি স্থান করে নিতে পারতাম। ভদন্ত জ্ঞানশ্রীর সান্নিধ্যের ফল, আমার গুরুদেবের উজ্জিক্ত এক পর্যায়ে সত্যে পরিণত করেছে- ‘এই জ্ঞানশ্রীর মহাহুবির তোমাকে একদিন ডুবাবে, শেষ করবে’। মহাহুবির মহোদয় আমাকে সামাজিক ভাবে ডুবিয়েছেন, কিন্তু ধর্মের প্রভাবে মারতে পারেন নি। পূজ্য বনভাণ্ডের প্রেরণায় আমি এখনো বেঁচে আছি, প্রাণে মরিনি। কিন্তু, গুরুদেব সেদিন আমাকে রামকোটে নিয়ে নিতে পারলে আমার জীবন হতো ভীষণ অনিশ্চিতের মুখোমুখি। তিনি শ্রীলংকায় পাঠানোর নিশ্চয়তা দিলে- খুব সম্ভব ১৬/১২/৭৮ ইংরেজীতে আমাকে সাথে নিয়েই গমণ করতে পারতেন।

১৯/১২/৭৮ ইংরেজী। প্রাতঃরাশের পর ধম্মপদ অর্থকথার অল্পমাদ বর্ণ পড়ছিলাম। এ সময় নিরঞ্জন বাবু মহামণ্ডলের কেলগারের জন্যে তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতির টাকা ১,৬৫০/- টি এনে দিলেন। ৯.৪৫মিঃ সময়ে জ্ঞানশ্রী ভাঙে সহ গেলাম গহিরা দক্ষিণ পাড়া সংঘদানে। সেখানে শাস্ত্রপদ ভাঙে মহাসভার কিছু ফরম আমার হাতে দিলেন। দেখলাম প্রতিটি বিহারের আওতায় কি পরিমাণ বৌদ্ধ জনবসতি আছে তার একটি পরিসংখ্যান মহাসভার পক্ষ হতে নেয়া হয়েছে। এমন একটি সুন্দর উদ্যোগকে আন্তরিক ভাবে সাধুবাদ জানালাম। অপরাহ্নে বিহারে ফিরে এসে আমরা উভয়ে মীরের খিলের আনন্দ, শ্রমণ পূর্ণজ্যোতি, ও ডাঃ পঞ্চানন শ্রমণের সাথে আমাদের ফাণ্ডের বর্তমান স্থিতি নিয়ে আলোচনা করলাম। তাদেরকেও আমাদের আদর্শ উদ্দেশ্যের সাথে একাত্ম হওয়ার আহ্বান জানালাম। ভিক্ষু আনন্দকে অনেক দিন হতে বলার পর ও বিশেষ কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

২০/১২/৭৮ ইংরেজী। রাত সাড়ে তিনটায় ঘুম থেকে উঠে গতকালের ডায়েরী লিখার পর আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ে মনযোগী হতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু, শ্রদ্ধেয় জ্ঞানশ্রী ভাঙের নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিশেষ অগ্রসর হওয়া গেল না। আমার

বর্তমান পরিস্থিতি আসলে এসব লেখা পড়ার পক্ষে তো মোটেই অনুকূল নহে। অগত্যা বই বন্ধ করে লেগে গেলাম সংলাপে। কথা প্রসঙ্গে ভিক্ষু বিমলানন্দ কর্তৃক আমার বই চুরির বিষয় এসে পড়ায় আমি এই চরিত্রের আরো অন্যান্য ভিক্ষুদের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠলাম। এক পর্যায়ে জ্ঞানশ্রী ভাঙে বললেন, পরের সমালোচনার চেয়ে আত্ম সমালোচনাই উত্তম- ইহাই বুদ্ধের উপদেশ। আমি আত্ম সম্বন্ধে ফিরে পেয়ে লজ্জিত হলাম। মনে মনে ভাঙতে সাধুবাদ জানালাম।

প্রাতঃরাশ গ্রহণের পর জ্ঞানশ্রী ভাঙে সহ বসে আমাদের সম্বন্ধের বাদবাকী হিসাব সমাপ্ত করে টাকা ২,০০০/- GPO- তে জমাদেয়া এবং টাকা ৫০০/- শাক্যবাবুকে জোবরার জমি জরীপ সংক্রান্ত কাজে দেয়া সাব্যস্ত হলো। মধ্যাহ্ন ভোজের পর আমি কিছুক্ষণ ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর রচনাবলী পড়লাম, কিছুক্ষণ ছেড়া লেপ তোষক গুলো সেলাই করে, পুরো অপরাহ্ন গত করলাম।

২১/১২/৭৮ ইংরেজী। রাত ২টায় ঘুম থেকে উঠে ক্লাশের পাঠ্য নিয়ে কিছু সময় গত করলাম। প্রাতঃরাশের পর গেলাম বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে জোবরায়। সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজের পর জ্ঞানশ্রী ভাঙেও আমি একসাথে বের হলাম। তিনি যাবেন বিনাজুরী, আমি গহিরায়। পথে ভাঙে বললেন, খগেন্দ্র মুৎসুদ্দি বলেছেন বর্তমান তাঁত ঘরটি (জ্ঞানশ্রী ভাঙের জমিতে) জোবরা পত্নী উন্নয়ন সমিতির অফিস ঘর হিসেবেই ব্যবহার করা হউক। ভাঙে তাদের এই প্রস্তাবের বিরোধী।

২২/১২/৭৮ ইংরেজী। রাত ২টায় ঘুম থেকে উঠে রুটিন মতে কাজ শুরু হলো। বিদ্যাসাগরের জীবন চরিত অধ্যয়ন চললো মধ্যাহ্ন ভোজের আমন্ত্রণে যাওয়ার আগ পর্যন্ত। বিকেল ২টায় উপস্থিত হলাম ফতেনগর। ভদ্র জ্ঞানশ্রী মহাহুঁবির এবং সুমঙ্গল ভাঙে ও প্রায় একই সময়ে উপস্থিত হলেন। শ্রদ্ধেয় সারানন্দ ভাঙের চোখের চিকিৎসার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতেই আমাদের আগমন। সিদ্ধান্ত হলো, তিনি আমার সাথে শান্তিময় বিহারে যাবেন, সেখান থেকে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করা হবে। সুমঙ্গল ভাঙেকে ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের রসিদ বই ছাপানোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি সরাসরি বলে দিলেন সম্পাদক হিসেবে কোথাও আর তাঁর নাম ব্যবহার না করতে। আসলে জোর করে আর কত ধরে রাখা যায়?

২৩/১২/৭৮ ইংরেজী। ফতেনগর শান্তিনিকেতন বিহারে রাত ২টায় ঘুম থেকে উঠলাম। যথারীতি আমার বিশ্ববিদ্যালয় পাঠক্রম অধ্যয়ন করলাম- বিদ্যাসাগরের উপর। তারপর জ্ঞানশ্রী ভাঙে, ধর্মজ্যোতি (জোবরার যামিনী), পঞ্চানন এবং প্রজ্ঞাতিষ্য (চাকমা) সম্পর্কে কিছু বিষয় আলোচনা করলেন। মেন্তানন্দ কে (আনুদ্বাপুর) বেতাগী বনাশ্রমে রাখার বিষয়েও আমার মতামত যাচাই করলেন। আগামী শনিবার ও রবিবারের জন্যে উভয়ে যৌথ কর্মসূচি নির্ধারণ করলাম। সকাল ৮টায় জ্ঞানশ্রী ভাঙে ও সারানন্দ ভাঙেকে রিক্সাযোগে এবং আমি পায়ে হেঁটে ফতেনগর হতে গহিরা শান্তিময় বিহারে উপস্থিত হলাম। সারানন্দ ভাঙের থাকার

কক্ষটি ঝাড়-মোচ করে, স্নানান্তে আমিও জ্ঞানশ্রী ভাঙে মধ্যাহ্ন ভোজে ধনীরাম বাবু বাড়ীতে গেলাম। ভাঙে ধর্মদেশনা প্রসঙ্গে বার্মা ও শ্রীলংকায় গৃহীরা কিভাবে বুদ্ধ শাসন রক্ষায় ত্যাগ স্বীকার করে যাচ্ছেন তার ব্যাখ্যা দিলে- ধনীরাম বাবুর স্ত্রী স্মৃতিময়ী আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদে স্মৃতি বৃষ্টি দানের ক্ষীণ আশ্বাস প্রদান করলেন। আজকে সারানন্দ ভাঙে প্রতিশ্রুতি দিলেন বিশ্ববিদ্যালয় বুদ্ধ মন্দিরের জমি ক্রয়ে তিন হাজার টাকা, এবং ভিক্ষু শিক্ষা কেন্দ্রের জন্যে দশ হাজার টাকা তিনি দান করবেন।

২৪/১২/৭৮ ইংরেজী। রাত ২টায় ঘুম থেকে উঠলাম। ক্লাশের পাঠ্য 'বিদ্যাসাগর চরিত' পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু, জ্ঞানশ্রী ভাঙে, আগামীতে চন্দনাইশের জোয়ারায় মহাসভার বার্ষিক সম্মেলনে আমার উদ্বোধনী ভাষণে কি কি বিষয় আলোচিত হওয়া উচিত এ প্রসঙ্গের অবতারণায়, পাঠ বন্ধ হলো। তিনি বললেন তোমার বক্তব্যে আমাদের অতীত ও বর্তমানের ভিক্ষুদের মধ্যে গৌরবময় অবদান যাদের আছে এবং সামগ্রিক ভাবে সংরাজ নিকায়ের অবদান তুলে ধরতে হবে। এই আলোকে বর্তমান ভিক্ষুদের দায়িত্ব কর্তব্যের উল্লেখ থাকতে হবে। সকাল ৬টায় আমরা উভয়ে চিৎমরম রওনা দিলাম গহিরার প্রব্রজ্যার্থী অশোক ও বিপুলকে নিয়ে। যাত্রা পথে আমি বিদ্যাসাগর চরিত এবং ভাঙে ধর্মপদ গ্রন্থদ্বয় পাঠ করতে করতে গেলাম। মাঝে মাঝে উভয়ে আলোচনা ও চললো।

চিৎমরমে প্রব্রজ্যানুষ্ঠান চলাকালে বড়ুয়ারা এমন কথা বলাবলি শুরু করলো যে, বিহারের অধ্যক্ষ ভাঙে তাতে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে গেলেন। লেখা পড়া, আদব-কায়দায় পার্বত্যবাসীরা উন্নত, না বড়ুয়ারা? আমার মতে পার্বত্যবাসীরাই উন্নত। তাই তারা সংযত। অসংযমতাই হলো অসভ্য মূর্খতার পরিচায়ক। আসার পথে জ্ঞানশ্রী ভাঙে পাহাড়তলীতে নেমে গেলেন। আমি আসলাম নিজ বিহারে। সন্ধ্যায় নতুন শ্রামণদেরকে প্রব্রজ্যিত জীবনের উপকারীতা এবং তাদের দৈনিক চর্চা সম্পর্কে উপদেশ দিলাম।

২৫/১২/৭৮ ইংরেজী। ভোর ৪টা হতে ৫.৩০মিঃ পর্যন্ত আমার পাঠ্য বিষয় অধ্যয়নের পর ডায়েরী লিখলাম। মধ্যাহ্ন ভোজের জন্যে গেলাম সন্তার ঘাট নতুন শ্রামণদের নিয়ে। সেখানে মাথের নিকায়ের ভিক্ষু ও দায়কগণের উপস্থিতিতে নির্মল বাবু সংঘরাজ নিকায় মাথের নিকায় বিভক্তির কারণ জানতে চাইলে, এ প্রসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্নের দায়িত্ব দিলাম। সন্ধ্যায় শান্তিময় বিহারে সারানন্দ ভাঙে, শীলাচার শাস্ত্রী প্রণীত- 'মহাযান বুদ্ধ ধর্ম ও দর্শন' নামক বইটির কিছু অংশ পাঠ করে শোনাতে বললে, কয়েকটি বিষয় শোনালাম। নতুন প্রব্রজ্যিত ভিক্ষু ও শ্রমণেরা আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের উৎপত্তি এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চাইলে, তাদেরকে সে প্রসঙ্গে কিছু বলা হলো। প্রশান্তের বাবা জ্ঞান বাবু কথা প্রসঙ্গে শান্তিময় বিহারের চৌহদ্দিতে যে সকল অংশীদার আছে তাদের বিষয়ে কিছু কথা বললেন।

২৬/১২/৭৮ ইংরেজী। আজ রাত তিনটায় ঘুম থেকে উঠে পাঠ্য বই পড়লাম। কিছুক্ষণ মহাসভার জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ফরম পূরণ করলাম। দিনের ১১টায় জ্ঞানশ্রী ভাণ্ডে সহ এক সংঘদানে অংশ গ্রহণের পর নতুন প্রব্রজ্যিতদের সাথে ফটো তোলা এবং সারানন্দ ভাণ্ডের জন্য রাউজান হাইস্কুলে লায়ল ক্লাবের চক্ষু শিবিরে যোগাযোগ করলাম, থানা নির্বাহী অফিসারের সেক্রেটারী বিভূতি বড়ুয়ার মাধ্যমে। রাউজান থেকে আসার পর জ্ঞানশ্রী ভাণ্ডে সহ গেলাম মির্জাপুরে শৈলেশ বাবুর সাথে আমাদের GPO Fixed Deposit সংক্রান্ত আলোচনার জন্যে। সেখানে সংঘনায়ক ভাণ্ডের বিহারে রাতে শৈলেশ বাবু, ডাঃ অনিল বাবু এবং প্রশান্ত চৌধুরীদের সাথে সংঘ ও সমাজ নিয়ে অনেক মূল্যবান আলোচনা হলো।

২৭/১২/৭৮ ইংরেজী। মির্জাপুরে ভোর ৪টায় ঘুম থেকে উঠে ডায়েরী লিখি। তারপরে জ্ঞানশ্রী ভাণ্ডের সাথে গহিরা শান্তিময় বিহারের দায়ক উষাকান্তির ভাই সময়ের প্রব্রজ্যার ইচ্ছা নিয়ে আলাপ হয়। ছেলেটি সমীর ও ধর্মপ্রিয়ের প্রভাবে মার্ক্সবাদী হওয়ার চেয়ে প্রব্রজ্যা নিয়ে বুদ্ধবাদী হলে বহুগুণে উত্তম হবে, আমি এই মত প্রকাশ করি। এই আলোচনার পরে সংঘনায়ক ভাণ্ডের সাথে বাংলাদেশে ভিক্ষু সংখ্যার দ্রুত নিম্নগামিতা বিষয়ে কিছু আলাপ হয়। কিভাবে ভিক্ষুর সংখ্যা বাড়ানো যায় এই প্রশ্নের সমাধানে আমাদের পরিকল্পিত ভিক্ষু শিক্ষা কেন্দ্রের তিনি সমর্থন করেন। প্রাতঃ বন্দনার পর আমরা প্রাতঃরাশ গ্রহণে বসলাম। সংঘনায়ক ভাণ্ডে অতি স্নেহ ভরে নিজের হাতেই আমাকে ভাত-তরকারী তুলে দিয়ে তৃপ্তি সহকারে খাওয়ালেন। আসলে তিনি একজন হৃদয়বান ব্যক্তি।

প্রাতঃরাশের পর মির্জাপুর হতে বিশ্ববিদ্যালয় জনতা ব্যাংক হতে ১,০০০/- টাকা নিলেন জ্ঞানশ্রী ভাণ্ডে Fixed deposit করার জন্যে। জোবরায় অরবিন্দুর বাপের সাথে অনীল বড়ুয়ার জমি ক্রয় সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনে আলোচনা করলেন। বিকেল ২টায় জোবরা হতে হাটহাজারী পর্যন্ত হেঁটে এসে রাউজানের বাসে উঠলাম দু'জনে। পথে উভয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম আমার বাবাকে পারিবারিক সম্পর্ক মুক্ত করা, সারানন্দ ভাণ্ডেকে আগামীকাল আমি রাউজান চক্ষু শিবিরে নিয়ে যাওয়া। তিনি সুরঙ্গা হতে সেখানে আসবেন। বিহারে এসে দেখলাম সুভোতিরত্ন শবদাহের চাঁদা সংগ্রহে এক শ্রমণ উপস্থিত।

২৮/১২/৭৮ ইংরেজী। রাত ৩টা ৩০মিনিটে ঘুম থেকে উঠলাম। পাঠ্য বিষয় অধ্যয়ন করলাম ৬টা পর্যন্ত।

সকাল ৮টায় সারানন্দ ভাণ্ডেকে নিয়ে রাউজান চক্ষু শিবিরে গেলাম। সেখানে ভর্তি ও চোখ অপারেশনের যাবতীয় ব্যবস্থা করে মধ্যাহ্ন ভোজের আমন্ত্রণ রক্ষায় আসলাম গহিরায় মনুদের বাড়ী। ভোজনাশ্তে সচরাচর নিয়মে ভুক্তানুমোদন করতে গিয়ে আত্ম সংশোধনের উপায়ে সম্পর্কে বুদ্ধমত কি তার ব্যাখ্যা দিলাম।

অপরূহে কৃষ্ণজীবন বড়য়াকে ডেকে তার ছেলেরা ক্রমান্বয়ে বিহার ও বিহার বাসী ভিক্ষু- শ্রামণদের উপর যে ভাবে অনাচার ও অভদ্র ব্যবহার শুরু করেছে, তার কারণ জানতে চাইলাম। আসলে এই ব্যক্তি নিজেও ধর্মকে ব্যবসা ভিত্তিক দৃষ্টিতেই দেখে থাকেন। বাল্যকাল থেকে তার জ্যেষ্ঠা ভিক্ষু বরজ্ঞান মহাস্থবিরের সাথে সেবক হিসেবে সারা মুল্লকের ভিক্ষুদের সহজ সান্নিধ্যে বড়ো হলেও, প্রকৃত শ্রদ্ধাও ধর্মজ্ঞানের যথেষ্ট অভাব বিদ্যমান আছে। তা-না হলে, আমার ভিক্ষে করা অনু সেবক ছেলেটি বিকালে খাওয়ার জন্যে রাখল, আর তিনি পাতিল উল্টায়ে দেখার মতো ছোট কাজ করতে পারলেন কি করে? সেই পিতার সম্ভান বিহারের হলঘরে দিয়ে সেগুলে পায়ে যেতে পারে, ভিক্ষু শ্রমণের উপর দুর্ব্যবহার করতে তো পারবেই। বিকেল ৩টায় শাক্যের পিতার মৃতদেহ সংকার অনুষ্ঠান শেষে, আমি সারানন্দ ভণ্ডের জন্যে বিছানাপত্র নিয়ে যেইমাত্র রাস্তামাটি রোডে মঘাশাস্ত্রী বটতলায় গেলাম, অমনি বাস থেকে শান্তবাবুর কন্যার স্বামী শাক্য বাবু নামলেন। তিনি এসেছেন আমার গুরুভণ্ডের পাসপোর্ট সংক্রান্ত সমস্যার বিষয় জানাতে। আমি তাঁকে জ্ঞানশ্রী ভণ্ডে প্রদত্ত কদলপুর বিহার জমির জরীপে বিষয়ক টাকা ৫০০/- প্রদান করলাম। সাড়ে ছয়টায় রাউজান পৌঁছে সারানন্দ ভণ্ডের সেবায় হরিপদকে রেখে, রাত ৮টায় ফিরে এলাম বিহারে। জ্ঞানশ্রী ভণ্ডেকে খুবই দুঃখের সাথে জানালাম, এই কৃষ্ণজীবন এবং তার ছেলেদের ক্রমবর্ধমান অশান্তি সৃষ্টির প্রয়াস সম্পর্কে।

২৯/১২/৭৮ইং রাত ৩টায় উঠে মহাসভা প্রদত্ত দায়িত্ব সমাপ্তির জন্যে ফরম পূরণের কাজে লেগে গেলাম। প্রাতঃরাশ আমন্ত্রণে গিয়ে দাতাদের দেশনা করলাম, বুদ্ধ শিক্ষার আলোকে একজন ব্যক্তির সংখ্যম সাধনা কিভাবে বহুজনের হিত ও কল্যাণের সাথে সাথে আত্ম-সুখ, আত্ম-শান্তির কারণ হয়। ৯.৪০মিঃ এ সারানন্দ ভণ্ডে এবং সেবক হরিপদের জন্যে মধ্যাহ্ন ভোজ নিয়ে জ্ঞানশ্রী ভণ্ডে সহ গেলাম রাউজানে। সেখান থেকে উভয়ে মধ্যাহ্ন ভোজ আমন্ত্রণে উপস্থিত হলাম ইদিলপুর গ্রামে। আজকে আমার পক্ষ হতে যৌথ তহবিলে জমা দিলাম টাকা ৪,০০০/-।

৩০/১২/৭৮ইং ঘুম থেকে উঠলাম ২-৩০মিঃ এ। ভোর ৫টায় পর্যন্ত পাঠ্য বিষয় অধ্যয়ন করলাম। প্রাতঃরাশের পর হরিপদ ও সারানন্দ ভণ্ডের টিফিন নিয়ে গেলাম রাউজান চক্ষু শিবিরে। তাদের খাওয়ানোর পর ৮টায় ফিরে আসলাম গহিরায়। বিহারে প্রবেশের মুখেই দেখলাম জ্ঞানশ্রী ভণ্ডে জোবরার উদ্দেশ্যে বের হচ্ছেন। আর বিহারে না ঢুকে আমিও সাথে পুনঃ রওনা দিলাম। সকাল ৯টায় জোবরা পৌঁছে সামান্য বিশ্রামের পর স্নান করে সাড়ে দশটায় অরবিন্দুদের বাড়ীতে মধ্যাহ্ন ভোজ গ্রহণ করলাম। ১১.৩০ এ রওনা দিলাম শহরে উভয়ে। ১.৩০মিঃ এ GPO তে পৌঁছে টাকাগুলো জমা দিলাম। এ কাজ সারতে লেগে গেল ৩টা পর্যন্ত। সেখানে বৌদ্ধ কর্মচারীদেরকে বিলি করলাম আমাদের আগামী ধর্মবৃত্তি প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীদের নাম- তালিকাগুলো। GPO এর কাজ সমাধা করে হরিপদের জন্যে পেট শার্ট ক্রয়

করলাম, এবং সেগুলো নিয়ে রাউজানে পৌঁছলাম বিকালে ৫টায়। সারানন্দ ভাস্কের প্রয়োজনীয় খোঁজ-খবর নিয়ে সেখান থেকে লাঠিছড়ি হয়ে গেলাম আব্দুদ্বাপুর পায়ে হেঁটে। রাত ৭.৩০মিঃ এর দিকে সেখানে পৌঁছে মনোরঞ্জন বাবুর বাড়ীতে সূত্রপাঠ করলাম ৬জন ভিক্ষু, রাত ১১.৩০মিঃ পর্যন্ত। বিহারে বিশ্রামে এসেও অনেক্ষণ সংঘপাল ভাস্কের সাথে নানা বিষয়ে কথা বলতে হলো।

৩১/১২/৭৮ইং ভোর ৪টায় ঘুম থেকে উঠে ৫টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ অধ্যয়ন করলাম। ডায়েরী লিখলাম।

সাড়ে ছয়টায় সকালের সংঘদানে গেলাম। সেখান থেকে এসে শীলরক্ষিত ভাস্ককে উৎসাহিত করলাম আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের ফাণ্ডের সন্তোষজনক বৃদ্ধির বর্ণনা দিয়ে। মধ্যাহ্ন সংঘদানের পর ২টায় রওনা দিলাম জ্ঞানশ্রী ভাস্ক সহ মীরের খিল। সন্ধ্যায় আহুত মিটিং এ, লোকগুলো হাটহাজারী বাজার শেষে উপস্থিত হতে হতে রাত ১২টায় সেই মিটিং শুরু হলো। ভিক্ষু আনন্দের উদ্বোধনী ভাষণের পরে আমি বড়ুাদের বর্তমান দৈন্য দশার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে উপায় নির্দেশ করতে চাইলাম, কিভাবে এই সংকট মুক্তিতে শিশু ধর্মশিক্ষা সহ নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে বুদ্ধের শীলনীতিকে কাজে লাগানো যায়। সিদ্ধান্ত হলো মীরের খিল বাসীরা ধর্মীয় শিক্ষা ও আচরণে উৎসাহী না হলে, আনন্দ ভিক্ষুকে গহিরা জেতবন বিহারে নিয়ে যাওয়া হবে।

১৯৭৯ ইংরেজী :-

১/১/৭৯ইং সোমবার। আজ ইংরেজী নববর্ষের প্রথম দিনে ভোর ৪টায় ঘুম থেকে উঠলাম মীরের খিল বৌদ্ধ বিহারে। প্রাতঃকৃত্য শেষে মাথাও মুখ ধুঁয়ে বন্দনা করলাম একান্ত মনে। তারপর প্রাতঃ ভোজনে গেলাম বিজয় বাবুর বাড়ীতে। আনন্দকে যেন, কোন কারণে এই বিহার হতে সরিয়ে না নিই তার জন্যে বার বার অনুরোধ জানালেন তিনি। এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন বিহারের সমস্ত সমস্যার সমাধানে তিনি প্রয়োজনে একক ভাবে অগ্রসর হবেন।

[বিঃদ্রঃ এই আনন্দ সকলের এত শ্রদ্ধা ভাজন হয়েও, আমাদের কল্যাণ মূলক কাজে যথেষ্ট সহায় সহযোগী হয়েও, পতন ঘটলো। চীবর ত্যাগ করে সেই গ্রামেরই এক মেয়ে বিয়ে করলো। এতেই প্রমাণ হয়, ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাশুবিরের প্রদর্শিত মত ও পথ প্রব্রজিত জীবনকে সুরক্ষার উপযোগী নহে। আমি প্রজ্ঞাবংশ রেহাই পেলাম, আমার রামকোটের শিক্ষা প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে। ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাশুবিরের নিজের উক্তি মতে- তিনি রক্ষা পেয়েছেন শ্রমণ অবস্থায় মির্জাপুরে বিহার সংলগ্ন এক পরিবারে নিত্য ঝগড়া ও মার-পিঠ জাত সংসার বিভৃক্ষা হতে।] মীরের খিল হতে রওনা দিয়ে সকাল ৭টায় শান্তিময় বিহারে উপস্থিত হতে হলো, পূর্বে গৃহীত সকালের আমন্ত্রণ রক্ষায়। নাম মাত্র কিছু মুখে দিলাম বিপুলদের

বাড়ীতে। আহারাঙে উপদেশ দিলাম তাদের পারিবারিক অর্থনৈতিক দুরাবস্থা পরিবর্তনে পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী হতে। জ্ঞানপ্রী ভাঙে সহ ৯টায় রওনা দিয়ে প্রথমে গেলাম রাউজানে সারানন্দ ভাঙেকে দেখতে। তারপরে গেলাম বিনাজুরী বোধিতরু বাবুর বাড়ীতে। তরু বাবু বিরাট দান যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। এমন আয়োজন নিশ্চয় তাঁর ত্যাগ প্রবৃত্তির বহিঃ প্রকাশ। কিন্তু দরিদ্র সমাজে মুষ্টিমেয় বিস্তবানের এমন আয়োজন, অহংকার ও অদূরদর্শী আবেগ প্রবণতারই পরিচয়। আমি সত্যিই চিন্তিত এমন অগঠন মূলক দান প্রবণতায়।

[বিহুঃ ১৯৯২ ইংরেজীতে এই বোধিতরু বাবু চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারে আমার নিকট হতে চাল ধার নিয়ে পরিবারের অন্ন জোটাতে হয়েছে। আমার প্রদত্ত টাকায় আমেরিকা গিয়ে মানুষের লক্ষ লক্ষ টাকার ঋণ এখনো শোধ করে চলেছেন।

মন্তব্য : ১৯৯৭ ইং এর ১৭ই মে।]

বোধিতরু বাবুর দানানুষ্ঠান শেষে ধর্মপ্রিয় ভাঙে সহ রিক্সা যোগে রওনা দিলাম। তখন তিনি আমাকে শান্তপদ ভাঙের ঢাকা-কমলাপুর প্রীতিতে অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন- ভদ্র মহোদয়ের মাথের নিকায় ও কৃষ্টি প্রীতি আমাদের সংঘের মধ্যে অসন্ত প্রবণতা বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তিনি আমাদের সংঘের পরিচালক একথা মনে রাখা উচিত।

২/১/৭৯ ইংরেজী। বিকেলে শান্তিময় বিহারে তৈরী করতে বসলাম আমার একটি ভাষণ। সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার আগামী ৪০তম বার্ষিক অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হবে, চন্দনাইশ থানার দক্ষিণ জোয়ারা ভদ্র সুভোতিরত্ন মহাস্থবিরের শবদাহ অনুষ্ঠানে। সেই অধিবেশনে আমাকে মহাসভার কার্য নির্বাহী কমিটি কর্তৃক উদ্বোধনী ভাষণ দানের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। কিছু লিখার পর, পাহাড়তলী হতে আমার শ্রমণ জ্ঞানবংশ এসে উপস্থিত হলো। এই শ্রমণটির বাড়ী রামু থানার পূর্ব রাজারকুল গ্রামে। ইতিপূর্বে সে আমাকে তার বিভিন্ন অসুবিধার কথা উল্লেখ করে বার বার চিঠি লিখেছে। আমি লক্ষ্য করেছি পূজ্য জিনবংশ ভাঙের আশ্রয়ে ধর্ম-বিনয় শিক্ষার চেয়ে স্কুল-কলেজের শিক্ষাতেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। তাই আজ তাকে বললাম- দেখ, জ্ঞানপ্রী ভাঙের প্রতি, তিনি সাধারণ শিক্ষা তেমন না নিয়েও কেমন ভাবে ধর্ম ও সমাজের হিতমূলক কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদের বর্তমান সাধারণ শিক্ষায় কিছুতেই ভিক্ষু জীবন রক্ষা করতে পারবে না; যদি না বুদ্ধের শিক্ষায় আমাদের চিন্তা ও চরিত্রকে গঠন করতে না পারি। আমাদের সাধারণ শিক্ষায় কখনো বুদ্ধ জ্ঞান অর্জন সম্ভব নহে; সামান্য সহায়ক মাত্র ব্যবহারিক ক্ষেত্রে।

৩/১/৭৯ ইংরেজী, বুধবার। রাত সাড়ে তিনটা থেকে লেখা শুরু করলাম ভিক্ষু মহাসভার উদ্বোধনী ভাষণ। লিখলাম সাড়ে সাতটা পর্যন্ত।

সোয়া ৮টায় বের হয়ে গেলাম ভার্টিটির উদ্দেশ্যে। নয়টায় পৌঁছে দেখলাম এম,এ, পরীক্ষার জন্যে ক্লাশ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তাই মধ্যাহ্ন ভোজ গহিরায় গ্রহণ

করার সিদ্ধান্তে রওনা দিলাম। হাটহাজারী বাস ষ্টেণ্ড পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে এসে কলেজ পর্যন্ত হেঁটে যাচ্ছিলাম রাস্তামাটি বাস ধরার উদ্দেশ্যে। জাগৃতি ক্লাবের নিকটে পৌঁছতেই এক মিলিটারী জীপ আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। ইংগীত করলো সে জীপে উঠার জন্যে। আমি একটু ভীতি ভাব সত্ত্বেও উঠলাম যে, আমি তো কোন প্রকার রাষ্ট্র বিরোধী কাজে লিপ্ত নই। আমাকে আহ্বানকারী অফিসার প্রথমে জানতে চাইলেন কখন থেকে এই জীবন গ্রহণ করেছি, শিক্ষাগত মান কতটুকু, মা-বাবা কোথায় থাকেন, আমি পার্বত্য চট্টগ্রামে যাই কি-না, শান্তি বাহিনীর লোকদেরকে বর্তমান কর্মকান্ড বন্ধ করতে উপদেশ দান ধর্মীয় কর্তব্য কি-না। এসব প্রশ্ন করার পর তিনি আত্ম পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি কর্নেল হান্নান। আমেরিকায় ট্রেনিং গ্রহণ কালে তিনজন থাই মিলিটারী অফিসারের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। সে সূত্রে তিনি ৩বার ব্যাংকক গেছেন, বৌদ্ধদের অযুথেরা সহ অনেক মন্দির দর্শন করেছেন। খুব ভালো লাগে বৌদ্ধ ধর্মকে।

৪/১/৭৯ ইংরেজী, বৃহস্পতিবার। সকাল সাড়ে ছয়টায় সারানন্দ ভাস্কের জন্যে প্রাতঃরাশ নিয়ে রাউজানের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। চক্ষু শিবিরে গিয়ে জানলাম আজ ১টায় তাদেরকে শিবির হতে বিদায় দেয়া হবে। ইতিমধ্যে আমি ভার্শিটির ক্লাশ শেষ করে আসতে পারবো ধারণায় রওনা দিলাম। প্রথম ক্লাশটি সম্ভব না হলেও পরবর্তী সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত ক্লাশগুলো সমাপ্ত করে রওনা দিলাম রাউজানের উদ্দেশ্যে। পথে জানতে পারলাম সারানন্দ ভাস্ক বিহারে চলে এসেছেন, তখন বাস থেকে নেমে বিহারে ফিরলাম।

সারা বিকেলটা অতিক্রম করলাম মহাসভার সাধারণ অধিবেশনের জন্যে তৈরী ভাষণটির চূড়ান্ত লেখা শেষ করতে।

৫/১/৭৯ ইংরেজী। রাত ৩টায় ঘুম থেকে উঠে রবীন্দ্রনাথের রক্ত করবী নাটকের সমালোচনাটা পড়লাম। দৈনিক রুটিন অনুযায়ী প্রাতঃরাশ পর্ব পর্যন্ত সমাপ্ত করে সকাল ৮টায় ভার্শিটি রওনা হলাম। ১১.৪৫মিঃ পর্যন্ত ক্লাশ করে একটি খালি কক্ষ গিয়ে দ্রুত মধ্যাহ্ন ভোজ সমাপ্ত করার পর, হাটহাজারীতে কিছু কাজ শেষে বিহারে আসলাম। অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর বাগানের কাজে লেগে গেলাম। অনেক নারকেল গাছের গোড়ায় জল দেয়া গেল আজকে। সন্ধ্যা বন্দনার পর আজ খুব তাড়াতাড়ি (রাত ৮টায়) শয্যা গ্রহণ করলাম, ভীষণ দুর্বল বোধ হওয়ায়।

৬/১/৭৯ ইংরেজী শনিবার। রাত ১২টায় ঘুম থেকে উঠলাম শান্তিময় বিহারে। সারানন্দ ভাস্কের পায়খানা ও শৌচকর্মের সমাধার পর সকাল ৬টা পর্যন্ত লেখার কাজে অতিবাহিত করলাম।

সকাল ৮টায় ভার্শিটিতে রওনা হলাম। ১২টায় বিহারে এসে সেবক হরিপদকে নিয়ে রওনা হলাম চন্দনাইশে সুভোতিরত্ন মহাস্থবিরের শবদাহ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে। দেড়টায় বুদ্ধ মন্দিরে উপস্থিত হলাম। চট্টগ্রাম বুদ্ধ মন্দির হতে সাড়ে তিনটায় ভিক্ষু

সংঘ সহ বাসে উঠলাম। বাস চালু করতেই ইঞ্জিনের গরম জলের ছিটকায় সেবক হরিপদের বাহু ঝলসে গেল। প্রাথমিক চিকিৎসার পর জোয়ারা উপস্থিত হতে সন্ধ্যা ৭টা হয়ে গেল।

রামুর অন্যান্য ভাঙেদের সাথে আমার গুরু ভাঙের দেখা পেলাম। বন্দনাদির পর পাসপোর্ট সংক্রান্ত জটিলতার বিষয় অবগত করলাম। রাত ৯টায় মহাসভার ৪০তম অধিবেশন শুরু হলো। শ্রদ্ধেয় লোকানন্দ ভাঙের সভাপতিত্বে আমার উদ্বোধনী ভাষণ শুরু করলাম। জীবনে এই প্রথম সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভায় আমার লিখিত ভাষণ পাঠ। পৌনে এক ঘন্টার মতো লাগলো ভাষণ শেষ করতে। অধিবেশনে উচ্চ প্রশংসিত হলো ভাষণটি। সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো ভাষণটি পরবর্তীতে ছেপে বিলি করার জন্যে। তাই কপিটা শ্রদ্ধেয় শান্তপদ মহাস্থবির নিয়ে নিলেন আমার থেকে। আমার প্রস্তাবিত মহাসভার স্থায়ী ফাণ্ডের জন্যে ৬মাসের মধ্যে আদায়ের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল ১০ হাজার টাকা। ভোর ৪টা পর্যন্ত চললো এই অধিবেশন।

৭/১/৭৯ ইংরেজী, রবিবার। জোয়ারা বিহারে মাত্র ঘন্টা দু'য়েক ঘুমের পর উঠে প্রাতঃকৃত্য ও বন্দনাদির পর সাড়ে ছয়টায় প্রাতঃরাশ গ্রহণ করলাম।

প্রাতঃরাশ শেষে জ্ঞানশ্রী ভাঙে ও ধর্মপ্রিয় ভাঙে সহ রওনা দিলাম, লাঠিছড়িতে হরিমোহন বাবুর শেষ কৃত্যানুষ্ঠানে যোগদান করতে। আমার এই ছুটোছুটি অসহ্য বোধ হলেও ভদন্ত ঘরের মন রক্ষার্থেই সাথে থাকলাম। সাড়ে দশটায় লাঠিছড়ি উপস্থিত হয়ে সংঘদানে যোগদান করতে সক্ষম হলাম। উপস্থিত হওয়া মাত্রই কিছু বলার আদেশ হলো আমার উপর। বিকেলে আয়োজন হলো শোকসভার। সেখানে বললাম— মানুষ শব্দের অর্থ কি এবং এই মানুষ হিসেবে আমাদের প্রকৃত দায়িত্ব কর্তব্য কি। শবদেহকে সামনে রেখে চাঁ-বিস্কিট, পান, সিগারেট পরিবেশন রীতির সমালোচনার সাথে সাথে, বন্ধ করতে আহ্বান জানালাম শবদেহকে কাঁধে নিয়ে যুবকদের ঠেলাঠেলি আর আমোদ-উল্লাসকে। এসব আচরণ অত্যন্ত অমানবিক এবং কুরুচির পরিচায়ক।

সন্ধ্যা ৬টায় জ্ঞানশ্রী ভাঙে সহ লাঠিছড়ি হতে শান্তিময় বিহারে রওনা দিলাম। এসে দেখলাম পাহাড় হতে শ্রদ্ধেয় জিনানন্দ ভাঙের ও এসেছেন। বিলম্ব না করে বন্দানার পর শয্যা গ্রহণ করলাম।

৪/১/৭৯ ইংরেজী। রাত সাড়ে তিনটা ঘুম থেকে উঠে কোন লেখাপড়া করতে পারলাম না, জ্ঞানশ্রী ভাঙে কথা শুরু করায়। সকাল ৬টায় জ্ঞানশ্রী ভাঙের সাথে আয় ব্যয়ের হিসাব করতে গিয়ে, প্রথমে কয়েক স্থানের পথ খরচ একক ভাবে বহনের ইচ্ছা করেও পুনঃ নিজের পক্ষে ব্যয় বেশী হয়ে যাচ্ছে বিধায়, তা জ্ঞানশ্রী ভাঙের উপর চাপাতে চাইলাম। এটা আমার চিন্তের অনুদার স্বভাব এই বিতর্ক করে সংঘত হলাম। ৮টায় বিহারী ডাক্তারের বাড়ী হতে প্রাতঃরাশ সমাপ্তির পর ভার্টিসিট গেলাম। সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজের পর গেলাম শহরে। শ্রমণ জ্ঞানরত্নের জন্য শীত বস্ত্র, কিছু

কাপড়ের রং এবং সারানন্দ ভাস্কের জন্যে একটি সানগ্লাস নিয়ে বিহারে ফিরে এলাম ৬টায়। ধর্মপ্রিয় ভাস্ক ইদানিং বিজ্ঞানন্দ মহাধেরোর সাথে যেভাবে উঠা বসা শুরু করেছেন, সে প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে জ্ঞানশ্রী ভাস্ককে বললাম দুঃশীল ভিক্ষু কেবল মাথের দলে নহে, সংঘরাজ দলেও কম নেই।

১০/১/৭৯ ইংরেজী বুধবার। সকাল সাড়ে ৮টায় গহিরা হতে ভার্টিটি গেলাম। ক্লাশ শেষ করে জ্ঞানশ্রী ভাস্কের সাথে সাক্ষাতের জন্যে গেলাম জোবরা। ভাস্কের সাথে কিছুক্ষণ রবীন্দ্র নাথের রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করলাম। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় জনতা ব্যাংক হতে আসার পথে জ্ঞানশ্রী ভাস্ককে, কয়েকজন মুসলিম যুবক না-কি অভদ্র ব্যবহার করেছেন। এ বিষয়ে আপত্তি নিষ্পত্তি করে রাত ৮টায় উভয়ে রওনা দিলাম লাঠিছড়ির উদ্দেশ্যে। রাত ১০টায় সেখানে পৌঁছে শীলরক্ষিত ভাস্কের সাথে আমাদের যৌথ ফাণ্ড সম্পর্কে আলাপ হলো। এক পর্যায়ে তিনি ও নিজের ব্যক্তিগত সঞ্চয় যৌথ ফাণ্ডে রাখতে সম্মত হলেন। ইতিমধ্যে সারানন্দ ভাস্ক এবং গহিরার জিনানন্দ ভাস্ক ও সম্মতি প্রকাশ করেছেন। সিদ্ধান্ত হলো এই উপলক্ষে মাসে একবার আমরা সমবেত হয়ে স্ব স্ব সঞ্চয় প্রদান করবো। [বিঃদ্রঃ কার্যতঃ কেহই এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নি। একমাত্র শুরু ও শেষ পর্যন্ত আমিও ভদ্র জ্ঞানশ্রী মহাহুবিবই ছিলাম যৌথ ফাণ্ড গঠনে।]

১১/১/৭৯ ইংরেজী। লাঠিছড়ি হরিমোহন বাবুর সংঘদানে স্মৃতি মন্দির স্থাপনের পরিবর্তে স্মৃতি বৃষ্টি রূপ ধর্ম মন্দির স্থাপনের প্রস্তাবে, বিধান তাঁর পিতার নামে ধর্ম বৃষ্টি দানের ইচ্ছা প্রকাশ করলো। সংঘদান শেষে লাঠিছড়ি বিহারে উপস্থিত হলে, বিমলানন্দ ভিক্ষুকে বহুদিন পর সঙ্ঘের মধ্যে পেয়ে আমার বই চুরির কথা উত্থাপন করলাম। সে অস্বীকার করায় আনন্দ মিত্রের নিকট তার প্রমাণ আছে উল্লেখ করলে এ সমস্যা সমাধানে গহিরায় আসবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, ভিক্ষু সংঘ এ বিষয়ে বরাবরই নীরব ভূমিকা পালন করছে। সুগতবংশ মহাহুবিব বলেছেন- কেশ বাছতে বাছতে কমল শেষ হয়ে যাবে। ভাস্কের এমন হেয়ালি বিনয় বিরুদ্ধ কথায় আমি ভীষণ মর্মান্বিত হলাম।

১৫/১/৭৯ ইংরেজী, সোমবার। সারানন্দ ভাস্ককে ১৫দিন সেবা যত্নের পর ফতেনগরের উদ্দেশ্যে বিদায় দিয়ে, আমি ভার্টিটি চলে গেলাম। ১২টায় ক্লাশ শেষে বিহারে এসে জ্ঞানজ্যোতি সহ বোধি বিহারে গেলাম শুভাচার ভাস্ককে আমার বিহারে নিয়ে আসতে। শুভাচারকে গত ১১/১/৭৯ তারিখ রাতে জেতবন হতে বোধি বিহারে সরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয় এবং S.S.C পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তথায় অবস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। ধর্মপুরের এক উপাসিকাকে ধর্ম মা রূপে গ্রহণ করে, নিজের সাথে জেতবন বিহারে রাখায়, দায়কদের মধ্যে তাদের আচরণ নিয়ে অসন্তোষ দেখা দেয়। তারই ফলশ্রুতিতে বিহার ত্যাগের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

২০/১/৭৯ ইংরেজী, শনিবার। ভার্শিটিতে আমার সহপাঠী হিন্দু মুসলিম ছাত্রগণ আমাকে নিয়ে বসলো। এই ভিক্ষু জীবন এবং এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে অনেক নানা প্রশ্নোত্তর চললো তাদের সাথে।

রাতে গহিরা শান্তিময় বিহারে মুষ্টিমেয় লোকের উপস্থিতিতে সাধারণ সভার বৈঠক শুরু হলো। এ সভায় আমি তাদের জানিয়ে দিলাম আগামী ফাল্গুন মাসে আপনাদের বিহার ত্যাগ করবো, আপনারা ইতিমধ্যে অন্য একজন ভিক্ষু মনোনীত করুন। ঘোষণাটি দেয়ার পর, জ্ঞানশ্রী ভাস্কের নিকট জানতে চাইলাম— এই বিহার ত্যাগের পর আমার কথা বাদ দিলেও শ্রমণ জ্ঞানরত্নের লেখাপড়ার অবস্থা কেমন হবে। তিনি বললেন, বছর খানেক পর তো আমাদের শিক্ষাকেন্দ্র চালু করতে যাচ্ছি, সেখানেই নিয়ে যাওয়া হবে।

২৩/১/৭৯ ইংরেজী। আজকে মদুনাখীল সুমঙ্গল ভাস্কের বাড়ীতে সংঘদানে গেলাম। দান শেষে সংঘনায়ক ভাস্ক সহ ফতেনগর বিহারে বসলে, শান্তপদ মহাস্থবিরের ইদানিং কিছু কার্যকলাপ নিয়ে সমালোচনা শুরু হলো। তিনি নাকি জিনসেনকে সম্পূর্ণ আশ্বাস দিয়ে ছিলেন— ‘নারী সংক্রান্ত অপরাধে কিছুই হবে না; কেবল তুমি চীঘর ত্যাগ করবে না এই প্রতিশ্রুতি দিলে, আমি সব মুখ বন্ধ করে দেব’।

আর দ্বিতীয় সমালোচনার বিষয় হলো, তিনি এবং শীলাচার মহাস্থবির কলিকাতায় গিয়ে ধর্মাধার মহাস্থবিরকে বাধ্য করেছেন ধর্মপালের সাথে আপোষ নিষ্পত্তি করতে, কোর্টের রায় ধর্মাধার মহাস্থবিরের স্বপক্ষে থাকা সত্ত্বেও। তাঁরা আপোষ চুক্তি করালেন, কিন্তু ধর্মাধার মহাস্থবিরের বাকী জীবনের নিরাপদ অবস্থানের সুনির্দিষ্ট কোন ব্যবস্থা না করেই। প্রকারান্তরে ধর্মপালের বিজয় পতাকা উড়ালেন দক্ষিণ কুলীয় প্রেমের জয় হলো; উভয়ে ধর্মাধার ভাস্কের শিষ্য এই অভিনয়ে।

২৪/১/৭৯ ইংরেজী, বুধবার। শ্রমণ জ্ঞানরত্ন ও হরিপদের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট গ্রহণ করলাম হামদু মিঞা প্রাইমারী স্কুল হতে। হরিপদের নাম সর্বানন্দ করা হলো। শান্ত রক্ষিত ভাস্কের জয়ন্তী উৎসব কমিটির সভাপতি গিরিমানন্দ ভাস্কের ভাষণ সংশোধনীর দায়িত্বও এসে পড়লো আমার উপর।

২৫/১/৭৯ ইংরেজী, বৃহস্পতিবার। ভার্শিটির শাহজালাল হলে আমার ছাত্রবন্ধু সিলেটের মুজিবুল হক খসরু ‘অরহত’ গণের ঋদ্ধি শক্তি সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করলে, অনেক আলোচনা হলো।

ভার্শিটি থেকে ফিরে এসে বিহারে বসে আমার কয়েক জোড় ছেড়া সেঙ্গেল মেরামত করছিলাম। ইতিমধ্যে বিনাজুরীর কয়েকজন দায়ক এসে আমাকে জানালেন যে, সংঘপাল, সুমঙ্গল, সংঘরক্ষিত ও শান্তরক্ষিত ভাস্কের জয়ন্তীতে অসহযোগীতা মূলক আচরণ শুরু করেছেন।

২৭/১/৭৯ ইংরেজী, শনিবার। ভোরে হেমেন্দু বাবুর উদ্দেশ্যে চিঠি লিখলাম, জ্ঞানশ্রী ভাস্ক সহ গতকালের আলোচনার সিদ্ধান্তের উপর। চিঠির মর্মার্থ হলো— তিনি যেন

নানা জনের কান কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে আরো দ্রুত অগ্রসর হন। আমরা তাঁর সাথে আছি।

কাজলদার সংঘদান উপলক্ষে বিনাজুরী হতে সুমঙ্গল ও সংঘরক্ষিত ভাণ্ডে আসলেন শান্তিময় বিহারে। তাদেরকে শান্তরক্ষিত ভাণ্ডের জয়ন্তীর বিষয়ে জানতে চাইলে সংঘরক্ষিত ভাণ্ডে বর্তমান ভিক্ষু সংঘের হীন মানসিকতার সমালোচনা করলেন।

সুমঙ্গল ভাণ্ডের সাথে তাঁর গুরু শ্রদ্ধানন্দ ভাণ্ডের ভবিষ্যত নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা হলো। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, তিনি যদি কোন বিহারে অবস্থান করতে অক্ষম হন, তাহলে কদলপুরেই নিয়ে যাওয়া হবে।

২৮/১/৭৯ ইংরেজী, রবিবার। ভোর ৪টায় ঘুম থেকে উঠে দার্শনিক বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবিরের ‘সত্য দর্শন’ গ্রন্থটির কিছু অংশ পাঠ করলাম। সকাল ও মধ্যাহ্ন সংঘদানে অংশ গ্রহণের জন্যে বিনাজুরী ও ডোমখালীর উদ্দেশ্যে খুব সকালে রওনা হলাম। বিনাজুরীতে পৌঁছলে পূজ্য শান্তরক্ষিত ভাণ্ডে বললেন, আমি যেন জয়ন্তীর চারদিন আগেই চলে আসি।

শান্তপদ ভাণ্ডে সহ মধ্যাহ্ন সংঘদানে ডোমখালী যাওয়ার পথে তিনি আমাকে মহাসভার প্রেস প্রতিষ্ঠায় আমার প্রস্তাবিত ফাণ্ড সংগ্রহের পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে নিষ্ঠাবান কর্মী ভিক্ষুর একান্ত অভাবের কথা উল্লেখ করলেন। আমি ভাণ্ডেকে পরামর্শ দিলাম বিভিন্ন অঞ্চলে যে স্কর উৎসাহী ভিক্ষু আপনার ধারণায় আছে কেবল তাদের নিয়ে আর একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করুন। সেই বৈঠকের আলোচনা ও পরিকল্পনা মতে ফাণ্ড সংগ্রহের দায়িত্ব প্রদান করুন।

২৯/১/৭৯ ইংরেজী, সোমবার। ভোর ৪টায় ঘুম থেকে উঠে আমার পুরণো ক্লাশ নোটগুলো পুনঃ লেখন সম্পন্ন করলাম।

গতকাল নিরঞ্জন বাবু এবং তাঁর বড়ো ভাই জ্ঞান বাবুর সাথে শান্তিময় বিহারের বর্তমান জটিল পরিস্থিতি নিয়ে বিশদ আলোচনার প্রেক্ষিতে, আজ ভার্শিটির ক্লাশ শেষে শ্রমণ জ্ঞানরত্ন ও সর্বানন্দকে (হরিপদ) পশ্চিম গহিরা হাই স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করানো হলো।

ডাঃ অনন্ত বাবুর অনুরোধে তাঁর ছেলে খুকুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির বিষয়ে শীলাচার ভাণ্ডের সাথে আলাপ হয়েছিল আজকে। কিন্তু, তার প্রাপ্ত বয়স খুব কম বিধায় ভর্তি সম্ভব হলো না।

৩১/১/৭৯ ইংরেজী। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ শেষে জোবরা হয়ে, গেলাম হিজলা বৌদ্ধ বিহারে। জ্ঞানশ্রী ভাণ্ডের আগমনের অপেক্ষায় অনেকক্ষণ বসে থাকার পর, শ্রদ্ধেয় শ্রদ্ধানন্দ ভাণ্ডেকে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা একক ভাবে জানালাম। এই গ্রামবাসী যদি বার্ষিক্যের অজুহাতে আপনাকে রাখতে না চায়, তাহলে আপনার আমরণ দায়-দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করবো, আপনি নিঃসঙ্কোচে কদলপুরে থাকবেন। আপনার

অভিমত জানায়ে গহিরা আমাকে সংবাদ দিলে, আমি নিয়ে যেতে আসবো। এতটুকু বলে চলে আসলাম। সন্ধ্যায় জ্ঞানশ্রী ভাঙে শান্তিময় বিহারে উপস্থিত হলেন।

১/২/৭৯ ইংরেজী, বৃহস্পতিবার। সাড়ে তিনটায় ঘুম থেকে উঠে রাহুল সংকৃত্যায়নের ‘মানব সভ্যতার ইতিহাস’ নামক গ্রন্থ খানি পড়লাম।

প্রাতঃ ভোজনে জ্ঞানশ্রী ভাঙে সহ পাঁচকড়ি বড়য়ার বাড়ীতে গিয়ে ভাঙের মাধ্যমে উৎসাহিত করলাম, তারা যেন জ্ঞাতীদের স্মৃতি রক্ষায় একটি ধর্মীয় বৃত্তি দান করে। সারা গ্রামে এই পরিবারের লোকেরা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। ধর্ম ও সমাজ যেন, কেবল তাদেরই প্রয়োজনে ব্যবহার্য বস্তু মাত্র।

মধ্যাহ্ন ভোজে শুধু মাত্র পূর্ণজ্যোতি শ্রমণকে নিয়ে ধনীরামের বাড়ীর দরিদ্র অনাথ কন্যা, মালতির বাড়ীতে গেলাম। আজকে তার বিয়ের দিন। সীতাকুন্ড পাছশালা গ্রামের আমার এক জ্ঞাতী গরীব ছেলের সাথে বিয়ে হবে তার; এবং বসতি করবে বাপের বাড়ীতে। মা-বাবার একমাত্র কন্যা এই মালতির মা-কে অনেক চেষ্টা করেও আমি বাঁচাতে পারিনি।

বিগ্ধঃ তার মা ধর্মপুরের সুমনশ্রী শ্রমণ ও শ্রীলঙ্কায় অধ্যয়নরত প্রজ্ঞারত্ন ভিক্ষুর মাসীমা। সুমনশ্রীর মা মারা গেলে তাকে দুধ পোষ্য অবস্থায় গহিরায়ে এনে মালতির মা পালন করেন। প্রজ্ঞারত্নকে আমি শ্রীলঙ্কায় নিয়ে গিয়েছিলাম।

আজ রাতে জ্ঞানশ্রী ভাঙে আমাকে পরামর্শ দিলেন, আমি আগামীতে যে বিহারের দায়িত্ব গ্রহণ করবো- সে বিহার পরিচালনা কমিটিকে তিনটি শর্ত পূরণে যেন বাধ্য করি। যথা- ১) দৈনিক মুষ্টি চাল দান, ২) শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা, ৩) বিহারের সমস্ত ফল-মূলের অধিকার।

৪/২/৭৯ ইংরেজী, রবিবার। সকাল সাড়ে পাঁচটায় জ্ঞানশ্রী ভাঙে সহ রওনা দিলাম বিনাজুরী শান্তরক্ষিত ভাঙের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে। প্রাতঃ রাশ গ্রহণের পর ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের কার্য নির্বাহী কমিটির এক সংক্ষিপ্ত বৈঠকে আগামী ধর্ম বৃত্তি পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির উপর আলোচনাও সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। বৈঠক শেষে শীলরক্ষিত ভাঙে, আনন্দ, বিনয়পাল (শ্রীমন্ত) এবং সারানন্দ ভাঙেকে নিয়ে, আমিও জ্ঞানশ্রী ভাঙে বসলাম আমাদের যৌথ ফাও বিষয়ে আলোচনার জন্যে। সিদ্ধান্ত হলো আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার গহিরা শান্তিময় বিহারে সকলে সমবেত হয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৫/২/৭৯ ইংরেজী, সোমবার। সকাল ৮টায় নিরঞ্জন বাবুর সাথে আলাপ করছিলাম ভিক্ষু সীমা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণে। তিনি প্রস্তাব করলেন আগামী মাঘী পূর্ণিমায় সেই অনুষ্ঠান করলে ভালো হবে। আমাদের এই আলোচনা চলাকালে গহিরার ডঃ কামাল (ময়মনসিং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের) এর ভাই ডঃ জামাল সাহেব ও প্রফুল্ল বাবু আমার সাথে দেখা করতে আসলেন। তিনি বর্তমানে

আমেরিকার মেসিগান রাজ্যে আছেন। বললেন, এক ছেলে, এক মেয়ে এবং স্ত্রী নিয়ে খুব সুখেই আছেন আমেরিকায়।

৬/২/৭৯ ইংরেজী, মঙ্গলবার। সকাল সোয়া ছয়টায় আমিও জিনানন্দ ভাণ্ডে, রাঙ্গামাটি বরকলের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম গহিরা শান্তিময় বিহারে ভিক্ষু সীমা প্রতিষ্ঠায় পাথর কাটা পিলার বসানোর জন্যে। বরজ্ঞান মহাস্থবিরের বংশজ ভ্রাতৃপুত্র এই বৃদ্ধ ভিক্ষু জিনানন্দ ভাণ্ডে, বহু পরিশ্রম করে নিজের হাতে বড়ো বড়ো পাথর কেটে পিলার গুলো তৈরী করেছেন। সাড়ে এগারোটায় রাঙ্গামাটি পৌঁছে একটি ঘড়ির দোকানে সাথে নেয়া ভাত যখন খাচ্ছি, তখন শান্তিময় বিহারের দায়ক জ্যোস্নার ভাই বাদল আমাদেরকে চাঁ ও মিষ্টি খাওয়ালো, এবং সাথে নিয়ে যেতে একটি কেক এনে দিল।

বিকেল ৫টায় বরকলের লতিবাঁশ ছড়া কালাচুলা মহাজনের বিহারে পৌঁছে গেলাম। অল্প গরম জল পানের পর হাত মুখ ধুয়ে, বন্দনাদির পর সন্ধ্যা ৭টায় শয্যা গ্রহণ করলাম।

পরদনি সকালে প্রায় আড়াই ঘন্টা পাহাড়ী দুর্গম পথ অতিক্রম করে কালাচুলা মহাজনের বড়ো ছেলের বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। সেখানে আধ ঘন্টার মতো বিশ্রাম করে, পিলার গুলো যেখানে কাটা হয়েছে সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, এমন জন মানবহীন গভীর জঙ্গলের ছড়ায় বসে দিনের পর দিন কি করে এই বৃদ্ধ ভিক্ষু, পাথর গুলো কাটলেন? আসলে তিনি এক অদ্ভুত ব্যক্তি, মাথায় যখন যা আসে, তা শেষ না করা পর্যন্ত জীবন মরণ কোন প্রশ্ন তাঁর কাছে আসতে পারেনা। ৮/২/৭৯ ইংরেজী। রাঙ্গামাটি হতে শান্তিময় বিহারের দায়ক বিভূতি বাবুর গাড়ী করে তা বিহারে আনলাম। কিন্তু, শুরু থেকেই বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন মাষ্টার প্রফুল্ল বাবু এই ভিক্ষু সীমা প্রতিষ্ঠা নিয়ে। আমার জেদের কাছে শেষ পর্যন্ত হার মানলেন তিনি।

১৩/২/৭৯ ইংরেজী, মঙ্গলবার। সিদ্ধান্ত ছিল গতকাল অর্থাৎ ১২ই ফেব্রুয়ারী সকালে আমার বিহারে যৌথ ফাও বিষয়ে সমবেত হবেন। জ্ঞানশ্রী ভাণ্ডে এসেছিলেন। কিন্তু, শীলরক্ষিত ভাণ্ডে আসলেন আজকে বিকেলে। ১২ তারিখে জ্ঞানশ্রী ভাণ্ডে ছাড়া দ্বিতীয় কেহ আসেননি, আর আজকে কেবল শীলরক্ষিত ভাণ্ডে। অতএব, যৌথ ফাও বিষয়ে নির্ধারিত তারিখের এখানেই ইতি হলো কি-না ভবিষ্যতই বলবে।

২১/২/৭৯ ইংরেজী, মধ্যাহ্ন ভোজের পর জোবরায় গেলাম। আজ শহীদ দিবস উপলক্ষে ভার্টিসি বন্ধ হেতু প্রশান্তকে তার বাড়ীতেই পেয়ে গেলাম। ধর্মীয় বৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র টাইপ বিষয়ে কথা বললাম।

বিকেল ৩টায় ভাগিনা নিধু, তার মা, এবং ছোট ভাই অশোকের সাথে ছোট বোন কণিকার চিকিৎসার বিষয়ে আলোচনা করে গহিরায় ফিরে এলাম। রাত নয়টায় যখন

ঘুমাছিলাম তখন মাষ্টার প্রফুল্ল বাবুর ছেলে নিদান এসে ঔষধ চাইল, তাদের মরণাপন্ন ছাগলটি বাঁচানোর চেষ্টায়।

২২/২/৭৯ ইংরেজী, বৃহস্পতিবার। ভার্টিটিতে গিয়ে দুই পিরিয়ড ক্লাশ করে শাহজালাল হল-এ গেলাম। প্রশান্তকে দিয়ে প্রশ্নগুলো টাইপ করলাম। শহীদ দিবস উপলক্ষে ভার্টিটির কালচারেল এসোসিয়েশন আয়োজিত অনুষ্ঠানে, কিছুক্ষণ বসে বিহারে চলে এলাম। সামান্য বিশ্রামের পর একটি বই পড়ছিলাম। তখন আমার গুরু ভাণ্ডে উপস্থিত হলেন। আমাকে নিয়ে দ্রুত রওনা হলেন শহরে পাসপোর্ট বিষয়ে। শাক্য বাবু ২৫ তারিখের আগে সম্ভব নহে বলেছিলেন। আজকের চেষ্টা ও ব্যর্থ হলো। ভাণ্ডের জরুরী প্রয়োজন উপস্থিত হওয়ায় আগামীকালের আশ্বাস পাওয়া গেল। ভাণ্ডেকে ডাঃ সীতাংশু বাবুর বাসায় রেখে এলাম ২০০/- টাকা হাত খরচ দিয়ে।

২৩/২/৭৯ ইংরেজী, শুক্রবার। ভোরে ঘুম থেকে উঠে ধর্মীয় বৃত্তি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকদের উদ্দেশ্যে দায়িত্ব অবগতি পত্রগুলো প্রস্তুত করলাম।

মধ্যাহ্ন সংঘদানে যোগদানের উদ্দেশ্যে রাউজানে গেলাম। সাড়ে তিনটায় সেখান থেকে এসে দেখলাম, মাষ্টার প্রফুল্ল বাবু প্রতাপ বাবুদেরকে তাঁরই প্রস্তাবিত সাধারণ সভা ডাকতে নিষেধ করে দিয়েছেন, আমার প্রতি ক্ষেমেশের অন্যায় আচরণের বিচার দাবী করে। এক বছরের পুরণো বিষয় টেনে সীমা প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রস্তাবিত সাধারণ সভাটি এভাবে বন্ধ করে দেয়ায় এই মার্ক্স-লেনিনের কমরেডটির প্রতি আমার ভীষণ অশ্রদ্ধা ভাব জমে গেল।

২৪/২/৭৯ ইংরেজী। সকাল ৮টায় ভার্টিটি গিয়ে প্রথমে টাকা তুলে নিলাম ব্যাংক হতে। ক্লাশ করতে গিয়ে দেখলাম ক্লাশের পরিবর্তে অনুষ্ঠান হচ্ছে। সেমিনার কক্ষে কিছুক্ষণ অধ্যয়ন করে প্রশান্ত হতে এক্সটেনসিভ পেপারগুলো নিয়ে কন্ট্রোলার অফিসে সাইক্লোস্টাইল করতে দিলাম ভূপতি বাবুকে। আড়াইটায় জোবরা গিয়ে ঋণ হিসেবে ছোট ভাই অশোককে তার মেশিন ক্রয়ে ২০০০/- টাকা দিলাম। জ্ঞানশ্রী ভাণ্ডে সহ গহিরায়ে এসে রাতে নিদানকে (প্রফুল্ল বাবুর ছেলে) প্রব্রজ্যা দিলাম।

২৫/২/৭৯ ইংরেজী, রবিবার। আমার রামু রাজার কুলের একজন শ্রমণ ধর্মরত্নকে ডাঃ ভবতোষের বড়ো ভাই আশুতোষ বড়ুয়া ঘড়ি চুরির সন্দেহে অভিযুক্ত করলে শ্রমণটি ভয়ে পালিয়ে গেল। জ্ঞানশ্রী ভাণ্ডে ও আমি তাকে স্বীকারোক্তির জন্যে চাপ সৃষ্টি করেছিলাম। অথচ পরে দেখা গেল সমীরণ আশু বড়ুয়াকে জানিয়েই বিহারে তার অবস্থান কক্ষ হতে ঘড়িটি নিয়ে গিয়েছিল। শ্রামণের কাছে নিজেই বড়ো অপরাধী করে ফেললাম।

২৬/২/৭৯ ইংরেজী, সীমা প্রতিষ্ঠায় মাষ্টার প্রফুল্ল বড়ুয়ার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, আমার অবস্থান কালের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করতে দেবেন কি-না এ সম্পর্কে আজকে তাঁকে প্রশ্ন করলাম। তিনি সন্তোষ জনক কোন উত্তর দিলেন না।

মধ্যাহ্ন সংঘদানে রাউজান গেলাম। সেখানে ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের বৈঠকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব বন্টন এবং সম্মেলনের তারিখ নির্ধারণ করলাম।

২৮/২/৭৯ ইংরেজী। ভার্শিটির ক্লাশ শেষে ধর্মীয় বৃত্তির প্রশ্ন পত্রগুলো কন্ট্রোলার অফিস হতে নিয়ে সোজা বিহারে চলে আসলাম।

১/৩/৭৯ ইংরেজী, বৃহস্পতিবার। রাত ২টায় ঘুম থেকে উঠে ধর্মীয় বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণকারীদের নামগুলো কেন্দ্র ভিত্তিক তালিকাভুক্ত করে নিলাম। প্রশ্ন পত্রগুলো শ্রেণী ও কেন্দ্র ভিত্তিক পেকেট করে নিলাম।

সকাল ৮টায় ভার্শিটি গিয়ে ক্লাশ শেষে, গেলাম মীরের খীল। ভিক্ষু আনন্দ অনুপস্থিত থাকায় শান্তিময় বিহারে আসার চিঠি লিখে প্রদুন্নের মায়ের হাতে দিলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম কবে বিহার সংলগ্ন জমিটির দানপত্র হবে। দেখলাম এখন আর এ জমি দান করার ইচ্ছে নেই।

শান্তিময় বিহারে উপস্থিত হয়ে দেখলাম জেতবন বিহারের দায়ক তড়িৎ বাবু ও হরবিলাস বাবু আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন। আমি তাদের সম্মতি দিলাম শান্তিময় বিহার ত্যাগ করে জেতবন বিহারে স্বল্প সময়ের মধ্যে চলে যাওয়ার জন্যে, পরবর্তী মঙ্গলবারে।

২/৩/৭৯ ইংরেজী। ভার্শিটি হতে ক্লাশ শেষে জ্ঞানরত্ন ও নিদান শ্রমণকে নিয়ে বরপোল ষ্টুডিও হতে ফটো তুললাম। বিহারে এসে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পালিটোলার ছাত্রদের পড়লাম। এ সময়ে কিছু চাকমা ছাত্র এলো, তাদের পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে অবস্থানের জন্যে। তাদের আসতে বললাম যথা সময়ে।

৩/৩/৭৯ ইংরেজী, শনিবার। রাত সোয়া তিনটায় ঘুম থেকে উঠলাম। বিগত ক্লাশ নোটগুলো পুনঃ লেখার কাজ সমাধা করলাম। সোয়া আটটায় ভার্শিটি গেলাম। ক্লাশ শেষে বিহারে এসে ব্যবহার্য সাদা ছাতাটি সেলাই ও ধৌত করে শুকাতে দিলাম। অতঃপর গহিরা শান্তিময় বিহার কেন ত্যাগ করবো, এ সম্পর্কে একটি লিখিত রিপোর্ট তৈরী করলাম। তারপরে বিহারের চারপাশে ঘুরে নারকেল সুপারী চারাগুলো পরিচর্যা করলাম। সন্ধ্যা বন্দনা শেষে জ্ঞান বাবুদের সাথে কিছুক্ষণ আলাপের পর, 'শরণ প্রতিভা' নামক বইটি পাঠ করলাম ঘুমানোর আগ পর্যন্ত।

৪/৩/৭৯ ইংরেজী, রবিবার। রাত সাড়ে তিনটায় ঘুম থেকে উঠে বিহার কমিটির উদ্দেশ্যে লিখিত রিপোর্টটি সমাপ্ত করলাম। প্রফুল্ল মাষ্টারের বাড়ীতে প্রাতঃ রাশে গেলে ভাগ্যধর বড়ুয়াকে রিপোর্টটি হস্তান্তর করলাম, তিনি বর্তমান বিহার কমিটির সেক্রেটারী হিসেবে। বিহারে এসে পালিটোলার ছাত্রদের কিছুক্ষণ পড়াচ্ছিলাম। তখন বিহার কমিটির কয়েকজন উপস্থিত হলেন। অনেক প্রকারে বুঝাতে চাইলেন-আমর এ সিদ্ধান্ত ত্যাগ করতে। তাদের বললাম- আমি তো অনেক আগেই আপনাদের বলেছি এ-বিহার ত্যাগ করবো, আপনারা অন্য ভিক্ষুর সন্ধান করেন। আসলে তারা বিশ্বাস করতে পারেননি যে, সত্যি আমি বিহার ত্যাগের সিদ্ধান্ত

নিয়েছি। কারণ, বিহার ও দায়ক সংক্রান্ত পূর্বাপর কোন কাজের ভাটা, অনীহা, অনুৎসাহ কিছুই তারা দেখেননি। তাদের বললাম এগুলো আমার দৈনিক রুটিনের অভ্যাসগত কাজ; বিহারে থাকলে যেমন, বাইরে গেলেও তেমন ভাবেই চলে। আমার কাজ দেখেই সন্তুষ্ট থাকলেন, অথচ কোন সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী না হয়ে দিন রাত মানসিক যত্ননায় রাখলেন। দোষ কোথায় জানেন? আপনারা সাংসারিক মানুষ হয়ে সে দৃষ্টিতেই ভিক্ষু শ্রামণদের বিচার করেন, তাই আমাদের দুঃখ, কষ্ট আপনারা বুঝেন না। আমি জেতবন বিহারের দায়কদের কথা দিয়ে ফেলেছি। এখন আর আমার নিজস্ব কোন বক্তব্য নেই। আপনারা জ্ঞানশ্রী ভাঙে ও তাদের সাথেই কথা বলুন।

৫/৩/৭৯/ ইংরেজী, সোমবার। রাত সাড়ে তিনটায় ঘুম থেকে উঠে 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থটা পড়লাম। ৫.৪০মিঃ পর্যন্ত নিদান শ্রমণকে কিছু উপদেশ দিলাম। বাবুলদের বাড়ীতে প্রাতঃরাশ গ্রহণের পর ভাসিটিতে গেলাম। ক্লাশ শেষে ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল স্যারের সাথে পাঠ বিষয়ে কিছু কথা বলতে গেলাম। তিনি বললেন, আগামীকাল ফাইনাল ইয়ার এর সকল ছাত্রকে সমবেত হতে।

ভাসিটি থেকে বিহারে ফিরে এসে পালিটোলার ছাত্রদের নিয়ে বসেছিলাম। এ সময়ে জ্ঞানশ্রী ভাঙে আসলেন। কিছুক্ষণ পর গহিরা জেতবনারামের দায়কেরা আমাকে আগামীকাল নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নে সৃষ্ট বিভ্রান্তির সমাধানে আসলেন। তাঁদের বললাম আপনাদেরকে আমি কথা দিয়েছি, কথা অবশ্যই রাখব। শান্তিময় বিহার কমিটিকে কয়েক মাস আগেই জানিয়ে দিয়েছিলাম আমার বিহার ত্যাগের সিদ্ধান্ত। তারা না-কি আমার দৈনন্দিন কাজ কর্ম দেখে বিশ্বাস করতে পারেননি যে, এই বিহার ও দায়কগণের প্রতি আমার মন উঠে গেছে। তাদের কোন মতামত এখন আমার নিঃপ্রয়োজন।

শান্তিময় বিহার কমিটির লোকেরা জ্ঞানশ্রী ভাঙে ও জেতবনের দায়কদের সাথে কথা বললেন, রাতে জরুরী মিটিং দিলেন, যাবতীয় সমস্যা সমাধানে ২১দিন সময় চাইলেন আমার থেকে।

৬/৩/৭৯ ইংরেজী, মঙ্গলবার। গতরাত মিটিং শেষে ঘুমাতে গেলাম রাত দেড়টায়। তাই ঘুম থেকে উঠতে খুব দেরী হয়ে গেল। প্রাতঃকৃত্য বন্দনাদি সমাপ্তির পর জ্ঞানশ্রী ভাঙে সহ আমন্ত্রণে গেলাম। ভাঙেকে রেখে চলে গেলাম ভাসিটিতে। ক্লাশ শেষে আমাদের বাংলা বিভাগের পিয়ন সুনীল বাবুর হাতে ৮০০/- টাকা দিলাম আমার বাবাকে দেয়ার জন্যে। বিহারে এসে আগামী ১লা মার্চ কদলপুরে অনুষ্ঠিতব্য ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের বার্ষিক সম্মেলনের চিঠি ও বিজ্ঞপ্তি তৈয়ার করলাম। জ্ঞানশ্রী ভাঙে সহ অতঃপর রওনা দিলাম চট্টগ্রাম শহরে, কর্তালার উদ্দেশ্যে। সেখানে আগামীকাল বংশদ্বীপ 'স্মৃতি বার্ষিক' অনুষ্ঠান। শহরে এসে হাজারীলেন গিয়ে ডঃ পঞ্চানন শ্রমণের রাউজান বাসী জামাতা অজিত বাবুকে সম্মেলনের চিঠিও বিজ্ঞপ্তি

ছাপানোর দায়িত্ব প্রদান করে, লক্ষ ও পদব্রজে কর্তলায় উপস্থিত হলাম রাত ৮টায়। হাত মুখ ধুয়ে বন্দনাদির পর স্থানীয় কিছু বিশিষ্ট দায়কের সাথে ৯টা অবধি আলাপ চললো, বড়ুাদের উৎপত্তির সূত্র সন্ধানে।

আমার মন্তব্য হলো, বর্তমান বড়ুয়ারা মগধের বৃজি বংশ উদ্ভূত বলে সকলে একই দাবী করতে পারেন না। মগধাগত বড়ুয়া ছাড়া ও আসামের সেনাপতি পদবী 'বরুয়া' বাংলার মাটি জাত 'বড়ু' এবং পরবর্তী কালে অন্যান্য সম্প্রদায় হতে ধর্মীয় ও সামাজিক ভাবে অঙ্গীভূত এই পাঁচ মেশালী রক্তের জন গোষ্ঠীই হলো বর্তমান বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজ। বললাম 'বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগীয় কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের' লেখক ছিলেন 'বড়ু চণ্ডীদাস'। তাঁর আত্মকথায় প্রকাশ পেয়েছে তিনি পূর্বে বৌদ্ধ ছিলেন, পরে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। হিন্দু সমাজের বাডুজ্যে বা বন্দোপাধ্যায় উপাধির লোকেরা 'বড়ু চণ্ডীদাসের গোত্র'।

৭/৩/৭৯ ইংরেজী, বুধবার। গতকাল সন্ধ্যায় আলোচ্য বিষয় বলছিলাম। বড়ুাদের উৎপত্তি নিয়ে। বর্তমান বড়ুাদের রক্ত এত সংকর দুষ্টতার কারণেই তাদের স্বভাব, চরিত্র, আচরণ ও চিন্তন মননে নিত্য দ্ব্যঙ্গিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এই দ্ব্যঙ্গিকতাকে প্রগতিও প্রতিক্রিয়া শীলতার দ্ব্যঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিশ্লেষণ করা চলে। যেমন- ১) বড়ুাদের মধ্যে অসহিষ্ণুতা এবং নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব এত তীব্র যে, তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নেতৃত্বের শিকার হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন গ্রাম ও পাড়ায় বসতি গড়ে তুলেছে। বৃহত্তর কোন ভৌগলিক অবস্থানে একত্রে বসবাস করতে পারেনি।

২) বড়ুাদের সব ধরনের প্রতিভা মেধা দৃষ্ট হয়, কিন্তু, কোন মেধা চরম ভাবে বিকশিত হওয়ার ক্ষমতাহীন। এ কারণেই সাহিত্যের জগতে, সংস্কৃতির জগতে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বিজ্ঞান, দর্শন বা ধর্ম সবক্ষেত্রে বড়ুাদের তাৎপর্যপূর্ণ অবদান আছে বটে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সুখ্যাতির আসন দখলে কোন প্রতিভা-ই অদ্যাবধি সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেনি।

৩) বড়ুয়ারা একদিকে আপন স্বকীয়তার প্রতি মমত্ব বোধ দেখায় খুব সহজে। আবার তা খুব সহজে বিসর্জন দিয়ে ভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতিকে ও গ্রহণ করে নেন অবলীলাক্রমে।।

৪) বড়ুয়ারা খুব সংগঠন প্রিয়, কিন্তু সাংগঠনিক নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্যের অভাবও ভীষণ ভাবে বিদ্যমান।

৭/৩/৭৯ ইংরেজী, বুধবার। আজ বাংলার বৌদ্ধ সমাজের ঊনবিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বল আলোক বর্তিকা বিনয়াচার্য ভদন্ত বংশদ্বীপ মহাস্থবিরের সাংবাৎসরিক মৃত্যু বার্ষিকী অনুষ্ঠান, তাঁর আমরণ কালের আবাসস্থল কর্তলা-বেলখাইন সঙ্ঘমালংকার বিহারে। পটিয়ার নাইখাইন গ্রামজাত এই সন্তান শ্রীলংকার পানাদুরা সঙ্ঘমোদয় পরিবেনে লঙ্কার ধর্ম সিংহ ভদন্ত উপসেন মহানায়কের ছায়া তলে বুদ্ধ বচন পাণ্ডি ত্রিপিটকের উপরে শিক্ষা প্রাপ্ত। উনাইনপুরার স্বর্ণ সন্তান প্রত্নতাত্ত্বিক জগতচন্দ্র মহাস্থবিরের চার

শিষ্য রত্ন অশ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক, আর্যপুরুষ জ্ঞানীশ্বর, বিনয়াচার্য বংশদীপ এবং কর্মবীর কৃপাশরণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী জাতীয় জাগরণের ঢেউকে বাংলার বৌদ্ধ সমাজে সম্যক ভাবে প্রতিষ্ঠা দানের প্রয়াসে- এই চার জনকে এদেশের বৌদ্ধদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন রূপী গৃহের চারটি মূল স্তম্ভের সাথেই তুলনা করতে হয়। এই চারজনের বিশাল অবদানকে বাদ দিলে সেই গৃহকে ধ্বংসস্তম্ভ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

বংশদীপ মহাস্থবির সেই চার গৃহস্তম্ভের একটি। স্মৃতি সভায় আলোচনা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছিলাম বংশদীপ মহাস্থবির জীবৎকালে ধর্ম ও সমাজকে অনেক সোনার ফসল দিয়ে আমাদের ভাণ্ড ভরিয়ে দিলেন। আর তাই প্রতি বছর অনুষ্ঠান করে করে আমরা তাঁকে স্মরণ করছি, তাঁর গুণগণনা ও কর্মাবদান আলোচনা করছি। যদি বলি বংশদীপ ভাঙে ও যদি, কেবল আপন গুরু দেবের জন্যে এভাবে বছরের মাথায় একটি মাত্র অনুষ্ঠান করে, আর কিছু না করতেন, তা হলে সেই বংশদীপকে আজকে স্মরণযোগ্য বলে আমার গ্রহণ করতে পারতাম কি? আমাদের বর্তমান আচরণেই বলে দিচ্ছে- আমাদের আগামী প্রজন্মের কাছে আমাদের মূল্যায়ণ হবে আন্তকুড়ের আবর্জনা হিসেবে। বিনয়াচার্য, ত্রিপিটকধর আচার্য বংশদীপের জীবৎকালে বা তার মহাপ্রয়াণের পর সমাজের দ্বিতীয় কোন সম্ভাবন বংশদীপের মতো জীবন ব্রত ও প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারলনা কেন, সেই রহস্য উদ্ঘাটন করে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।

৭/৩/৭৯ ইংরেজী, বুধবার। বংশদীপ মহাস্থবিরের স্মৃতি সভায় প্রিয়দর্শী ভাঙে (নাইখাইন), ধর্মসেন ভাঙে ও পূর্ণানন্দ ভাঙে, ধর্মপাল মহাস্থবির (ধর্মাকুর) নিয়ে কথা তুললেন। তাঁরা গত ফেব্রুয়ারী মাসে হোয়ারা পাড়া এক সভায় সংঘরাজ নিকায়ের বিরূপ সমালোচনা করে ধর্মপাল মহাস্থবিরের ছাপানো ভাষণটির জন্যে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। কিন্তু সেই ভাষণের কোন কপি আমাদের দেখাতে পারলেন না।

বংশদীপ মহাস্থবিরের স্মৃতি সভা শেষে সারা রাত ভর চললো নাটক। সকালে উঠে দেখলাম গতকালের ফুলে ভরা নন্দন কানন অদৃশ্য হয়ে গেছে, চারদিকে পায়খানা প্রস্রাবের গন্ধে প্রেত ভূমিতে পরিণত হয়েছে কর্তলা সঙ্করমাংসকার বিহার, বিনয়াচার্য বংশদীপের তপোবন।

পাঠক, এবার বলুন এত অনুষ্ঠান, এত আলোচনা, এত উপদেশের ফুল বুড়ির শেষ কোথায়? প্রেত ভূমিতে।

৮/৩/৭৯ ইংরেজী। কর্তলায় প্রাতঃরাশ গ্রহণের পর ভদন্ত সংঘরক্ষিত মহাস্থবিরের সাথে আসলাম চন্দনাইশ এর ফতেনগর গ্রামে এক সংঘদান অনুষ্ঠানে। গ্রামের ঘরবাড়ী দেখে মনে হলো মানুষগুলোর আর্থিক অবস্থা ভালো। কিন্তু, বিহারটির জীর্ণদশায় প্রমাণ করছে যে মনের দিক থেকে মানুষগুলো খুবই দরিদ্র। সংঘদানের

দানীয় সামগ্রী বন্টনের বেলায় ভিক্ষুদের মানসিক দৈন্যতায় প্রমাণ করলো- যেমন, মোহন্ত, তেমনই চেলো- এই দায়কগুলো।

ফতেনগর হতে জোবরায় এসে, জ্ঞানশ্রী ভাঙে সহ ধর্মীয় শিক্ষা সম্মেলনে বিশিষ্ট ভিক্ষু হিসেবে যাদের আমন্ত্রণ করতে হবে তার একটি তালিকা তৈরী করে, সহসা শয্যা গ্রহণ করলাম; সন্ধ্যা বন্দনার পর।

৯/৩/৭৯ ইংরেজী, শুক্রবার। সাড়ে চারটায় জাম্বুত হলাম জোবরা সুগত বিহারে। ডায়েরী লিখা সমাপ্ত করে জ্ঞানশ্রী ভাঙের সাথে আলাপ করলাম- মহামণ্ডল এবং মহাসভার সংবিধানকে কৃষ্টি প্রচার সংঘের সংবিধানের আলোকে টেলে সাজানোর জন্যে। ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের সংবিধানেও পরিবর্তন আনা দরকার, বিশেষ ভাবে শিক্ষা নীতিতে। ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করাতেই, সপ্তাহে একবার ধর্মশিক্ষা দিবসটিকে অভ্যাসে পরিণত করার একমাত্র উপায়। তাই মহাসভা ও মহামণ্ডলের সংবিধানে সেই আলোকে ভিক্ষু ও দায়ক নিয়ন্ত্রণের কিছু বিধি বিধান একান্ত আবশ্যিক। ধর্মীয় শিক্ষা নীতি, অনুষ্ঠানের চেয়ে অনুশীলন নির্ভর করার উপায় বের করতে হবে। অর্থাৎ গাথা বন্দনা, সূত্র, শীলনীতি, ভাবনা- এসব কেবল মুখস্ত না করে দৈনন্দিন জীবনে আচরণ চারিত্রিক ও মানসিক পরিবর্তন আনার ব্যবস্থা করতে হবে। সকালের এই আলোচনার শেষে ডার্সিটিতে ক্লাশের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে গিয়ে, পথে জানতে পারলাম ছাত্র ধর্ম-ঘটের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ।

মধ্যাহ্ন ভোজ জোবরায় গ্রহণের পর গেলাম শহরে। বহু সময় ব্যয় করে নিজের হাতে প্রফ সংশোধন সমাধার পর শিক্ষা পরিষদ সম্মেলনের চিঠি গুলো প্রেসের নিগড় হতে বের করলাম। চট্টগ্রাম শহরে কিছু চিঠি সাথে সাথে বিলি করে আসলাম শান্তিময় বিহারে। ধর্মীয় বৃত্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত কিছু কাজ সমাধা করে শুয়ে পড়লাম।

১১/৩/৭৯ ইংরেজী, রবিবার। আজ মহামণ্ডল ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের ধর্ম বৃত্তি পরীক্ষা। গহিরা শান্তিময় বিহার, বোধি বিহার, জেতবন বিহার সব- কটির পরীক্ষা কেন্দ্র বিনাজুরী শান্তিনিকেতন বিহারে। অর্থাৎ ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতি গিরিমানন্দ ভাঙের বিহারে। আমরা বড়ো নৌকায় করে সকল পরীক্ষার্থীদের নিয়ে সাড়ে বারোটায় উপস্থিত হলাম সেখানে। দেখলাম, স্থানীয় পরীক্ষার্থী বলতে গিরিমানন্দ ভাঙের কয়েকজন ভাই পো- ভাই ঝি ছাড়া আর কেহই নেই। পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবেও কোন প্রস্তুতি নেই।

গিরিমানন্দ ভাঙে আমাকে দেখা মাত্র ভীষণ উত্তেজিত হয়ে গেলেন। অভিযোগ করলেন ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের দায়িত্ব তিনি ছেড়ে দেবেন, পরিষদের বর্তমান কর্মকাণ্ডে তিনি লজ্জিত। কারণ কি, কেন তাঁর নিকট প্রশ্ন পত্রগুলো এবং পরীক্ষা কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক নির্দেশাবলী সময় মতো পাঠানো হয়নি। আমি বললাম, এ প্রশ্ন আপনার সম্পাদক ভদ্রান্ত সুমঙ্গলকে করা দরকার। কেন্দ্রের নির্দেশাবলী আমি ডাকযোগে বিলম্ব হবে বলে আপনার দায়কের মাধ্যমে পাঠায়েছি। আর পরীক্ষার প্রশ্ন

পত্র কেন্দ্রে নিয়ে আসার দায়িত্ব শীলানন্দ ভাস্করের উপর। তিনি তো আমাদের সাথেই আসলেন। বুঝতে পারলাম ভদ্র মনোদয় অন্ততঃ কয়েকদিন আগেই প্রশ্ন পত্রগুলোর আলোকে ছেলেদের পড়াতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাঁর সন্দেহ প্রজ্ঞাবংশ এভাবেই গহিরার ছেলেদের তৈরী করেছে। কাজ করতে গেলে, কাজ না করার লোকদের নিকটে কী পরিমাণ বিপদে পড়তে হয়; পাঠক! ভেবে দেখুন।

১২/৩/৭৯ ইংরেজী, সোমবার। ভোরে ঘুম থেকে উঠে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত খাতা গুলোকে ক্রমিক ভাবে ফাইল বন্ধ করি। ৫.৪৫মিঃ এ প্রিয়দর্শী ভাস্কর ও বিনয়পালকে বিদায় দিয়ে আমি শুমানমর্দন গমন করি একটি সংঘদানে অংশ গ্রহণ করতে। সেখানে জানতে পারলাম বাগোয়ানের ভিক্ষু জ্ঞানানন্দ, শুমানমর্দনে তার গ্রামের বাড়ীতে এসে বিশ্রী কিছু আচরণ করে গেছে। তিনিও চীবর ত্যাগ করার সমূহ সম্ভাবনা।

১৩/৩/৭৯ ইংরেজী, মঙ্গলবার। গতরাত ধর্মপুরে সুরেন বাবুর বাড়ীতে রাত আড়াইটা পর্যন্ত সূত্র পাঠের অনুষ্ঠান চললো। সকালে প্রাতঃরাশের পর ভিক্ষুদের মধ্যে আলোচনা হলো, ফিরিস্তীর খিলে পোমরা গ্রাম জাত ভিক্ষু করুণার অবস্থা ও খারাপ। অচিরেই সে চীবর ত্যাগ করতে পারে। এই ভিক্ষু কদলপুর পরিবাস ব্রতে আমার একদিন পরে উপসম্পদা গ্রহণ করে।

বারোটা বেজে গেল, তবুও ভিক্ষুরা মধ্যাহ্ন ভোজ শেষ করার নামটি নেই, সুরেন বাবুর বাড়ীতে। মনে দুঃখ হলো এই ভেবে যে, এসব ভিক্ষুদের হাতে সংঘরাজ নিকায়ের আদর্শ ও বৈশিষ্ট রক্ষা পাবে কি করে?

রাতে গহিরা নির্মল মেঘারের প্রথম ছেলের সোনার বিয়ের অনুষ্ঠানে সূত্র পাঠের জন্যে আমন্ত্রণ জানালো। গহিরা গ্রামে আসা অবধি বিগত ৭ বছরে এই প্রথম বার তাদের বাড়ীতে আমন্ত্রণ হলো। শান্তিময় বিহার রাস্তার পাশে শ্মশানে না করে, প্রফুল্ল মাষ্টারের পৈতৃক জমিতে প্রতিষ্ঠা করার প্রতিবাদেই তিনি শান্তিময় বিহার ত্যাগ করেছিলেন, কয়েকজন সমর্থক সহ।

১৪/৩/৭৯ ইংরেজী, বুধবার। মধ্যাহ্ন ভোজের পর গহিরা হতে কদলপুর গিয়ে পৌঁছলাম বিকেল ৩টায়। সেখানে প্রিয়দর্শী ভাস্কর, সুমঙ্গল ও সংঘরক্ষিত ভাস্কর আসলেন। চার জনে বসে রাত ১২টা পর্যন্ত বৃষ্টি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণকারী সকল ছাত্র-ছাত্রীদের নাম, বিহার ও কেন্দ্র ভিত্তিক তালিকা তৈরী করলাম পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর অনুসারে।

১৫/৩/৭৯ ইংরেজী। প্রাতঃরাশ গ্রহণের পরেই আমরা আবার কাজ শুরু করলাম। জ্ঞানশ্রী ভাস্কর বাগোয়ান নিমন্ত্রণে গেলেন। ইতিমধ্যে কদলপুর গ্রামের অমলেন্দু নামক এক ব্যক্তি এসে বিত্তদানন্দ ও তাঁর সমর্থকদের দ্বারা ভিন্ন গ্রামে সৃষ্ট অশান্তির বর্ণনা দিলেন।

বিকেলে বাগোয়ান থেকে ধর্মপ্রিয় ভাস্তে এবং শীলানন্দ ভাস্তে সহ জ্ঞানশ্রী ভাস্তে ফিরে আসলেন। কথা প্রসঙ্গে সংঘরক্ষিত ভাস্তে ধর্মপ্রিয় ভাস্তেকে সরাসরি আক্রমণ করলেন- কেন তিনি বিশুদ্ধানন্দ প্রফের সাথে ইদানিং এত আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণে জড়িত হয়ে পড়লেন।

সন্ধ্যায় কদলপুর হতে সকলে বিদায় নিয়ে আমি ও জ্ঞানশ্রী মহাস্থবীর গহিরা শান্তিময় বিহারে এলাম। রাতে মাদলের বড়ো ভাই ক্ষিতিশ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলো।

১৬/৩/৭৯ ইংরেজী, শুক্রবার। ভোর ৪টায় ঘুম থেকে উঠে সম্মেলনের চিঠি গুলো Book Post এর জন্যে প্রস্তুত করলাম। প্রাতঃরাশের আমন্ত্রণ শেষে ধর্মপুর গেলাম, জ্ঞানশ্রী ভাস্তে সহ পূর্ণজ্যোতি শ্রামণের উপসম্পদার জন্যে। তার উপসম্পদা অনুষ্ঠান শেষ করে উপস্থিত ভিক্ষু ভিক্ষুদেরকে সম্মেলনের চিঠি বিলি করলাম। বিকেলে স্ব স্ব বিহারের উদ্দেশ্যে জ্ঞানশ্রী ভাস্তে ও শীলরক্ষিত ভাস্তে সহ ধর্মপুর ত্যাগ করলাম।

১৭/৩/৭৯ ইংরেজী। ভোর ৪টায় ঘুম থেকে উঠে ধর্মীয় শিক্ষা সম্মেলনের উদ্দেশ্যে পরিষদের সহকারী সম্পাদক হিসেবে আমার বার্ষিক রিপোর্ট লিখা শুরু করি।

সকাল ৮টায় মাদলকে ডাঃ পঞ্চানন শ্রমণের বাড়ী হতে তাঁর ঔষধের আলমিরা বিহারে আনতে পাঠালাম ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের অফিসের কাজে ব্যবহারের জন্যে। আমি গেলাম হাটহাজারী হয়ে জোবরায়। সেখানে হাইদচকিয়া ও জোবরায় বিলির জন্যে সম্মেলনের চিঠি গুলো দিয়ে, গহিরা ফিরে আসলাম। বিকেলে মীরের খীলের আনন্দ আসলো ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের কাজে।

১৮/৩/৭৯ ইংরেজী, রবিবার। সকাল ৯টায় জোবরা হতে প্রীতিবাবু আসলেন, আমি লাঠিছড়ি গমনের মুখে। তিনি কিছু অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর স্মরণিকা দিলেন। সংক্ষেপে আলাপ করে লাঠিছড়ি অষ্টপরিষ্কার দানে উপস্থিত হলাম। সেখানে ধর্মদেশনা প্রসঙ্গে ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বললাম- আমরা প্রতিনিয়ত সংঘদানাদিতে যা বস্ত্র সামগ্রী পাচ্ছি- শুধু এগুলো যদি সংঘের উন্নতি করে দান করতে পারতাম- তাহলে আজকে ধর্মের উন্নতি মূলক কাজে আমরা দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী কিছু দেখাতে পারতাম।

সন্ধ্যায় বিহারে আসলেন জেতবন বিহারের দায়ক হরবিলাস বাবু, মাষ্টার প্রফুল্ল বাবুকে সাথে নিয়ে। জেতবন বিহারে আমার চলে যাওয়া প্রসঙ্গে প্রফুল্ল বাবু বললেন- আগামী বৈঠকের পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে আমার এই সিদ্ধান্ত কতটুকু কার্যকর হবে।

১৯/৩/৭৯ ইংরেজী, রাতে আড়াইটায় ঘুম থেকে উঠে ধর্মীয় শিক্ষা সম্মেলনের রিপোর্ট লেখা আবার শুরু করলাম। পাঁচটা পর্যন্ত লেখার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার লিখতে চাইলাম। কিন্তু পায়ের আঘাতের স্থানে অস্বস্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় শুয়ে শুয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনী পড়লাম।

প্রাতঃরাশের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। সেখান থেকে বিহারে এসে দেখলাম জ্ঞানশ্রী ভাঙে ও সুমঙ্গল ভাঙে আমার অপেক্ষায় বসে আছেন। তিনজনে আবার রওনা হলাম মির্জাপুর সংঘনায়কের নিকট ধর্মীয় শিক্ষা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার আমন্ত্রণ জানাতে। তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। তাঁর সাম্প্রতিক খাইল্যাণ্ড সফর এবং জ্ঞানশ্রী ভাঙকে জোবরা হতে কর্তালা স্থানান্তর প্রসঙ্গে আলাপ হলো।

২০/৩/৭৯ ইংরেজী। রাত ৩টায় ঘুম থেকে উঠলাম জোবরা সুগত বিহারে। রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক ড্রামা রক্তকরবীর সমালোচনা পড়তে চাইলাম। কিন্তু, জ্ঞানশ্রী ভাঙে সংলাপ শুরু করায় বন্ধ করতে হলো। উভয়ে সমাগত সম্মেলনে উদ্বোধনী বক্তব্য বিষয়ের উপর কিছুক্ষণ আলোচনা করলাম, আমি নোট টুকে নিলাম।

প্রাতঃরাশের পর সকাল আটটায় জোবরা হতে রওনা দিয়ে ভাঙে গেলেন কদলপুরে, আমি নেমে গেলাম শান্তিময় বিহারে। সকাল ১১টায় গহিরা হতে জোবরায় কার্পেন্টার পাঠালাম সুগত বিহারের আলমিরা গুলোকে বার্নিশ দিতে।

বিকেলে ক্ষতিশ্রমণের সাথে অলৌকিক ঋদ্ধি প্রসঙ্গে আলাপ করছিলাম। তিনটার দিকে কদলপুর হতে জ্ঞানশ্রী ভাঙের প্রেরিত দায়ক এসে নতুন বছরের উপোসথ তালিকাটি পাঠালেন ছাপবার জন্যে। দায়কটি সহ শহরে হাবিব প্রেসে গেলাম। তালিকাটি ছাপানোর ব্যবস্থা করে সর্বানন্দ ও জ্যোত্স্নার ভাই লিটনের জন্যে কিছু বই কিনে বিহারে আসলাম।

২২/৩/৭৯ ইংরেজী, বৃহস্পতিবার। বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রীড়া অনুষ্ঠানের কারণে ক্লাশ না থাকায় জোবরা গেলাম। আমার অসুস্থ জ্যেষ্ঠ মণি কিনবন্ধু বাবু সংবাদ দিলেন দেখতে যেতে। তিনি আমাকে বললেন, কেন সম্মুখের পুকুরের অংশ আমার বড়ো ভাই অমূল্যের নিকট বিক্রি করছেন না। আমার কাকাতু ভাই মানিকদার মা মারা গেলে পুত্রবৎ স্নেহে তাকে শৈশব থেকে লালন করেছিলেন, এই অপুত্রক জ্যেষ্ঠমণি। ভাই ভিঠা ও পুকুর তাকেই দান করে যাবেন। আমি সাধু বাদ জানাতে পারিনি এজন্যে যে, সামনের পুকুরে মানিকদার বাবার অংশ বিদ্যমান আছে; কিন্তু, আমার বাবার কোন অংশ না থাকায় বহবার আমাদেরকে সেই পুকুরের জল ব্যবহার করতে দেয়া হয়নি।

জোবরা সুগত বিহারে প্রাক্তন বিহারাধ্যক্ষ প্রজ্ঞানন্দ ভাঙকে লেখা রাজগুরু অগ্রবংশ মহাশ্ববিরের এক চিঠি পেলাম। তাতে, তিনি বড়ুয়া ভিক্ষুদের (বান্ধালী) সম্পর্কে খুবই খারাপ মন্তব্য করেছেন।

২৩/৩/৭৯ ইংরেজী, শুক্রবার। গতকাল থেকে প্রিয়দর্শী ভাঙকে রেখে দিয়েছি শান্তি ময় বিহারে। আজ অপরাহ্নে শ্রমণ জ্ঞানরত্ন সহ ভাঙকে পাঠালাম পশ্চিম পাড়ার খগেন্দ্র মিস্ত্রীর ছেলে নসুকে সূত্র শোনাতে। আজ কয়েকদিন যাবত সে পৈত্রিক ব্যাধি মস্তিষ্ক রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। আমাদের নতুন শ্রমণ ক্ষতিশ্রমণ এবং উষা দু'জনে

বসে জ্যোতিষ শাস্ত্র চেষ্টায় রত। তারা উভয়ে ফকির দরবেশের বেশ ভুক্ত। বৌদ্ধ ধর্মের সম্যক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করলে ও অন্ধভাব বাদীতার কারণে আমার প্রয়াস ব্যর্থ।

আজ রাতে সূত্রপাঠ করতে আসলাম আব্দুল্লাপুর কিরণ বাবুর বাড়ীতে। মহামুণির পূজ্য জিনবংশ ভাঙে ও এসেছেন। বর্তমান ভিক্ষুদের শীল-বিনয়ের প্রতি শৈথিল্যতা নিয়ে ভাঙে অনেক মূল্যবান উপদেশ আমাকে দিলেন। ভাঙের জীবনাচার আমাকে যথেষ্ট প্রেরণা যোগায়।

২৪/৩/৭৯ ইংরেজী, শনিবার। কিরণ বড়য়ার বাড়ীতে সংঘদান উপলক্ষে ফতেনগর হতে সারানন্দ ভাঙেও এসেছেন। আমি গহিরা জেতবন বিহারে স্থানান্তরিত হওয়ার কথা শুনে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তাঁর শ্রমণ শাসনানন্দকে আমার সাথে রাখতে। আজ রাতে শান্তিময় বিহারে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলো। বহু আলোচনা, সমালোচনার পর আমার অন্যান্য সমস্যার সমাধান সহ ক্ষেমেশকে আমার নিকটে ক্ষমা চাইতে জোর চাপ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আসলে ইহা আমার ভাগ্য শুধু নহে, সমাজের মূল চরিত্রই এমন হয়ে গেছে। বড় যাদের এই জটিল সমাজ চরিত্রে ত্যাগের মূল্যায়ন দূরূহ বিষয়। কে কাকে কিভাবে ঘোয়েল করেছে বুঝাই মুশ্কিল।

২৫/৩/৭৯ ইংরেজী, রবিবার। আজ সকাল ৯টায় দীর্ঘ একটি বছর পর কৃষ্ণজীবন বড়য়ার তৃতীয় সন্তান ক্ষেমেশ আমার নিকট তার কৃত অপরাধের ক্ষমা চাইতে আসল। চাপে পড়ে তার এই ক্ষমা প্রার্থনা আমার প্রতি তার বিদ্বেষকে দ্বিগুণই করেছে কেবল। কিন্তু, আমি তো তার এই ক্ষমা চাওয়ার মুখাপেক্ষী নহে, ইহা প্রফুল্ল বাবুর ইচ্ছা মাত্র। ক্ষেমেশের প্রতি আমার মৈত্রী অক্ষুণ্ণ থাকবে।

বিহ্বলঃ- পরবর্তী কালে এই ক্ষেমেশ মরণাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হলো শুনে আমি দেখতে গেছি। তাকে বেকার অবস্থা হতে টেনে আমার উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় প্রধান শিক্ষক হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছি। তার প্রতি আমার এই সহানুভূতি মূলতঃ শ্রামণ জ্ঞানরত্নকে আমার শ্রীলংকায় অবস্থান কালে শিক্ষা সহায়তা দানের কৃতজ্ঞতা বোধ জাত।

২৬/৩/৭৯ ইংরেজী, সোমবার। সকালে জেতবনারামের শ্রমণ আসলো জানতে, কখন আমি তাদের বিহারে যাব। আমি সমীরণ ও প্রফুল্ল বাবুকে পাঠালাম তড়িৎ বাবুদের সাথে কথা বলে আসতে।

২৭/৩/৭৯ ইংরেজী, মঙ্গলবার। আজ প্রফুল্ল বাবুদের প্রস্তাব দিলাম, পেছনের ডোবার মাছগুলো ধরে সামনের পুকুরে ফেলে দিতে। তারা আমার প্রস্তাব মতো কাজ করলেন। মধ্যাহ্ন ভোজের পর চিঠি তৈরী করলাম, দৈনিক সংবাদ পত্রে আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা সম্মেলনের সংবাদ প্রচারণার জন্যে। সন্ধ্যায় দরিদ্র সন্তান নসুকে তার রোগ মুক্তি কামনায় সূত্রপাঠ করতে গেলাম।

২৮/৩/৭৯ ইংরেজী, বুধবার। বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা হলো প্রজ্ঞানন্দ ভাঙের সাথে। তিনি আমাকে নিয়ে প্রথমে গেলেন পালি ডিপার্টমেন্টে। সেখান থেকে গেলেন এডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং- এ মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটের জন্যে। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় হয়ে যাওয়ায় আমি সংলগ্ন কেন্দ্রিনে বসে সাথে নেয়া ভাত খেয়ে নিলাম, তিনি কিছুই খেলেন না।

বিশ্ববিদ্যালয় হতে গেলাম শহরে; হাবিব প্রেস হতে উপোসথ তালিকা গুলোর অবস্থা দেখতে। আন্দরকিন্মা হতে কয়েকটি বই কিনে ফিরে এলাম বিহারে, সন্ধ্যা ৬টায়। সামান্য বিশ্রাম নিয়ে, বের হলাম গ্রামে সম্মেলনের জন্যে কয়েকটা মেছল লাইট সংগ্রহ করতে। শারিরীক ভীষণ দুর্বলতা নিয়ে শয্যা গ্রহণ করতে গিয়ে মশারী খাটানো পর্যন্ত হলো না।

২৯/৩/৭৯ ইংরেজী, বৃহস্পতিবার। সাড়ে চারটায় ঘুম থেকে উঠলাম। কিছু মানসিক অস্থিরতা এত বেশী যে, হাতে বই নিয়েও পুনঃ সেল্ফ- এ রেখে দিলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ শেষে উপোসথ তালিকা আনতে যেতে হলো শহরে। বুদ্ধ মন্দিরে গেলাম শীলাচার ভাঙেকে সম্মেলনের আমন্ত্রণ জানাতে। তিনি আমাকে জানাল যে, সাধক মুণিন্দ্রজী এখন মহাসী সেয়াড কে নিয়ে সমগ্র ইউরোপ পরিভ্রমণ করছেন।

৩০/৩/৭৯ ইংরেজী শুক্রবার। সারানন্দ ভাঙে ফতেনগর হতে এসে পৌঁছলেন, সাথে সাথে বিমলজ্যোতি ও প্রজ্ঞাতিষ্য সহ আমরা নৌকায় রওনা দিলাম কদলপুরের উদ্দেশ্যে। সকাল ৮টায় নৌকা ছাড়ল। ১১টায় পৌঁছে গেলাম পশ্চিম আধার মানিক। নৌকার উপরেই মধ্যাহ্ন ভোজ গ্রহণ করলাম সকলে। স্রিয়দর্শী ভাঙের বিহার হতে পাটি, বাগিশ কিছু নিয়ে পুনঃ রওনা দিয়ে কদলপুরে পৌঁছলাম বিকাল ৩টায়। সামান্য বিশ্রাম নিয়ে রাতের সাধারণ সভা ও সম্মেলনের প্রস্তুতিতে লেগে গেলাম। রাত ৮টায় শুরু হলো সাধারণ সভায় উত্থাপনযোগ্য বিষয় নির্বাচনী বৈঠক। তারপর রাত ১২টা পর্যন্ত চললো নির্বাচনীর সাধারণ সভার বৈঠক।

৩১/৩/৭৯ ইংরেজী, শনিবার। ভোর ৪টা ৩০মিঃ উঠে গেলাম ঘুম হতে। যথারীতি যোগ ব্যায়াম, ভাবনায় ৫.৩০মিঃ পর্যন্ত গত করে মাইকে সূত্রপাঠ করলাম কিছুক্ষণ। প্রাতঃকৃত্য বন্দনার পর প্রাতঃরাশ গ্রহণ করলাম। অতঃপর বসে গেলাম, বৃত্তি বিতরণী সভার কর্মসূচী তৈরী ও অঞ্চল ভিত্তিক প্রতিনিধি রিপোর্ট গ্রহণ পর্ব শুরু করার কাজে।

বিকাল ২টায় আরম্ভ হলো সংঘরাজ ভিক্ষু মহামণ্ডলের বিশেষ সাধারণ সভা। এ সভায় ব্যাপক ভাবে আলোচিত হলো মাথের দলের ষড়যন্ত্র মূলক আচরণে বিভিন্ন গ্রামে সৃষ্ট সামাজিক অস্থিরতা। তাদের এই হীন আচরণে আজ বেতাগী গ্রাম ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মাথের দলের অপপ্রয়াস বন্ধের জন্যে ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদে আরো অধিক সংখ্যক গৃহী-কর্মীর সমাবেশ ঘটানোর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সন্ধ্যায় এবং রাতে আমরা কয়েকজনে বৃত্তি প্রাপ্ত পরীক্ষার্থী এবং উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের সনদপত্রগুলো লিখে ফেললাম। এবং অঞ্চল ও বিহার ভিত্তিক প্রতিনিধিদের রিপোর্ট সংগ্রহ পর্ব শেষ করলাম।

১/৪/৭৯ ইংরেজী, রবিবার। সকালে শান্ত বাবুর বাড়ীতে প্রাতঃরাশ গ্রহণ করে ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিনিধি রিপোর্ট পর্যালোচনা ও প্রস্তাব পাশ এর সভা শুরু হলো। সাথে সাথে কয়েক জনের উপর দায়িত্ব দেয়া হলো তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষার্থীদের নিকট থেকে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করতে।

বিকাল ৩টায় বৃত্তি বিতরণী সভা শুরু হলো। মাত্র দেড় হাজার টাকা বৃত্তি বিতরণ করলাম। নানা বক্তার আলোচনায় বিকেল ৫টায় সভা শেষ হলো। রাতে আমিও সুমঙ্গল ভাঙে বসে সারা বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব চূড়ান্ত করলাম।

২/৪/৭৯ ইংরেজী। কদলপুরে প্রাতঃরাশ গ্রহণের পর ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের নব গঠিত কার্য-নির্বাহী কমিটির সভ্যগণের উপর কিছুক্ষণ পর্যালোচনা করলাম। সকাল ৯টায় রওনা দিলাম সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী নৌকায় বোঝাই করে। বিকাল ৩টায় পৌঁছে গেলাম গহিরা। সন্ধ্যায় মাষ্টার প্রফুল্ল বাবুর সাথে ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা হলো অনেক্ষণ।

৩/৪/৭৯ ইংরেজী। ভার্শিটিতে ক্লাশ শেষে বাংলা বিভাগীয় সেমিনার কক্ষে গিয়ে রবীন্দ্র নাথের 'রক্ত কবরী' নাটকটি পড়লাম কিছুক্ষণ। আজকে বাংলা ফাইনাল ইয়ার এর ছাত্রগণ সিদ্ধান্ত নিলেন শিক্ষা সফরে যাবেন। এই শিক্ষা সফরে কোন ধরনের শিক্ষা নেয়া হয়, তা জানার কৌতুহলে আমিও সম্মতি দিলাম সাথে যাওয়ার। বিকাল ২টায় বিহারে এসে সামান্য বিশ্রামের পর রাত ১০টা পর্যন্ত শরত রচনাবলীর প্রীকান্ত পর্ব পাঠ করলাম।

৪/৪/৭৯ ইংরেজী, বুধবার। ভার্শিটিতে রওনা দেয়ার মুখে শির যন্ত্রনা শুরু হলে, আর গেলাম না। বিকেলে গহিরা জেতবনারামে জ্ঞানশ্রী ভাঙে সহ যেতে হলো; সেখানে নব উপসম্পন্ন ভিক্ষু পূর্ণজ্যোতিকে বিহারাধ্যক্ষের দায়িত্ব ভার প্রদানের জন্যে। দায়কদেরকে আমার আগমনের অন্তরায় ব্যাখ্যা দিয়ে তাদেরকে ভিক্ষু পূর্ণজ্যোতি সম্পর্কে নানা ভাবে আশ্বস্ত করলাম। নতুন উপসম্পন্ন বিধায় তারা প্রথমে গ্রহণে অনিচ্ছুক হলেও শেষে তারা আমার সার্বিক সহায়তার আশ্বাস পেয়ে গ্রহণ করতে সম্মত হলেন। গহিরা জেতবন বৈঠকে জানতে পারলাম জুলফিকার আলী ভুট্টোকে আজ জিয়াউল হক ফাঁসি দিল।

বিদ্রূপঃ এই পূর্ণজ্যোতিকে প্রব্রজ্যা দিলাম আমার হাতে। গহিরা জেতবনারামে দিলাম আমার পরিবর্তে। আর সেই পূর্ণজ্যোতি আমাকে শ্রীমান, রাখালের মতো চূড়ান্ত অপদস্ত করলো। আমার প্রয়াত অপুত্রক জেঠীমাও আমার জন্মদাত্রী মায়ের প্রদত্ত তাদের স্মৃতি রক্ষার অর্থ সহ মোট পাঁচ লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকায় পূর্ণজ্যোতি নিজের

নামে হলদিয়া জমি কিনে নিল, আমার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে। তাদের আশীর্বাদেই আজ আমি মহা অরণ্যে বুদ্ধের ধর্মরসের আনন্দন প্রস্তুতি নিচ্ছি।

৫/৪/৭৯ ইংরেজী। গহিরা জেতবনে ভোর পাঁচটায় জাগ্রত হয়ে জ্ঞানশ্রী ভাস্তে হতে ৫,৩২০ টাকা গ্রহণ করলাম, তাঁর একাউন্টে জমা দেয়ার জন্যে। প্রাতঃরাশের পর ভাসিটিতে গেলাম। ক্লাশ শেষে বিহারে ফিরে এসে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস হতে নোট টুকে নিলাম। বিকেলে বিদ্যাসাগর চরিত্র সমালোচনা গ্রন্থ পাঠ করলাম।

৮/৪/৭৯ ইংরেজী, রবিবার। ধর্মপুরে এক সংঘদানে গেলাম। মহামুণি মহানন্দ সংঘরাজ বিহারের অধ্যক্ষ ভদ্র জিনবংশ মহাথেরো সংঘদান শেষে ভিক্ষুদের নিয়ে কিছুক্ষণ ধর্মালোচনার আয়োজন করলেন- কাল ভোজন, আকাল ভোজনের উপর। সন্ধ্যায় শান্তিময় বিহারে আমার কাকাতু ভাই শান্তি এসে জানাল যে জ্যেষ্ঠমুণি খুবই অসুস্থ তিনি আপনাকে দেখতে ইচ্ছুক। আমি সংঘদানের সামগ্রী নিয়ে জোবরা রওনা দিলাম। রাতে সূত্রপাঠ শোনলাম জ্যেষ্ঠমুণিকে।

১১/৪/৭৯ ইংরেজী, বুধবার। অপরাহ্নে ভিক্ষু পূর্ণজ্যোতির সাথে আমাদের ভবিষ্যত জীবন এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু আলোচনা করলাম।

১২/৪/৭৯ ইংরেজী, বৃহস্পতিবার। রাত ২টায় ঘুম থেকে উঠে টেকচাঁদ ঠাকুরের ব্যবহৃত ভাষা সম্পর্কে বঙ্কিম চন্দ্রের অভিমত গুলোর নোট করলাম। ভাসিটিতে ক্লাশ শেষে, শিক্ষক সম্মেলন কক্ষে এসে আমরা শেষ বর্ষের ছাত্রদের শিক্ষা সফরের তারিখ নির্ধারণ হলো। বিকেলে আমার বিহারে সংঘরক্ষিত ভাস্তের সাথে সংঘরাজ নিকায়ের ভবিষ্যত, পার্ভত্য চট্টগ্রামের অস্থির পরিস্থিতি এবং দেশের রাজনৈতিক সংকট নিয়ে অনেক কথা হলো।

১৩/৪/৭৯ ইংরেজী। ভোরে নিদানের জন্যে কিছু S.S.C পরীক্ষার ধর্মীয় নোট তৈরীর কাজে হাত দিলাম।

ভাসিটিতে ক্লাশ শেষে একাডেমিক সেকশন হতে আমার জন্যে পুরণো প্রশ্নপত্র সংগ্রহের জন্যে গেলাম। বিহারে এসে প্রথম চৌধুরীর ছোট গল্প পাঠ শুরু করলাম। আজকে আমার বিহারে বিড়ালটি দু'টি বাচ্চা দিয়েছে।

১৪/৪/৭৯ ইংরেজী, শনিবার। আজকে বাংলা বছরের শেষ দিন। অনেক মানুষের আনাগোনা, সমাবেশ হলো বিহারে; সারাদিন ভর পূজা আর পঞ্চশীল গ্রহণে। রাতে মাদলের জন্যে একটি ভাষণ লিখে দিলাম তাদের স্কুল অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে।

১৫/৪/৭৯ ইংরেজী, রবিবার। আজ বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন। শুভ নববর্ষ। স্বাগতম নববর্ষ। আমরা বড়ো আকারে বুদ্ধ পূজার আয়োজন করলাম। উপোসথ শীল গ্রহণ করলো অনেকেই। শান্তিময় বিহারের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলো সকাল বেলা। তারা আমাকে জানালেন যে, আমার ব্যক্তিগত খরচের জন্যে তারা মাসে টাকা ৬০/- নির্ধারণ করেছেন; এবং সভার পক্ষ হতে আগামী বছরের জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন। সন্ধ্যা প্রদীপ পূজার সমাবেশে আমি সকলকে আমাদের আগামী বৈশাখী

পূর্ণিমা উদযাপনী কর্মসূচি ঘোষনা দিলাম। এবং শুভ নববর্ষে সকলে মঙ্গল কামনায় সমাপ্ত করলাম নববর্ষের স্বাগত আলোচনা সভা।

১৬/৪/৭৯ ইংরেজী, সোমবার। লাঠিছড়ি সংঘদানে গেলাম। সেখানে জ্ঞানপ্রী ভাণ্ডের নিকট জানতে পারলাম কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোকের কারণে ধর্মপ্রিয় ভাণ্ডে ও শীলরক্ষিত ভাণ্ডের মধ্যে ভীষণ ভুল বুঝাবুঝির অবতারণা হয়েছে।

১৭/৪/৭৯ ইংরেজী, মঙ্গলবার। ভার্গবী হতে আসার পর ডাঃ ভবতোষের বোন শেফালীকা কে বললাম তাদের 'উপোসথিক সমিতির' মিটিং আহ্বান করতে। আজকে ভার্গবীতে জানতে পারলাম আমাদের শিক্ষা সফরের কর্মসূচি রাজশাহী, খুলনা, যশোর, পরিবর্তন করে কেবলমাত্র কক্সবাজার ভ্রমণে পর্যবসিত হয়েছে। এই বার্তায় মনটা দমে গেল। তারপরও যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম রামকোট্টে গিয়ে গুরু ভাণ্ডেকে বন্দনা করে আসতে পারবো। সন্ধ্যায় উপোসথিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। তাদের সাথে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো- আগামী বৈশাখী পূর্ণিমায় ভিক্টু-সীমা প্রতিষ্ঠা, ২৮ বুদ্ধ পূজা এবং সংঘদান অনুষ্ঠানের বাজেট নির্ধারণ বিষয়ে। রাতে প্রফুল্ল বাবুর সাথে উপোসথিক পরিষদের আলোচ্য বিষয় নিয়ে পুনঃ আলোচনা হলো।

১৯/৪/৭৯ ইংরেজী, বৃহস্পতিবার। ভার্গবীতে ক্লাশ শেষে জোবরায়ে গেলাম। বিমলজ্যোতি ও পূর্ণজ্যোতিকে নিয়ে আলোচনা করলাম আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক পশ্চাতপদতা দূর করতে হলে, যুব ভিক্টুদের অবশ্যই খ্রিস্টান মিশনারীদের ন্যায় কাজ করতে হবে। আজ রাতে প্রব্রজ্যা দিলাম আমার কাকাতু ভাই সত্য- কে, আমার জ্যেষ্ঠ মণির সপ্তাহিক ক্রিয়া উপলক্ষে।

২০/৪/৭৯ ইংরেজী, শুক্রবার। আজ সকালেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে আমার অপুত্রক জ্যেষ্ঠমণির উদ্দেশ্যে সংঘদান। (আমি আজকে সকালে কক্সবাজার যাবো এজন্যেই কি সকালের আয়োজন? তাহলে বলতে হবে জ্যেষ্ঠমণির উদ্দেশ্যে আমার কারণেই সপ্তাহিক ক্রিয়া হচ্ছে তিন দিনে)। আমার জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণ কিনবন্ধু বাবার ভাইদের মধ্যে তৃতীয়। আমার বাবার স্থান চতুর্থ। প্রথম জন জগবন্ধ, দ্বিতীয় জন দীনবন্ধ, তৃতীয় জন কৃষ্ণবন্ধু, চতুর্থজন আমার পিতা যতীন্দ্র, পঞ্চম জন বিন্দুলাল, ষষ্ঠ জন শীলব্রত। এক সন্তানের জনক হয়ে সর্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা শীলব্রত (শিক্ষক) বহু আগেই কালগত হয়েছেন। এখন জ্যেষ্ঠমণি কৃষ্ণবন্ধু কালগত হওয়ার পর ছয় ভাইয়ের মধ্যে বেঁচে রইলেন আমার বাবা ও কাকা বিন্দুলাল। জ্যেষ্ঠমণি কৃষ্ণবন্ধুর সংঘদান সমাপ্ত করে সকাল ৭টায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে আমরা রওনা দিলাম এম,এ, শেষ পর্ব বাংলা বিভাগের আবাসিক ছাত্রগণ। নিউমার্কেট হতে শহরবাসী ছাত্র-ছাত্রীরা উঠলো। আমার মধ্যাহ্ন ভোজের কোন ব্যবস্থা সাথে না থাকায় চন্দনাইশ বাগিছা হাট হতে বন্ধু মুজিবুল হক খসরু রুটি ও মাংস আনলেন। বললেন ইহা গো মাংস। বহুদিন পর ভিক্টু জীবনে এই প্রথম গোমাংস খেলাম। সাথী গোপাল ভৌমিক এতে অসন্তুষ্ট হলেন, আর সারা বিকেল ও রাতে পেটের অবস্থা বেসামান্য হয়ে পড়লো মাত্র ৩/৪

টুকরো গোমাংসে। আমরা বেলা দেড়টায় কক্সবাজার পৌঁছে গেলাম বিকেল ৪টা পর্যন্ত কেবল সমুদ্র তীরে ঘুরাঘুরি হতো সাথীদের মধ্যাহ্ন ভোজের পর। এই শিক্ষা সফরের পরিচালনায় আছেন ডঃ হুমায়ুন কবীর। আর তিনিই একমাত্র শিক্ষক এই শিক্ষা সফরে। রাচী নামে এক ছোট বোর্ডিং এর পুরোটাই দখল করা হলো রাত্রিবাসে।

২১/৪/৭৯ ইংরেজী, শনিবার। গতরাত ঘুমাতে পারিনি বার বার জলবৎ বাহ্য ক্রিয়ার কারণে। ভয় পেয়েছিলাম ডাইরিয়া হলো কি-না। তারপর ও যথারীতি ডায়েরী লিখা ও বন্দনা পর্ব সেরে ক্ষুধা ও দুর্বলতা দূর করতে কিছু খেয়ে নিলাম গতরাতে তাদের দেয়া মিষ্টি, কলা, রুটি হতে। তারপর সোলায়মান সহ বেরিয়ে পড়লাম সমুদ্র সৈকত ভ্রমণে। ছাত্র-ছাত্রী সকলেই স্নান করলো সাগরের লোনাঙ্গলে উদ্ভাসে মাতোয়ারা হয়ে। আমার সাথে কাপড় নেই বলে কেবল ঘুরে ঘুরেই সময় কাটালাম। স্নান করে সবাই যখন বোর্ডিং- এ আসলো তখন মহসীন, মাহবুব, সাবের, জলি (খুরশীদা), হারুন সহ অন্যান্য ধরে বসলো আমার দৈনিক ধর্মীয় জীবনাচার এবং জীবনের লক্ষ্য কি জানতে। তাদের কৌতুহল জেগেছে দুপুরে ও রাতে তাদের সাথে খাইনি, সাথে থেকে ও তাদের ন্যায় আমোদ, উদ্ভাসে দূরে থাকছি বলে। বিকেল ৪টায় ছবি তুলতে আবার সকলে সমুদ্র সৈকতে গেল। সেখান থেকে সাড়ে চারটায় রওনা দিল চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে। বললাম, রামুতে অনেক দর্শনীয় স্থান আছে। নিয়ে গেলাম লামার পাড়া বুদ্ধ বিহারে। এত অপূর্ব কাঠের কারু শিল্প এবং বিশালাকার বুদ্ধ মূর্তি দেখে সকলেই রামু আগমন সার্থক জ্ঞান করলো। জাহানারা এবং শামশু ভাবে তন্ময়, আমাদের শিক্ষক ডঃ হুমায়ুন রশীদ সহ বেশ কিছু ছাত্র- বুদ্ধ সরণৎ গচ্ছামি ধ্বনি দিতে দিতে প্রবেশ করলেন বড়ো বুদ্ধের মন্দিরে। রামু হতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত হাসি সহ অন্যেরা সারা পথ গান গেয়ে গেয়ে আমাদের সবাইকে আনন্দ দান করলো। রাত ১২টায় গহিরা শান্তিময় বিহারে পৌঁছলাম। সত্যিই মনের মধ্যে জেগে রইল বিদায়ের এক বিষাদময় ভাব। পাঠক, এই সফর, শিক্ষা সফর নহে। নানা দেশ-গ্রামের নানা মায়ের সন্তান বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সাথে পড়লাম, পরীক্ষা শেষে সকলকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে জীবন-জীবিকার যুদ্ধে, দৈবাৎ যদি কোনদিন কারো সাথে দেখা মিলে। তাই, এমন একটি মুক্ত, একান্ত স্মৃতির আয়োজন।

২২/৪/৭৯ ইংরেজী, রবিবার। সারাদিন ভর কেবল বিশ্রামেই কাটালাম, কিছু করার ইচ্ছাও নেই। তারপরও বিকেল বেলা জ্ঞানশ্রী ভাঙে নিয়ে গেলেন জোবরায়ে- ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদ নিয়ে কিছু আলাপ আলোচনা করতে। কিন্তু, সক্ষ্যাগত না হতেই শয্যা গ্রহণ করতে হলো অতিশয় ক্লান্তিতে।

২৩/৪/৭৯ ইংরেজী, সোমবার। ভোর সাড়ে তিনটায় ঘুম থেকে উঠে ১৯৮০ ইংরেজী (১৩৮৬ বাংলার) ধর্মীয় বৃত্তি পরীক্ষার সিলেবাস তৈরীর কাজে হাত দিলাম। মধ্যাহ্ন ভোজের পর জ্ঞানশ্রী ভাঙে সহ গেলাম শহরে। ভাঙের পাসপোর্ট করার জন্যে ছবি

তোলার পরে, অস্তিকা প্রেসের মালিক সত্যপ্রসন্ন বাবুর সাথে দেখা করতে গেলাম। আমরা চাইলাম তাঁর প্রকাশিত অস্তিকা ত্রৈমাসিক পত্রিকায় আমাদের মহামণ্ডল ও ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের কার্যক্রম নিয়মিত ছাপলে আমরা পত্রিকাটির বিক্রিতে সহযোগীতা দেব। কিন্তু, আর্থিক কারণে পত্রিকা প্রকাশনা তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন জানান। শহর হতে ফেরার পথে কিছু হাইস্কুলের পাঠ্য বই কিনলাম, আমার বিহারের পাশে জেলে পাড়ার সুরেন্দ্র জলদাসের ছেলেকে দান করতে।

২৪/৪/৭৯ ইংরেজী, মঙ্গলবার। জোবরা সুগত বিহারে ভোর ৪টায় ঘুম থেকে উঠে কিছুক্ষণ পড়লাম। প্রাতঃরাশের পর জ্ঞানশ্রী ভাস্কের আলমিরায় রক্ষিত আমার সমস্ত বই বের করলাম। তারপর সারানন্দ ভাস্কেকে নিয়ে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে। মুগাঙ্ক ডাক্তারের নিকট ভাস্কের চক্ষু পরীক্ষা করলাম।

বিকালে জোবরা হতে যখন গহিরা আসলাম, পথের মাঝে গুনতে পেলাম হৃদয়ন মারা গেছে নিজের চালিত গাড়ী এক্সিডেন্ট করে। কয়েকজন বোন আর মা এই হৃদয়নের রোজগারের উপর একান্ত নির্ভরশীল। মায়ের একমাত্র পুত্র হৃদয়ন! কি হবে তারপর! বিহারের ও গ্রামের যে কোন সার্বজনীন কাজে নিবেদিতা প্রাণ- প্রাচুর্যে ভরা এই হৃদয়নের মা। সেই মা-কে কখনো কি খুঁজে পাবো আর?

২৫/৪/৭৯ ইংরেজী। সারাদিন বিহারে কাটলাম। আগামী বৈশাখী পূর্ণিমার প্রস্তুতিতে শিশুদের গাথা শিখালাম বিকেলে।

২৬/৪/৭৯ ইংরেজী, বৃহস্পতিবার। সারানন্দ ভাস্কেকে নিয়ে সকালে গেলাম চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে। সেখানে ভাস্কের চোখের চশমা পরিবর্তনের কাজ করে, মধ্যাহ্ন ভোজ গ্রহণ করলাম বিনাজুরী শাশান বিহারের দায়ক ডাঃ ইন্দ্রনাথ বড়ুয়ার বাসায়। জীবনে এই প্রথম ১০০/- টাকায় একটি সুটকেচ ক্রয় করলাম, আন্দরকিন্ধ্যা হতে।

২৭/৪/৭৯ ইংরেজী, শুক্রবার। আজ হৃদয়নের সপ্তাহিক ক্রিয়ার সংঘদান। দান অনুষ্ঠান শেষে আমার বিহারে উপস্থিত ভিক্ষু সঙ্ঘের সম্মুখে আমি সমালোচনা করলাম, কিছু যুবক ভিক্ষুর বিনয় নীতি বিরুদ্ধ আচরণ সম্পর্কে। আমার এই সমালোচনায় জ্ঞানজ্যোতি ও সুভাচার ভিক্ষুর মুখ ভার হয়ে গেল।

২৮/৪/৭৯ ইংরেজী, শনিবার। আজকে শান্তিময় বিহারের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলো- আমার প্রস্তাবিত ভিক্ষু-সীমা প্রতিষ্ঠা, অষ্টবিংশতী বুদ্ধপূজা, সংঘদান এবং বৈশাখী পূর্ণিমা উদযাপন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে। কিছু সংখ্যক লোকের বিরোধী ভূমিকা সত্ত্বেও সকলে ঐক্যমত পোষণ করলেন।

২/৫/৭৯ ইংরেজী, বুধবার। শান্তিময় বিহারে ভিক্ষু সীমা প্রতিষ্ঠার জন্যে নির্বাচিত স্থান হতে একটি নারিকেল চারা অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার কাজে ব্যস্ত আছি, এমন সময়ে বিনাজুরী হতে সুমঙ্গল ভাস্কো আসলেন তাঁর অসুস্থ সাধু মা-কে দেখতে। তাঁকে নিয়ে

ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের নতুন কমিটিতে মনোনীত সভ্যগণের নিকট অবগতি পত্র পোষ্ট করার ব্যবস্থা করলাম।

৪/৫/৭৯ ইংরেজী। আজ হৃদয়নের বাড়ীতে আমন্ত্রণে গিয়ে পুত্র হারা, আশ্রয়হীন মা-কে বললাম সংসারে প্রত্যেকেই স্ব স্ব কর্মের অধীন। সুখ-দুঃখ স্বীয় কর্মেরই সৃষ্ট ফল। কিন্তু, অজ্ঞানতার কারণে, আসক্তির বন্ধনে অন্ধ বলে আমরা এই অতি সত্যটি দেখতে পাইনা, বুঝতেও চাই না। তাই আমরা নিজের সুখের দুঃখের জন্যে অপরকে দায়ী করি এবং নিজের সুখের জন্যে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকি। আজ আপনারা হৃদয়ের উপর আপনাদের সুখের জন্যে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন বলেই, তার মৃত্যুতে নিজেকে এত অসহায় ভাবছেন। আপনার এই অসহায় অনুভূতি নিজের জ্ঞান বুদ্ধিকে শুধু লুপ্ত করে দিচ্ছেনা সাথে সাথে শারিরীক শক্তি ও মানসিক ইচ্ছা শক্তিকে পর্যন্ত পঙ্গু করে দিচ্ছে। আপনার মানসিক এই অবস্থা অবশ্যই দূর করতে হবে। এই মুহূর্তে আপনাকে দেখতে হবে আপনার চারপাশে আপনার চেয়েও অসহায়, দুর্বল যারা আছে তাদের কে। সেই তুলনায় আপনি বহু সুখীও সৌভাগ্যবান এই ভাবনা অবিরাম মনে ধারণ করতে হবে। হৃদয়নের স্মৃতি মনে জাগলেই ভাববেন, সে আমার ইচ্ছাধীন নয় বলেই মরণ তাকে নিয়ে যেতে পেরেছে। হৃদয়ন যতদিন রোজগারের উপযুক্ত ছিলনা ততদিন আমি কিভাবে এই সংসার একা রক্ষা করেছি? এখনো তো আমার দু'হাত পা অক্ষম হয়ে যায়নি। অতএব, আবার আমাকে জীবন যুদ্ধে পূর্বের ন্যায় অবতীর্ণ হতেই হবে। এই যুদ্ধের জন্যেই আমার জন্ম। সংসারে আমাকে কেন্দ্র করে যত সমস্যা- সব সমস্যার সমাধান আমার দ্বারা সম্ভব বলেই- তা আমার কাছে এসেছে, এই বিশ্বাস নিয়ে আপনাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে নব উদ্যমে। জানবেন, জীবনে কোন প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়না। আপনি এই চেষ্টা করতে করতে যদি মরেও যান তাতেও মহালাভ। অনাগত জন্মে এই প্রচেষ্টা আপনাকে করবে সৌভাগ্যবান। আর সেই সৌভাগ্য আসবে যদি আপনি সকল প্রকারের অন্যায় বর্জন করে, শীল সংযত পথে থেকে, জীবনে বাঁচার সংগ্রামে রত থাকেন। শীল সংযত জীবন আপাতঃ কষ্ট দায়ক মনে হলেও ক্রমে অভ্যাসে পরিণত হলে তার তুল্য সুখ, তার মতো শান্তি ও নিরাপত্তা স্বীয় মাতা-পিতা, পুত্র-কন্যা, বন্ধু-বান্ধব, কেহই দিতে পারে না। আমার এই দেশনায় মনে হলো তিনি অনেকটা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

৭/৫/৭৯ ইংরেজী, রবিবার। জোবরায় গিয়েছিলাম প্রীতিভূষণ চৌধুরীর বাড়ীর নিমন্ত্রণে। আমার শ্রমণ জ্ঞানত্বের ভাই গিরিশ চোখের জল ফেলে আমাকে তার বর্তমান দুঃখ দুর্দশার কথা বুঝালো। সে এই মুহূর্তেই বাড়ী ছাড়তে চায়। আমি তার মানসিক অবস্থান বুঝে শান্তনা দানের জন্যে সাথে করে গহিরা নিয়ে আসলাম। বিহারে এসে গুরু ভাস্কর এক চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন, শ্রীলংকা হতে তাঁর জাপানী বন্ধু ভিন্সু তাকাসীমা তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন শ্রীলংকায় বেড়াতে যেতে।

সাথে আমাকেও যেতে হবে। অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী হতেও একটি চিঠি পেলাম, তাদের আগামী রোববারের সভায় যোগদান করতে।

৯/৫/৭৯ ইংরেজী, মঙ্গলবার। বিকেলে শান্তিময় বিহার উপোসথিক সমিতির মিটিং ডাকলাম। সীমা প্রতিষ্ঠায় তাদের সংগৃহীত ফাণ্ডের টাকা দান করার প্রস্তাব দিলে সকলে সাধুবাদের সাথে সম্মতি দান করলেন। অনুষ্ঠান দিবসে কাজের দায়িত্ব ভাগ করে দিলাম সকলকে। শান্তিময় বিহারে অষ্টশীল ব্রত গ্রহণকারী এই মহিলা গুলোর আনুগত্য শীলতায় আমার মনে মাঝে মাঝে মনে প্রশ্ন জাগে- বিহার পরিচালনা কমিটির লোকগুলো যদি উপোসথিকদের মতো নিয়মিত বিহার ও ভিক্ষুর সান্নিধ্য লাভ করতেন- তাদের দিয়ে অসাধ্য সাধন করা সম্ভব হতো, ভিক্ষু-শ্রমণেরা ও ধর্মতঃ সুখে রক্ষিত হতো। ১২/৫/৭৯ ইংরেজী, শনিবার। গতরাত ভর কঠোর পরিশ্রম করে অষ্টবিংশতি বুদ্ধ পূজার আসন ও পূজা সজ্জার কাজ সম্পন্ন হলো। আজ আশাতীত ভিক্ষু সংঘের উপস্থিতিতে (২৬ জুন) সম্পন্ন হলো সংঘদান, ভিক্ষু সীমা প্রতিষ্ঠা। গহিরা শান্তিময় বিহারে দ্বিতীয় বারের মতো ৪র্থ সংঘরাজ বরজ্জান মহাথেরোর স্মৃতি বার্ষিকী উদযাপিত হলো। প্রথম বার হয়েছিল কৃষ্ণজীবন বড়ুয়া এবং আমার উদ্যোগে। এই স্মৃতি সভায় শিশুদের গাথা-বন্দনা আবৃত্তির এবং পুরস্কার বিতরণীর ব্যবস্থা ও সভার সৌন্দর্য বর্ধনে সহায়ক হলো। শান্তিময় বিহারে এই প্রথম বারের মতো ২৮ বুদ্ধের পূজা অনুষ্ঠিত হলো রামকোটে আমার গুরুদেবের অনুকরণে। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে যোগদানকারী বিশিষ্ট ভিক্ষুদের মধ্যে ভদন্ত শান্তপদ মহাথেরো, গিরিমানন্দ মহাথেরো, জ্ঞানশ্রী মহাথেরো, প্রিয়দর্শী থেরো, কোণান্যে থেরো, শীলরক্ষিত থেরো, সুমঙ্গল থেরো, বুদ্ধরক্ষিত থেরো, বিনয়পাল, সাগর ও রতনপ্রিয় ভিক্ষু বৃন্দ। রাতে ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের মিটিং- এ, প্রশান্ত মাষ্টার, নৃপেন্দ্র বিজয় এবং প্রফুল্ল বাবু উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় ভদন্ত সুমঙ্গল থেরো তাঁর সম্পাদকের দায়িত্ব ত্যাগ করেন সকলের অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করে।

১৪/৫/৭৯ ইংরেজী, সোমবার। গুরু ভাঙে বলেছিলেন তাঁর একজন সেবক দরকার। ভাবলাম জ্ঞানরত্নের ভাই গিরিশকে সেখানেই দিয়ে আসি। কারণ ইদানিং তারা দু'ভাই রেখেছি, এই নিয়ে কিছু সমালোচনা কানে এলো। আজ মধ্যাহ্ন ভোজ শেষে তাই গিরিশকে নিয়ে রামু রামকোটের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। চট্টগ্রাম শহর হতে তার জন্যে দু'টি পেন্ট শার্ট ক্রয় করে বহু কষ্টে কক্সবাজারের বাসে উঠলাম। রাত সাড়ে আটটা বেজে গেল রামকোটে পৌঁছতে।

১৫/৫/৭৯ ইংরেজী, মঙ্গলবার। সারাদিন রামকোট বনাশ্রমে গুরুভাঙের সান্নিধ্যে আছি। বর্ণনা দিয়ে চলেছেন তিনি শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন পুণ্য তীর্থের। অতি সম্প্রতি শ্রীলংকা ঘুরে আসা এই ভ্রমণ অভিজ্ঞতার সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হলো কলম্বো মহানগরীর উপকণ্ঠে স্থিত মহারাগমা ভিক্ষু ট্রেনিং সেন্টারের কথা। ভাঙে বললেন, এই আদর্শ শিক্ষা কেন্দ্রে তোমাকে অচিরেই চলে যেতে হবে, আমি সব ব্যবস্থা

করেছি। আমি বললাম, বর্তমানে আমার কোথাও যাওয়া সম্ভব নহে, অন্য কোন জনকে পাঠিয়ে দেন। কেন? বললাম এই মুহূর্তে দেশে এমন কোন যুব ভিক্ষু নেই যিনি আমার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। সকলেই তো চীবর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন সংঘরাজ নিকায় হতে। অপর দিকে মাথের নিকায় সর্ব্বাসী রূপ নিচ্ছে দ্রুতগতিতে। এমতাবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদ, মহামণ্ডল, হেমেন্দু বাবুকে প্রস্তাবিত ভিক্ষু শিক্ষা কেন্দ্র, এগুলোর হাল ধরবে কে?

১৬/৫/৭৯ ইংরেজী, বুধবার। ভাঙে আজকেও সারাদিন চেষ্টা করলেন আমাকে রাজি করাতে। পারলেন না আমাকে শ্রীলংকায় গমনে রাজি করতে। আমি বার বার বলছি যে, সকল নব্য শিক্ষিত ভিক্ষুরা দেশে কোন কাজ খুঁজে পাচ্ছেন না, বিদেশের সোনার হরিণ পেতে উদ্ধীবি, আপনি তাদেরই উদ্ধুদ্ধ করুন। আমার অনেক করণীয় পড়ে আছে দেশে। আসলে কি? জিনসেনদের (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জ্যোতিষ বড়ুয়া) মতো একই পরিণতি আমার ঘটবে, এই ছিল আমার গুরু ভণ্ডের একমাত্র উৎকর্ষার কারণ।

১৭/৫/৭৯ ইংরেজী, বৃহস্পতিবার। প্রাতঃরাশের পর গুরু ভাঙে আমাকে সরাসরি বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার সামনে নরকের মরণ গর্ত হা করে আছে। নারী জাতি তোমাকে অচিরেই গ্রাস করবে। ভাঙের এই উক্তি সত্যি সত্যি আমিও শংকিত। কারণ, ইতিমধ্যে তেমন কিছু লক্ষণ ও দেখতে পাচ্ছি, আমার নিজের মধ্যে। আমার দেশে রওনা দেয়ার সময় উপস্থিত। গুরু ভাঙের মনে আশ্বাস দানের চেষ্টা করলাম। রামকোটের সখাতুক বুদ্ধ বিঘের পদতলে পড়ে আকুল প্রার্থনা জানালাম, এই প্রব্রজ্যা জীবন হতে যেন কিছুতেই আমার চ্যুতি না ঘটে। গুরু ভাঙে, আমার সাথে কথা বন্ধ করে দরজা বন্ধ করে কক্ষে ঢুকে থাকলেন। ভাঙের এই আচরণ আমার নিকট একটু অতি বাড়াবাড়ি মনে হলো। ভাবলাম, এতদিন তো টিকে আছি। আর আমি তো অদ্যাবধি কোন মহিলার সাথে কোন হীন সম্পর্ক গড়ে তুলিনি। বরং যারা চীবর ত্যাগ করে যাচ্ছে, যারা চীবর রেখেও দুঃশীল জীবন কাটাচ্ছে, আমি তো তাদেরকে সত্যি ঘৃণা করি। ভাঙে, আমাকে কেন বুঝতে চাইছেন না?

যাক, ভাঙে হতে বিদায় না পেয়েও আমি রওনা হলাম রামকোট হতে গহিরার উদ্দেশ্যে। গিরিশ ও দেখলাম সাথে চলে আসতে প্রস্তুত। এখানে তার ভালো লাগছে না। সে আমার সাথেই থাকবে। ভারী বিরক্ত ধরে গেল তার আচরণে। কি করে বুঝাবো যে গহিরায় তাকে নিয়ে বিপাকে পড়েছি? ভারাক্রান্ত মনকে সহজ করতে রামু সীমা বিহারে উপস্থিত হলাম। সত্যপ্রিয় ভাঙেকে আলাপ প্রসঙ্গে জানালাম বর্তমানে বেতাগী গ্রামকে মাথের দলে টেনে নিয়ে সৃষ্ট সামাজিক পরিস্থিতি। অপরদিকে শান্তপদ এবং সংঘনায়কের সাথে মাথের নিকায়ের বসুমিত্র ভিক্ষুও প্রিয়ানন্দ মহাশ্ববিরের খুব মাখামাখিতে আমাদের সংঘরাজ নিকায়ের বিরূপ প্রতিক্রিয়া,

ধর্মীয় শিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে মহামণ্ডলের ভিক্ষু দায়কের গণ জাগরণ প্রয়াস; এসব অনেক প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম। সত্যপ্রিয় ভাঙে ও একমত। তিনি বললেন, বিত্তদ্বানন্দ মহাথেরো কৃষ্টি প্রচারের ঘাঁটি করার জোর চেষ্টি চালাচ্ছেন রামু ও কল্পবাজার অঞ্চলে। এখানে অধ্যাপক অরবিন্দকে দিয়ে আমাকে কোনঠাসা করে রাখার ব্যবস্থা করতে চাচ্ছে। এখন কি-বা করবো, আমাদের মাথা যারা, তারা তো সকলেই মাথের দলে আত্ম বিসর্জন দিচ্ছেন। শান্তপদ, জ্যোতিপাল মহাস্থবিরগণতো বহু পূর্বেই গেছেন, এখন সংঘনায়কের মাথাও খারাপ করে ফেলেছেন। বসুমিত্র তো আমার গুরু আমার গুরু বলে বলে, থাইল্যান্ডের দান-দক্ষিণার লোভে ফেলে দিয়েছে সংঘনায়ককে। সে-তো মাথের দলের গুপ্তচর।

১৮/৫/৭৯ ইংরেজী, শুক্রবার। সকালে ও দুপুরে দু'টি সংঘদানে যোগদান করলাম; এবং বিকেলে মুৎসুদ্দি পাড়া বাদলের শব-সংকার শেষে ধর্মপ্রিয় ভাঙে, গহিরার জিনানন্দ ভাঙে ও বোধিপাল শ্রমণদের সাথে রওনা দিলাম কদলপুরে। পথে ধর্মপ্রিয় ভাঙের সাথে আলাপ হলো সংঘরাজ নিকায়ের প্রতি বিত্তদ্বানন্দ মহাথেরোর সৃষ্ট হমকির মোকাবেলার উপায় নিয়ে। রাতে কদলপুরে জ্ঞানশ্রী ভাঙে ও একই সমস্যা নিয়ে কথা বললেন অনেক্ষণ।

১৮/৫/৭৯ ইংরেজী শনিবার। বিকেলে জ্ঞানশ্রী ভাঙেকে প্রস্তাব করলাম; মাথের নিকায়ের সাথে সংঘাতে লিপ্ত না হয়ে, বিত্তদ্বানন্দ মহাথেরোদের সাথে কি আমরা আলোচনায় বসতে পারি না? স্বজাতীয় এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত তো আমাদের আত্মশক্তি ক্ষয়েরই নামান্তর। সমস্ত শুভ চেতনার উপরেই তো আঘাত আসছে সবচেয়ে বেশী। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপায় কি বের করা যায় না? আমার এই বক্তব্যের উত্তরে ভাঙে বললেন, ছদ্মবেশী ভিক্ষুদের সাথে বুদ্ধের সম্পর্ক কেমন ছিল, তা উদান গ্রন্থের 'উপোসথ সূত্রের' মধ্যে দেখ। সন্ধ্যায় আমাকে ও বিভূতি বাবুকে নিয়ে জ্ঞানশ্রী ভাঙে কদলপুর বিহারে আয় ব্যায়ের হিসাবে বসলেন। বুঝালেন তাঁর একমাসকাল ভারতে অবস্থানকালে কি পরিমাণ খরচ বরাদ্দ করলে চলবে।

২০/৫/৭৯ ইংরেজী, রবিবার। সকালে প্রাতঃরাশের পর জ্ঞানশ্রী ভাঙে এবং পঞ্চানন শ্রমণের সাথে প্রয়োজনীয় আলাপের পর জিনানন্দ ভাঙে এবং পঞ্চানন শ্রমণকে নিয়ে গহিরা আসলাম। মধ্যাহ্ন ভোজের পর জিনানন্দ ভাঙেকে রাজ্যমাটির উদ্দেশ্যে বিদায় দিয়ে, আমিও পঞ্চানন শ্রমণ সস্তারঘাট বাজারে ডাঃ পঞ্চানন শ্রমণের ডিসপেনসারীর সমস্ত আসবাব পত্র গহিরা শান্তিময় বিহারে নিয়ে আসলাম। আলমিরাতে আমার সমস্ত বইগুলো রাখলাম।

২১/৫/৭৯ ইংরেজী। আজ মধ্যাহ্ন ভোজের পর পরমানন্দ বাবুর সাথে বর্তমান বিহার কমিটির নিষ্ক্রিয়তা এবং বিহারে যাওয়া আসার রাস্তার সমস্যা নিয়ে কিছু কথা

বললাম। সাক্ষ্য বন্দনার পর রণধীর সহ কয়েক জনকে নিয়ে বিহারের হল ঘর হতে গেইট পর্যন্ত ফুটপাথ টি কংক্রিট ঢালাই এর কাজ শুরু করলাম।

২৩/৫/৭৯ ইংরেজী, বুধবার। সকালের প্রাতঃরাশ গ্রহণের পর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গেলাম আমার ছোটবোন কণিকার ছেলে বিটনের পায়ের টিউমার অপারেশনের জন্যে।

২৪/৫/৭৯ ইংরেজী, বৃহস্পতিবার। রাত আড়াইটায় ঘুম থেকে উঠে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত পড়লাম। সাড়ে ৫টা পর্যন্ত বিহারের ফুটপাথের কাজ করে স্নান করলাম। প্রাতঃরাশের পর রণধীর ও ধর্মপ্রিয় সহ কয়েকজনকে নিয়ে রাস্তার পাশে ব্রিক ফিল্ডে গেলাম ভান্সা ইন্টার টুকরা সংগ্রহে। বিকেলে পলাশ আসলো। তার H.S.C পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন বিষয়ে আলাপ হলো।

২৬/৫/৭৯ ইংরেজী, শনিবার। গতরাত দাদা জয়মঙ্গলের বড়ো কন্যা মলিনার বিয়ে উপলক্ষ্যে সূত্রপাঠ হলো। আজকে তাদের বাড়ীতে মধ্যাহ্ন ভোজ শেষে সারাদিন বিহারে বিশ্রাম নিলাম।

২৮/৫/৭৯ ইংরেজী, সোমবার। এক বাড়ীতে প্রাতঃরাশ গ্রহণে গিয়েছিলাম। সংবাদ গেল জ্ঞানশ্রী ভাঙে বিহারে আমার অপেক্ষায় বসে আছেন। সংক্ষিপ্ত ভাবে অনুষ্ঠান শেষ করে আসলাম বিহারে। তিনি আমাকে সুরঙ্গা বন বিহারের কিছু দলিল হাতে দিলেন ফটো কপি করে রাখতে। তারপর ব্যাংক এর পাস বই দিলেন তাঁর অনুপস্থিতিতে টাকা জমা দেয়ার জন্যে। পরামর্শ দিলেন জিনবংশ ভাঙের শিষ্য কোণাগ্যো ভাঙের সাথে যোগাযোগ করতে, জোবরা সুগত বিহারের অধ্যক্ষ হিসেবে থাকার জন্যে।

২৯/৫/৭৯ ইংরেজী, মঙ্গলবার। প্রাতঃরাশের পরে রওনা হলাম চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে। ভাগিনা বিটনের অপারেশনের কাজ সমাপ্ত করে কুমিল্লার উদ্দেশ্যে কদমতলী পৌঁছলাম। রোড এক্সিডেন্ট- এ মারা যাওয়া একটি মৃতদেহ দেখার পর রওনা দিলাম। বিকেলে কুমিল্লা বুদ্ধ মন্দিরে পৌঁছে বাবু ইন্দ্রনাথ সিংহের সাথে যোগাযোগ করলাম। জানতে চাইলাম তাঁদের প্রতিষ্ঠান রামমালা ছাত্রাবাস- এর সংবিধানটা আমাকে দেখতে দেবেন কি-না। তিনি জানালেন বস্তুতঃ তাদের কোন সংবিধান নেই; প্রয়াত মহেশ ভট্টাচার্যী মহাশয়ের প্রণীত ট্রাস্ট বোর্ডের নীতি মালার আলোকেই তাঁদের সমস্ত কার্যক্রম চালিত হয়। বৃটিশ শাসনামলে হিন্দু সম্প্রদায়ের সন্তানদেরকে জাতীয় ও স্ব-ধর্মের আদর্শে গড়ে তোলার এক মহান স্বপ্নে উজ্জ্বল হয়ে তৎকালীন প্রখ্যাত হোমিও প্যাথী চিকিৎসক মহেশ ভট্টাচার্যী মহোদয় তাঁর সমস্ত অর্থ ও বিত্ত সম্পদকে উৎসর্গীত করেছিলেন মাতা-পিতার স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত 'কুমিল্লা রামমালা ছাত্রাবাস' প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায়।

এই ছাত্রাবাসের বর্তমান অধ্যক্ষ প্রখ্যাত বিদ্যান পণ্ডিত রাশমোহন চক্রবর্তীর সাথে আলাপ করতে নিয়ে গেলেন ইন্দ্রনাথ সিংহ, জ্যোত্স্না প্রাবিত রাতে। ফুলের লতায়

সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন একটি ছোট্ট কুটিরে বাস করেন চিরকুমার এই বিদ্যান ব্যক্তিত্ব। তিনি আমাকে স্বাগত জানানেন। চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের বর্তমান অবস্থা জানতে চাইলেন খুবই আগ্রহের সাথে। বললেন, আগের সেই অবস্থা এখন আর নেই। সব কিছু পালটে যাচ্ছে দ্রুত। এই রামমালা ছাত্রাবাস এক সময় বহু কীর্তিমান সন্তানের সূতিকাগার ছিল। আমরা এখনো সরকারী বা বেসরকারী কোন দান-অনুদান গ্রহণ করিনা। মহেশ বাবুর ট্রাস্টী নীতিমালায় তা নিষিদ্ধ আছে। তাঁর প্রদত্ত সম্পদের ব্যবহার এবং তাঁর হোমিও ঔষধ ব্যবসার উপার্জন দিয়েই আমাদের চলতে হয়। এই প্রতিষ্ঠানের কোন ছাত্র, জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে যদি কিছু দান বা সাহায্য করতে চায়, শুধু তা-ই আমরা গ্রহণ করতে পারি। আগে ছাত্রদের ব্রহ্মচর্য নীতি পালনে এবং তাদের শিক্ষার তদারকিতে ও শিক্ষা দানে অনেক শিক্ষক থাকতেন। এখন ওসব নেই, শুধু মাত্র সামান্য তদারকির ব্যবস্থা আছে। এ-ই যা।

৩০/৫/৭৯ ইংরেজী, বুধবার। একটি রেইক্রেট- এ প্রাতঃ টিফিন করে ইন্দ্রনাথ বাবু সহ বিশাল রামমালা পাঠাগার এবং মহেশ মিউজিয়াম দেখলাম ঘুরে ঘুরে। স্বাধীনতার যুদ্ধে লুটপাটে ও কিস্তি এই লাইব্রেরী অক্ষত অবস্থায় আছে।

৯/৯/৭৯ ইংরেজী। আমার মতে, বিদ্যাসাগরের জীবনে মহত্তম চারিত্রিক দৃঢ়তার সাথে এই বিরাট পুরুষের মধ্যে একটু আপোষ করে চলবার মতো সহ্যশক্তি যদি থাকতো, তা হলে তিনি আরো বহু জন হিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পাতেন। তাঁর এই একমাত্র গুণের অভাব হেতু তিনি কর্ম জীবনে বহু দুঃখ ভোগ করেছেন।

* উচ্চ আদর্শের কথা বলে, কঠিন সামাজিক শাসনে বেঁধে, জীবনকে সর্বক্ষেত্রে প্রস্তুত করে পরিণত করা যায় না।

* নব জাগরণের মধ্যে শিক্ষার সংস্কারই হলো প্রথম কাজ। যা জীর্ণ, যা জীবনের অগ্রগতিকে বাহ্যত করে, তার নব রূপায়ন হলো সংস্কার। সংস্কারের উদ্দেশ্য পুরাতনের ধ্বংস নয়, তাকে যুগোপযোগী রূপদান করা।

* ধর্মহীন শিক্ষা ও রাজধানীর বিলাসময় জীবন যাত্রা কোলকাতার যুব তরুণদের উচ্ছৃঙ্খল করে তুলেছিল।

* বাঙ্গালীর নব জাগরণের একটি বিশেষ লক্ষণ ছিল ধর্মের উপরে বিজ্ঞান এবং সংস্কারের উপরে যুক্তির অধিকার।

* ঈশ্বর চন্দ্র চিন্তায় এবং কর্মে আধুনিক পন্থী, সংস্কারকামী; আবার সামাজিক আচার আচরণে রক্ষণশীল। বিচিত্র কর্ম পথে প্রবৃত্ত হবার জন্য তিনি ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করলেন না।প্রত্যক্ষ দেবতা এই মানুষের সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করলেন।

“ক্ষণিকের উচ্ছ্বাস নিবৃত্তির সঙ্গে দয়ার সম্পর্ক নেই। দীর্ঘ দিনের আত্ম ত্যাগ এবং আত্ম নিপীড়নের দাবী নিয়ে, দয়া এসে প্রকৃত পুরুষের নিকট উপস্থিত হয়। (বিদ্যাসাগরের প্রতি রবীন্দ্রনাথ)

* সাধারণ পণ্ডিত, মধ্যযুগের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, আর নব্যযুগের Humanist পণ্ডিতের মধ্যে পার্থক্যটা হলো- “মধ্যযুগীয় বা সেকালের পণ্ডিতদের চিন্তা ভাবনা ছিল ‘Theocentric’ বা ঈশ্বর ও ধর্ম কেন্দ্রিক। তাই তারা চর্চা করতেন আধ্যাত্ম বিদ্যা ও কলাটিসিজমের। কিন্তু নব্য যুগের পণ্ডিতদের চিন্তা ভাবনা ‘anthropo-centric’ বা মানব কেন্দ্রিক। আর তাদের চর্চার বিষয় হলো ক্লাসিক্যাল যুগের গ্রীক ল্যাটিন বিদ্যার পুনরুজ্জীবনে মনো নিবেশ। অর্থাৎ, ‘revival of learning’ বা প্রাচীন বিদ্যার পুনঃ চর্চার মূলে প্রেরণা ছিল Humanist আদর্শের।

* রেনেসাঁর বিখ্যাত ইতিহাস লেখক সিমন্স বলেছেন- “Men found that in classical as well as Biblical antiquity existed an ideal of human life, both moral and intellectual, by which they might profit in the present.” ক্লাসিক যুগে এমন একক জীবনাদর্শের সন্ধান মানুষ পেয়েছিল- যা অনুসরণ করে তারা বর্তমানে লাভবান হতে পারে- ‘By which they might profit in the present’- এ কথার তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। নব্যযুগের মানুষের অগ্রগতির পথে সহায় হতে পারে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, ও সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন শক্তি ও প্রেরণা; সম্ভার করতে পারে, এমন সব নীতি ও আদর্শ। Humanist পণ্ডিতেরা ক্লাসিক্যাল যুগের সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, নীতিকথা, পুরাণকথা, শিল্পশাস্ত্র সর্বক্ষেত্রে তাঁরা এই মানব মুখীন জীবন এবং ধর্মীয় আদর্শের সন্ধান পেয়েছিলেন, বিস্মৃতির সমাধি থেকে তাকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন এবং সেই গৌরবময় ঐতিহ্যে মানুষকে নতুন করে অনুপ্রাণিত করার জন্যে তার ঐকান্তিক অনুশীলনে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। এই অনুশীলনের ফলে মানুষের মনের সম্পদ, চিন্তার ঐশ্বর্য, কল্পনার মহত্ব এবং সবার উপরে মানব জীবনের মাত্রাতিরিক্ত স্বাভাবিক মূল্যায়ণ সম্বন্ধে মানুষের চেতনা জাগে।

বিদ্যাসাগরের আসল চরিত্রের আভাস দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- “বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যে তাঁহার স্ব জাতি সোদর কেহ ছিল না। এদেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়াছেন।”

এই উক্তির পর রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালী জাতির সাধারণ চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন-

“আমরা আরম্ভ করি শেষ করি না, আরম্ভ করি কাজ করি না, যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না, যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না, ভূরি পরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি, তিল পরিমাণ আত্ম ত্যাগ করিতে পারি না, আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিভৃষ্ট থাকি, যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করি না, আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি অথচ পরের ক্রটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি।”

এই চরিত্র বৈশিষ্ট্য প্রধানত মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের। বিদ্যাসাগর সেই সমাজের একজন হইয়া ও রবীন্দ্রনাথের ভাষায়- “ এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন,

কর্মহীন দান্তিক, তार्কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর খিঙ্কার ছিল। কারণ তিনি সর্ব বিষয়েই ইহার বিপরীত ছিলেন।”

শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের মেরুদণ্ড হল- “মানব জীবনের মহত্বজ্ঞান”- অর্থাৎ চার দিকের ক্ষুদ্রতার মধ্যে ও তিনি মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্বে আস্থা হারাননি কোন দিন। আর একটি কথা হল- “বর্তমানে অতৃপ্তি (প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা), ভবিষ্যত রচনা, ও নিজ আদর্শে আসক্তি এই তিনটি ... যাহা মানব জাতির মুখপত্র স্বরূপ প্রত্যেক মহাজনে দৃষ্ট হইয়াছে, বিদ্যাসাগরে তাহা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তিনি হৃদয়ে যে ছবি দেখিতেন ও অন্তরে যাহা চাহিতেন তাহার সহিত তুলনাতে বর্তমানকে এতই হীন মনে হইত যে, বর্তমানের বিষয়ে কথা উপস্থিত হইলে তিনি সহিষ্ণুতা হারাইতেন। বর্তমানের অতৃপ্তির ন্যায় ভবিষ্যত রচনার শক্তি ও তাঁহার ছিল।

“আমাদের দেশের কেন্দ্র- ধ্যানী যোগীর দল যাকে বললেন, স্থির....। আর একদল বিশ্লেষণ যুক্তি পরায়ণ দার্শনিক বললেন- কিছুই স্থির নয়। সবই ক্ষণে আসছে, ক্ষণে যাচ্ছে। বৌদ্ধদের ক্ষণিকত্ব বাদে তো স্থির সত্য বলে কিছুই দাঁড়ায় না। তাঁরা বৈনাশিকের দল। অর্থাৎ সব কিছুই প্রতিক্ষণেই হচ্ছে ও প্রতিক্ষণেই নষ্ট হচ্ছে, বিনাশ প্রাপ্ত হচ্ছে। তাঁদের মতো গতিবাদী দল জগতে আজও কোথাও জন্মাননি।”- রবীন্দ্রনাথ

“আমার বাল্যকাল থেকেই আমি গতির উপাসক, আমরা জন্মান্তরবাদী। জন্মান্তরবাদী এমন দেশের মানুষ কেন জাতি, সম্প্রদায় প্রভৃতি কৃত্রিম বাঁধনে বদ্ধ হতে চায়- তাই ভাবি। জন্ম জন্মান্তরে কত কত জাতি, কত কত ধর্ম, কত কত দেশ দেখে এসেছি; আরো কত দেখবো। তবে কেন এই সংকীর্ণতা? আমার সর্ব জাতীয়তার ও মূল এখানেই। কারণ কত দেশ, কত জাতীর মধ্য দিয়েই আমরা এসেছি ও ...ভবিষ্যতে যেতে হবে। কেউতো আমাদের পর নয়, কেউতো শত্রু নয়। ভাল করে ভেবে দেখলে এই জন্মান্তর বাদ বুদ্ধ দেবের মত সর্বজীবে মৈত্রী না হয়ে যায় না।”

১৯৮০ ইংরেজী, বিনাজুরী পরিবাস ব্রতে বিভিন্ন বক্তার ভাষণে প্রদত্ত বক্তব্য হতে ৪ ধর্মাদার মহাধেরো ৪ চট্টগ্রামী বড়ুয়া বৌদ্ধদের মধ্যে ‘প্র’ উপাধি যুক্ত নামের প্রচলন হয় এদেশে সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবিরের কয়েকবার আগমনের পর। বিভিন্ন জন তাঁরই সম্মানার্থে নিজ ছেলেদের এরূপ নামাকরণ করেন। কিন্তু বর্তমানে তা আর নাই। ‘প্র’ উপাধি এখন আর কারো ছেলেকে দেয়া হয় না।

আমার অভিমত ৪ দীর্ঘদিন আরকানী একই ধর্মালম্বী শাসকের শাসনাধীনে থাকার ফলে এদেশী বাঙ্গালী বৌদ্ধরা বিবাহাদি সামাজিক নৈকট্য এবং আচারে ব্যবহারে সাংস্কৃতিক একাত্মতা লাভের ফলেই বহু ব্যক্তি ও বংশের নামাকরণে ক্রমে আরকানী উপাধির ব্যবহার বড়ুয়াদের সম্মান, মর্যাদা ও প্রতিপত্তি প্রকাশক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

যেমন- নবাবী ও মোগল আমলে প্রচলিত বাঙ্গালী নামের সাথে- সিকদার, তালুকদার, জমাদার, হাজারী, মুৎসুদ্দি, চৌধুরী, ইত্যাদি।

ডঃ রাষ্ট্রপাল : চট্টগ্রামী বাঙ্গালী বৌদ্ধরা যে মগধের (বর্তমান Bihar Province) অধিবাসী তার একটি চাক্ষুস প্রমাণ আমি দেখেছি- চট্টগ্রামীদের মধ্যে হাল চালনায় যেমন 'হেরে' 'তিতি' বলে, বিহারের লোকেরা ও অনুরূপ শব্দ ব্যবহার করে। অথচ মাঝখানে সমগ্র উত্তর বঙ্গ, পশ্চিম বঙ্গের লোকেরা বলে থাকে- 'ডানে' বায়ে' বা বায়-ডান। এর থেকেই অনুমান করা যায় যে, এই চট্টগ্রামী বৌদ্ধরা সেই মাগধী তথা বিহারী বৌদ্ধদেরই অপভ্রংশ।

আমার অভিমত : সেটাই যুক্তি যুক্ত। কারণ মানুষ তাঁর পূর্ব পুরুষের ইতিহাস যখন হারিয়ে ফেলে, তখন সে ভাষাতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক পথেই তা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করতে পারেন। এটা ঐতিহাসিক বাস্তব যে, মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত অশোক শিলালিপিই*।

নিকায় মিলন সম্পর্কে আমার অভিমত :

(১) চট্টগ্রামে নিকায় মিলন অবশ্যই বিনয় বিধান মতে হওয়া উচিত। কারণ বিনয়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনই হচ্ছে বুদ্ধের প্রতি গৌরব প্রদর্শন। বিনয় একটি সংবিধান বা বুদ্ধের ধর্মরাজ্যের শাসনতন্ত্র। বুদ্ধের শাসনে যদি কারো দ্বারা এই সংবিধান কোন কালে, কোন সময়ে লঙ্ঘিত হয়, তখন তাকে তদনুরূপ দণ্ড ভোগ অবশ্যই করতে হবে। বিনয় রূপ সংবিধানই সেই প্রায়চিত্তের নির্দেশ দেবে।

(২) 'মাথের' দলে কেউ যদি বলেন, "আমরা যদিও মহাযান মতবাদী সেই পূর্ব পুরুষের ধারাবাহিকতা (শিষ্য পরম্পরা)-র মধ্যেই আছি, তবুও ভিক্ষু নই এমন হীন অপবাদ দেয়ার যৌক্তিকতা কোথায়? সারিপুত্র, মোদগল্যায়ন, অশোক সমকালীন মোদগলী পুত্র তিষ্যরায় তো আমাদের আদি বংশধর। তাঁদের থেকেই তো পরবর্তীকালে মহাযানীরা পৃথক হলেন।

* প্রমাণ করে যে, খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক থেকেই মগধের লোকেরা বাংলার মাটিতে বসতি গড়তে শুরু করেন। এবং ক্রমে চট্টগ্রামের মাটিতে শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে সেই মগধ জনগোষ্ঠীই ছিল প্রথম ও আদি বাসিন্দা। তাই তারাই মাগধী প্রাকৃত ভাষার অদলে বর্তমান চট্টগ্রামী ভাষার জন্মদাতা। মঙ্গোল জাতীয় চাকমাদের বর্তমান ভাষা, তাই চট্টগ্রামীদের ঋণী।

এ বক্তব্যের উত্তরে বলা যায়- বর্তমান জাপানী তিব্বতী বা ভুটানী লামা মহাযানীরা ও তো সে ভাবেই পরিবর্তিত হয়েছেন। তাঁরা এখন গৃহীদের ন্যায় রীতিমতো বিয়ে সংসার করেন। এখন এই লামাদরকে কি আপনি বুদ্ধ প্রবর্তিত সেই একই ভিক্ষু সঙ্ঘের মর্যাদা দেবেন? একজন লামা যদি ভিক্ষু হতে চায়, তা হলে তাঁকে বিনয় বিধান মতে পুনঃ উপসম্পন্ন না করে কেবল- কতগুলো পাণি শ্লোক, গাথা, সূত্র, পঞ্চশীল, অষ্টশীল মুখস্থ করায়ে আমাদের মতো কাপড় পরালেই কি চলবে? ভুটানী, জাপানী- গৃহী ধর্ম গুরুদের চাইতে আমাদের পূর্ব পুরুষ মাথে, কামে বা রাউলীরা তেমন বেশী উন্নত যে ছিলেন না, একথা ইচ্ছাকৃত ভাবে ভুললে চলবে কি করে? বড়ুয়া সমাজে আরিপা পুণ্ড্রীর গোষ্ঠী আনন্দ্রা পুণ্ড্রীর গোষ্ঠী জাতীয় যে সকল গোষ্ঠীর অস্তিত্ব বিদ্যমান; এগুলো প্রমাণ করে যে, বড়ুয়া ধর্মগুরুরা এককালে গৃহী জীবন যাপন করতেন।

(৩) সেদিন বিনাজুরীতে গিরিমানন্দ ভাণ্ডের আয়োজিত পরিবাস ব্রত অনুষ্ঠানে আগত শাক্য নামে পশ্চিম আধারমানিক গ্রামের মাথের নিকায়ের এক দায়ক বললেন, “ভাণ্ডে, আমাদের পরিবার দলের পূজারী নই, আদর্শেরই পূজারী।” উপাসকটির এই সত্যোপলব্ধিকে ভিক্ষু দায়ক সকলেই যদি সম্যক অনুধাবন করতে পারতেন, তাহলে নিকায় ভেদের অভিপাণ হতে আমরা মুক্ত হতে পারতাম শুধু নয়, প্রকৃত বৌদ্ধ হওয়ার সৌভাগ্য ও অর্জন করতাম।

নিকায় মিলন সম্পর্কে মাথের নিকায়ের নায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরোর উক্তি :
“সমতট- ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ১৯৮১ ইংরেজী”

আমার কালের কিছু স্মৃতি কথা : (কলিকাতা ডঃ বেণী মাধব বড়ুয়ার বাসায়)

ডঃ বেণী বাবু বলেন- ‘ভাণ্ডেদের জন্যে চা নিয়ে এসো (জিনরতন, বঙ্গীশ ও বিশুদ্ধানন্দ)। আর শোন, এই তিনজনের জন্যে আর আমার জন্যে আনবে সত্যিকারের চা। আর ঐ দু’জনের জন্যে (ধীরানন্দ ও ধর্মাদার) আনবে দুধ ছাড়া রং চা।তারপর ঈষৎ হেসে ডঃ বড়ুয়া বললেন, আমি নিজে কিন্তু সত্যিকারের চা খাই। আমি মহাশুভির নিকায়ের লোক। আমার পিতা রামচন্দ্র তালুকদার বার্মার সংঘরাজ নিকায়ের হতে পারেন, আমি কিন্তু বাংলাদেশের প্রাচীন মহাশুভির দলেরই অনুসারী। আমার নিজের দেশের গৌরবময় প্রাচীন ধর্ম, ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে ফেলে বার্মার ধর্ম সংস্কৃতির কাছে মাথা নত করতে যাব কেন? ...স্বভাব সারল্য বলেই তিনি অপ্রিয় সত্য কথা দৃঢ় ভাবে বলে ফেলতেন।

‘সমতট’ পত্রিকার একই সংখ্যায় অন্যত্র লেখা হয়েছে- “বাংলাদেশের আবহমানকালের প্রাচীনতম ভিক্ষু সংঘের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ভিক্ষু মহাসভায় প্রায় দেড় শতাধিক ভিক্ষু শ্রমণ যোগদান করেন। (৮ম পৃঃ ৪র্থ কলাম)

আমার প্রশ্ন ও অভিমত :

- (১) সত্যিকারের চা কোনটি? 'রং চা' না দুধের চা?
- (২) বাংলাদেশের গৌরবময় প্রাচীন ধর্ম, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি- বলতে পালযুগের, না তৎপূর্ববর্তী কালের?
- (৩) আবহমান কালের প্রাচীনতম ভিক্ষু সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ভিক্ষু মহাসভা দ্বারা কোন কোন যুগ-কে আওতাভুক্ত করা হলো?

অভিমত : রামের জন্মে ষাট হাজার বছর পূর্বে ও রামায়ণ লেখা চলে, আবার ষাট হাজার বছর পরেও লেখা চলে। ভাষার অলংকার, আবেগের উচ্ছ্বাসে পুঁথি বা মহাকাব্য রচনা করা যায়। কিন্তু মহাশয়, ইতিহাস রচনা ইহাতে চলে না। ইতিহাসে সন তারিখ থাকা চাই। কারণ ইতিহাস অংক শাস্ত্রের বন্ধু, জ্যোতিষ শাস্ত্রের সহোদর। তাই ইতিহাসের সন তারিখেই বলেদেবে আপনি মহাযানের না খেরবাদের। স্মরণ থাকা দরকার যে, বাংলা-ভারতের প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্য বলতে পালবংশের রাজত্বকেই বুঝায়। আর সেই রাজত্বের শেষ হয় খৃস্টীয় এগারো শতাব্দীতে। তারপর থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রায় ৮শত বছরের ব্যবধানে বৌদ্ধ বাংলা সম্পূর্ণ অবৌদ্ধ বলে পরিণত হয়ে যায়। বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার কিয়দংশে (কুমিল্লা) বৌদ্ধ বলে যারা পরিচয় দিতেন তারা কোন শ্রেণীর বৌদ্ধ ধর্ম বিনয় জানতেন ও মানতেন তা স্মৃতি চারণকারী ভদন্ত বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরোর শৈশব কালের স্মৃতি চারণের শক্তি থাকলে, নিশ্চয় বুঝতে কষ্ট হতো না ভুটানী বিবাহিত লামা, চাকমার ক্রলী, মার্মার পুংখী এবং বড়ুয়ার রাউলী, তথা আবহমান কালের প্রাচীনতম মহাস্থবিরগণের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কতটুকু?

ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া ডক্টরেট নিয়েছিলেন অশোক শিলা লিপি গবেষণা করে। বড়ুয়া ভিক্ষুদের রং চা আর দুধের চা এর উপর গবেষণা করলে নিশ্চয় খাঁটি চা কোনটি সঠিক ভাবে বলতে পারতেন। কারণ তিনি ভদন্ত বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরোর চাইতে অনেক বেশী মেধাবী ও উদার ছিলেন। তবে একথা ঠিক যে, চট্টগ্রামী সন্তান দিল্লীর আর্থবংশ মহাথেরোর মতো, ডঃ বড়ুয়া ও ফৌর কর্মী নাপিতকে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মনে করতেন, কোন কোন সময়ে। পাঠক আশ্চর্য হবেন, দিল্লীর আর্থবংশ মহাস্থবির সমতট পত্রিকার উক্ত ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় মাননীয় বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবিরকে- 'সমগ্র বৌদ্ধ সমাজের (বিশ্বের?) একজন আধুনিক অরহত স্বরূপ'- এমন মন্তব্য করেছেন। ত্রিপিটকে অরহতের সংজ্ঞা পাওয়া যায়, আর আধুনিক অরহতের সংজ্ঞা বা পরিচয় মিলবে ডঃ প্রণব বাবুদের গবেষণা গ্রন্থে। ভূতকে ভগবান এবং ভগবানকে ভূত বানানোর বহু পাণ্ডিত্য আর ওকালতি আছে তাদের গবেষণায়।

নিকায় মিলনে বিনয়াচার্য মহাশীলবান ভদন্ত আৰ্যবংশ মহাস্থবিরের অভিমত :

বাংলার বৌদ্ধ ভিক্ষু গৃহীদের সম্যক জ্ঞান উৎপত্তির জন্যে ষষ্ঠ সঙ্গীতিকারক ত্রিপিটক পারঙ্গম ও বিশোধক মহাপূত চরিত্রের অনন্য ব্যক্তিত্ব রেক্সনে পরলোক গত ভদন্ত আৰ্যবংশ মহাস্থবির কর্তৃক ১০ই চৈত্র ২৪৯০ বুদ্ধাব্দ, ২৪শে মার্চ, ১৯৪৭ ইংরেজীতে পশ্চিম শাকপুরায় অনুষ্ঠিত সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার ৮ম বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণের মূল বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করলাম। -

১) কেন আমাদের এই প্রব্রজ্যা?

ন চ অমানিসং নিস্সায়, ন চ নিস্সায় পুণ্ণলং;

উভযেতে বিবজ্জেথ যথা ধম্মং তথা করে।

অন্ন-বস্ত্র-পানীয়াদি আমিষ পরিভোগের উদ্দেশ্যে নহে, ধনী শ্রেষ্ঠী ব্যক্তিগণের শ্রদ্ধা ভক্তি লাভের উদ্দেশ্যে ও নহে এই প্রব্রজ্যা। এই উভয়বিধ বর্জন পূর্বক যাহা সম্যক ধর্মের অনুকূল তদনুরূপ জীবন যাপনের প্রয়োজনেই এই প্রব্রজ্যা জীবন গ্রহণ।

২) তথাগত কাকে বলে ?

“যথাবাদী ভিক্ষবে! তথাগতো; তথাকারী, যথাকারী তথাগতো তথাবাদী। ইতি যথাবাদী তথাগতো তথাকারী, যথাকারী তথাগতো তথাবাদী; তন্মা তথাগতোতি বুচ্চতি। (লোক সুত্তং- ইতিবুত্তক)

ভিক্ষুগণ, তথাগত তিনি, যিনি যাহা বলেন তাহা করেন, যাহা করেন তাহাই বলেন, তদ্বৎ তিনি তথাগত নামে অভিহিত।

তাই সেই তথাগত বুদ্ধের শিষ্যদেরকেও হতে হবে কথায় ও কাজে এক। ধর্ম দেশনায় এক, নিজের জীবনাচারে অন্য; এমন চরিত্রতো কখনো বুদ্ধ শিষ্যের হইতে পারে না।

৩) তথাগত আমাদের চক্ষু সন্নিধানে যেই অতুলনীয় সুষমা আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা গ্রহণ, ধারণ ও রক্ষণে বাস্তবিক আমরা আগ্রহশীল কি? না, অতীব দুর্গন্ধ মলতুল্য তথাগত পরিত্যক্ত গর্হিত, নিতান্ত দুর্গতিপ্রদ পথে চলিতেছি; তাহা সকলেই চিন্তা করুন। আচার গোচরে, টাকা পয়সা, গুরু ভাণ্ডাদি গ্রহণ ব্যাপারে, পান-ভোজনে, ক্রয়-বিক্রয়ে, অনুরূপ সন্নিধিকরণে (রোজগারে), কুলদূষণে, আলাপে সালাপে এবাধিধ বিনয় বিরুদ্ধ বিষয় সমূহে আমরা এখন কোন নিম্ন হইতে নিম্নস্তরে উপনীত হইয়াছি, একবার ভাবিয়া দেখিবেন কি? কাক হইয়া ময়ূর বেশ ধারণ করতঃ কাকের নাচনও যদি ভুলিতে যায় এবং ময়ূরের নাচ ও নাচিতে না জানে তাহা হইলে সেই কাকের দর্শানুরূপ আমাদের ও গত্যাত্তর আছে কি?

“সাপত্তিকানাং ভিক্ষবে, ভিক্ষুনাং ধিন্নাংগতিনাং অঞ্ঞাতরা গতি পটিকজ্জিতক্কা, কত মে ষে? অপায়ে চেব তিরচ্ছান যোনি চ।”

আমরা কি এহেন অনার্যোচিত হীনতায় উপনীত হইবার জন্য বহুরূপী সাজিয়াছি?
....অন্যের কথা কি বলিব, তাঁহারা ধর্ম বিনয়ে অভিজ্ঞ ও যদি শিষ্যগণকে নিঃসয় মুক্তিকাল পর্যন্ত শিক্ষা না দিয়া, ‘নিঃসয় মুক্ত’ না করিয়া, পেটুক বৃত্তি অবলম্বন করান এবং শিষ্যগণ ও যদি শিক্ষাকামী শীলবান হইতে না চাহে, তবে তার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কী বা হইতে পারে?

কতিপয় দায়কের অনুরোধে এবং পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় আজ আমরা তিন নিকায়ের ভিক্ষু সংঘ এক নিকায় হইবার দৃঢ় সংকল্পে উপনীত হইয়াছি। তাহাতে বহু বাহ্যিক দৃষ্টি বিকৃতিও বিদ্যমান। আমরা তিন নিকায়ে মোট গৃহী জনসংখ্যা (বড়ুয়া) ৭৫,৪৯৯ জন, ভিক্ষু সংখ্যা ১৫০জন, শ্রমণ সংখ্যা (প্রায়) ৫০জন। সাধুগণ সহ সর্বমোট অনাগারিক সংখ্যা প্রায় ৩০০জন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন আমরা মাস্কাতা আমলের নীতিমত চলিব কেন, যুগোপযোগী ন্যায়েই চলা উচিত। ইহাতে যে, তাহারা সম্যক সমুদ্বের সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের উপর খরতর অস্ত্রাঘাত করিতেছেন, তাহা অসহনীয়ই বটে। বাস্তবপক্ষে তাঁহারা কেবল বুদ্ধের নাম আওড়াইয়া নিজেকে ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক অপায়ে প্রক্ষেপ করিতেছেন এবং প্রণীত রত্ন ত্রিলোকের একমাত্র শরণ রত্নত্রয়ের শত্রুতায় উপনীত হইতেছেন। বলা বাহুল্য যে, ইহাতে সমাজের কতদূর শাসনদ্রোহী ক্ষতি সূচিত হইতেছে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাহারা সদ্ধর্মের একান্ত ভক্ত, সদ্ধর্মই যাহাদের প্রাণ, কে আছেন বলুন তো- তাঁহারা রত্নদ্রোহীদের সঙ্গে কিরূপে মিলিয়া মিশিয়া সমসূত্রে কার্য করিতে পারিবেন?

দায়ক দায়িকারা যেমন ভিক্ষুদের মাতৃ পিতৃতুল্য উপকার করেন ভিক্ষুরা ততোধিক তাঁহাদের উপকার করিয়াছেন ও করিতেছেন। সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি বা শিক্ষা উন্নতির জন্যে যদি কোন ভিক্ষু বিনয় বিরুদ্ধ আচরণ করেন, তাহা হইলে সেই আচরণ ও তথাগত প্রশংসিত হইতে পারে না। তথাগত কি বলেন নাই-

অন্তান মেব পঠমং পতিরূপে নিবেসয়ে

অথৎতং মনুসাসেয্য ন কিলমেয্য পত্তিতো।

প্রথমে নিজেকে সুযোগ্য করিবে অতঃপর অন্যকে অনুশাসন করিবে, তাহা হইলে সেই পত্তিত দুঃখ পাইবে না।

তবে নিকায় ত্রয়ের মিলন? আমাদের আন্তরিক অমিল কোনদিনই নাই। আমরা পরস্পর মৈত্রী পরায়ন। বিনয়ে ধর্ম সম্বোধে ও আমিশ সম্বোধে বাঁধা আছে বলিয়াই তাহা করিনা। ভিক্ষু সংঘের শীল বিত্তজির জন্যেই নিকায় ভেদ, বাদ বিসম্বাদ করিবার জন্য নহে। সময়ে সামাজিক ভেদ-বিভেদে যে, অনৈক্য দেখা যায়, তাহা আমাদের স্ব নিকায়ে ও ঘটিয়া থাকে। আমার মনে হয় প্রতিযোগীতা আছে বলিয়া অপর নিকায় দ্বয় ও পাত্রাচীর ধারণে বর্তমানে উৎসাহিত আছে। আমাদের চালচলনে দোষ আছে বলিয়াই তাঁহাদের মধ্যেও দোষ দেখা যাইতেছে। কারণ সর্বজন নেতৃ অনুগামী।

ভগবান বলেন-

- ১) শুনুং বে তরমানানং জিমহং গচ্ছতি পুস্বো,
সক্স-গাবী জিমহং যন্তি নেন্তে জিমহে গতে সতি ।
এবমেব মনুস্‌সসু যো হোতি সেট্ঠ সম্মতো,
সো চে অধম্মং চরতি পগেব ইতরা পজা,
সক্সং রট্ঠং দুক্খং সেতি রাজা চে হোতি অধাম্মিকো ।
- ২) শুনুং বে তরমানানং উজ্জুং গচ্ছতি পুস্বো,
সক্স-গাবী উজ্জুং যন্তি নেন্তে উজ্জুং গতে সতি;
এবমেব মনুস্‌সসু যো হোতি সেট্ঠ সম্মতো,
সো চে ধম্মং চরতি পগেব ইতরা পজা,
সক্সং রট্ঠং সুখং সেতি রাজা চে হোতি ধম্মিকো ।

আমাদের অধিনায়ক স্থির করিয়া যে ভিক্ষু মহাসভা চলিতেছে তাহা আজ অষ্টম বর্ষ বয়োপ্রাপ্ত। প্রতিবছর নিয়মিত সভা আহুত হইতেছে, অনেক অভিভাষণ ও আমরা লাভ করিয়াছি.... অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপদেশ ও আমরা শুনিয়াছি। বাস্তবিকই কি আমরা সেই উপদেশানুযায়ী চলিতেছি? না-কি উপদেশ দানে পটু পালনে কাতর এই নিন্দার বোঝা মাথায় নিয়াছি। অকপ্লিয় দ্রব্য ব্যবহারে, দুষ্কাদি বিকাল পান-ভোজনে, ছাতি, জুতা, চীবরাদি ধারণে বিনয়ানুরূপ কোন পরিবর্তন ঘটয়াছে কি? না কি দুর্নীতির সংখ্যা বাড়িতেছে?

ভদন্ত গণ, আজ এই সভায় উপস্থিত প্রত্যেক ভিক্ষু প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করুন এবং নিজের নিকায় রূপ আত্মাকে সুযোগ্য রূপদান করতঃ সর্বদর্শী কারুণিকের বাক্য অমৃতানুরূপে অপর নিকায় দ্বয়কে ও একাত্ম রূপ দান করিবার জন্য দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হউন। তখন সমসূরে সকলে সানন্দে গাহিতে পারিব।

সুখা সংঘস্স সামগ্গী,

সমগ্গানং তপো সুখো ।

All India Buddhist Conferance Advisory Board- সর্ব ভারতীয় বৌদ্ধ প্রতিনিধি সম্মেলন আহ্বানের জন্যে চেষ্টা করিতেছেন।যে সেবাসদনে এই পরিকল্পনা পরিসর লাভ করিয়াছে, সেই সেবাসদনের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য সকলে আন্তরিকতার সহিত বাস্তব রূপদানে অগ্রসর হইবেন।

০৭/০১/৭৯ ইংরেজী। চন্দনাইশ থানার দক্ষিণ জোয়ারায় ভদন্ত সুবোধিরত্ন মহাস্থবিরের শবদাহ অনুষ্ঠানে সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উদ্বোধনী ভাষণে আমার বক্তব্যের মূল বিষয় সমূহ ছিল :

- ১) বুদ্ধ প্রবর্তিত ভিক্ষু সংঘের ঐতিহাসিক ধারায় সংঘরাজ নিকায় সৃষ্টির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও ইহার পরবর্তী অবদান।

২) অতীত স্মরণীয় ভিক্ষুদের অবদান- ধর্মীয় ও সামাজিক। ‘অতীত ভিক্ষুরা এখনো জীবিত, যেহেতু আমরা তাঁদের আদর্শ ধারণ করে আছি। ভবিষ্যতে আমরা মৃত যদি উত্তরসূরীদের কাছে আদর্শের বীজ বপিত করতে না পারি।

৩) “নক্খন্তং পটিমানেত্তং অথো বালং উপচ্চগা,
অন্তো অন্তস্স নক্খন্তং কিং করিস্সন্তি তারকাতি।”

আকাশের তারকার নির্দেশে যারা চলেন, তারা মুর্থতার পরিচয়ই বহন করেন। নক্ষত্র দ্বারা শুভাশুভ নির্ধারণ করতে গিয়ে দ্রুত মৃত্যুর দিকে ধাবিত জীবনে সময়ের অপচয় করা মুর্থতার নামান্তর। তোমার কৃতকর্মই তোমার নক্ষত্র অর্থাৎ শুভাশুভ কর্মের বিপাক। এস্থলে তারকার কি হাত আছে?

৪) ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে, ভিক্ষু সংঘের আদর্শ রক্ষা, দায়কের আনুকূল্যতার উপর নির্ভরশীল। বর্তমান ভিক্ষুরা প্রব্রজ্যা ত্যাগ করেছে, চাকুরী করেছে, বিনয় বিগর্হিত অপকর্মে লিপ্ত হচ্ছে- এসবের সমালোচনা করা হয়; কিন্তু, এক্ষেত্রে কোন করণীয় দায়িত্ব আছে কি-না তা চিন্তা করেন না কেহই।

৫) দুঃশীল, দুরাচারী ভিক্ষুদের লেজুড়বৃত্তি করছেন কিছু শিক্ষিত দায়ক; সেই ভিক্ষুদের থেকে কিছু প্রসাদ পাওয়ার মোহে।

বিবিধ প্রসঙ্গ :

৬) বুদ্ধ পাঁচটি সংবরের কথা বলেছেন। তা’হলো জ্ঞান সংবর, বীর্য সংবর, স্মৃতি সংবর, ইন্দ্রিয় সংবর, প্রাতিমোক্ষ সংবর।

ক) জ্ঞানসংবর (১) ৪/৫শ বা ২/৪ হাজার টাকায় মাতা পিতার শ্রাদ্ধ বা স্মৃতি মন্দির দান না করে ধর্ম ও সজ্জের হিতকল্পে সংঘ শিক্ষা কেন্দ্রে দান করা, (২) বিবাহে অনুপ্রাসন- এ মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় রোধ করে তাদের ভবিষ্যত নিরাপত্তার জন্যে সঞ্চয় তহবিল গঠন করা, (৩) বিবাহে যৌতুক প্রথা বর্জন করে যুবক-যুবতীর শিল্প ও কারিগরি জ্ঞান যাচাই করা- যা দ্বারা উৎপাদন ও অর্থাগম হবে। (৪) যুবক-যুবতীর বিলাস-ব্যসনে মিতব্যয়ী হওয়া এবং যে কোন নেশা দ্রব্য বর্জন করা, (৫) পুরুষেরা যেমন ঘরের বাইরে উৎপাদন ও অর্থকরী কর্মে ব্যস্ত; একই ভাবে মহিলারা ঘরের মধ্যে সন্তান লালনে, শিক্ষা দীক্ষায়, হস্তশিল্পে, রান্না বান্নায়, আসবাবপত্রের পরিচ্ছন্নতায়, গৃহপালিত পশুর যত্নে এবং বাড়ীর আশে পাশে ফলমূল, শাক সব্জী, ফুলের বাগান- এ সকলের পরিচর্যায় অবশ্যই ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করতে হবে। ঘরের বাইরে মাতৃজাতির চাকুরী বা জীবিকার সন্ধান অপরিহার্য নহে।

(৬) বাড়ীর আশে-পাশে ঝোপ-ঝাড়, পটা ডোবা, যত্রতত্র মল-মূত্র ত্যাগ শিশুদের অপরিচ্ছন্নতা, রান্নার ও খাদ্য পাত্রে ময়লা নোংরা অগোছাল পোশাক ও আসবাবপত্র- এ সমস্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ হতে বসত বাড়ীকে অবশ্যই মুক্ত রাখতে হবে।

(৭) অসময়ে মাইক ও বাদ্য বাজনায প্রতিবেশীর বিরক্তি উৎপাদন হতে অবশ্যই বিরত থাকা।

ঘ) বীর্য সংবর : (১) পান, তামাক, চা, নেশাদ্রব্য এসকল ক্ষুধা, নিবৃত্তির পরিপন্থী দ্রব্য ব্যবহারে অভ্যাস অবশ্যই বীর্য প্রয়োগে ত্যাগ করতে হবে, (২) ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় অপ্রস্তুত ও অসময়ে বিবাহ না করে সময়োপযোগী বিবাহ করা, (৩) ক্ষমতা থাকলেও সন্তান লালনের এবং সমস্যা বৃদ্ধির দুঃখকে লাঘব করার জন্যে মাত্রাতিরিক্ত সন্তানের জন্ম না দেয়া। (৪) ক্রোধ বা মানের বশবর্তী হয়ে হানাহানি, মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে না পড়া, (৫) কোন শিল্প বা বিদ্যা শিক্ষায় অসমাপ্ত অবস্থায় বিরত না হওয়া, (৬) উপার্জনকে ১) প্রাত্যাহিক প্রয়োজন (খাদ্য ভোজ্য), ২) সাময়িক প্রয়োজন (ঔষধ পথ্য, উৎসব, শিক্ষা, জাতীয়জন, বেশ-ভূষা), ৩) আপদকালীন প্রয়োজন (অকাল মৃত্যু বা জীবিকা শক্তি রহিত) এবং ৪) সার্বজনীন ও ধর্মীয় কল্যাণ- এভাবে চার ভাগ করে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। (৭) তাস, দাবা, জুয়া, লুডু, ক্রাম, এসকল দৈহিক ব্যায়ামহীন ক্রীড়া ত্যাগ করে শরীর চর্চা হয় এমন ক্রীড়া অনুশীলনই সর্ব মঙ্গলদায়ক, স্থান অভাবে নৃত্য, ব্যায়ামই শ্রেয়।

(৮) অশ্লীল গান, নাটক বা উপন্যাস বর্জন করে আধ্যাত্মিক ভাবমূলক গান শোনা, পবিত্র জীবন ধর্মী নাটক দর্শন, জ্ঞানমূলক উপন্যাস বা জীবনী ও বিজ্ঞান গ্রন্থ পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলা। (৯) চায়ের দোকানে বাজে আড্ডায় সময় নষ্ট না করে জাতি ধর্ম ও সমাজের কল্যাণ মূলক কাজে আত্ম নিয়োগ করা। বৌদ্ধ সমাজের শিক্ষা গুরু, ইহ পরলোকের কল্যাণ মার্গ প্রদর্শনকারী সুগত তথাগতের শিষ্যদেরকে এ সমস্ত শিক্ষা ও অনুশীলন প্রেরণাদাতা হতে হবে দায়কগণের চতুঃপ্রত্যয় পরিভোগের বিনিময়ে। ইহা মহাকরুণা যুক্ত ধর্মদানের অঙ্গ।

প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ

ভূমিকা : ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া

এদেশের হিন্দু ঐতিহাসিকগণ সমস্মরে রব তুলেছেন যত তন্ত্র মন্ত্র, যত মূর্তিপূজা ও প্রতীক উপাসনা, যত অনাচার ও ব্যভিচার সবের জন্যে দায়ী বৌদ্ধ ধর্ম। হিন্দু নিন্তে জ হল, যুদ্ধ ছেড়ে দিল, শৌর্য-বীর্য হারাল, শক, কুশান, চণ, তুর্কি কারো গতিরোধে সমর্থ হলো না শুধু বৌদ্ধ ধর্মের কারণে। ছিল ভাল চতুর্বর্ণ্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের জাতি বিভাগ ও কর্ম বিভাগ; সকল যে ওলট পালট হলো ওর ও মূলে বেদবিদ্যেবী বৌদ্ধ ধর্ম।

যত দোষ নন্দ ঘোষ। ঘর যখন ভেঙ্গে পড়ে যা-কিছু ইহার দাঁড়াবার সম্বল সবই তো ইহার পতনে সাহায্য করে। হিন্দু ঐতিহাসিক। তুমি ভ্রান্ত। দেবানং প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা অশোকের হিত কথায় এদেশের দ্বিষিজয় কমেনি, যুদ্ধ বিগ্রহ থামেনি, কুটনীতি পরিত্যক্ত হয়নি। অধিকন্তু, রাণীদের দানে প্রায় সকল স্থানে গড়ে উঠেছে বৌদ্ধ

মহাচৈত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, দানগৃহ ও বিদ্যাপীঠ, আর রাজারা ছিলেন অগ্নি হোত্রী, অশ্বমেধ, যাজ্ঞী, দিগ্বিজয়ী। মন্ত্রী ছিলেন বেদ বেদান্ত বিশারদ ও কোটিল্যের কূটনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ। জ্যোতিষী বা গণক্কার রাজ্যের ভাগ্য নিয়ন্তা। গতানুগতিকতা, চতুরঙ্গ সৈন্যের বাহ্যড়ম্বর, বেতন ভোগী সৈনিক দ্বারা যুদ্ধ, অন্তর্কলহ, সাধারণে জাতীয়তাবোধের একান্ত অভাব, এ সমস্ত হল এদেশের স্বাধীনতা হারাবার প্রকৃত কারণ।

হেলে সাপ মারবার দরকার হলেও তোমার রাজারা ডাকতেন প্রথমে গনক্কার, পরে বিরাট যজ্ঞ, হোম, পূজা ও শান্তির স্বস্তায়নের ব্যবস্থা, আর শেষে হত মহিষ মর্দ্দিনী, অসুর ঘাতিনী দশপ্রহরণ ধারিণী শক্তির উপাসনা। তুমি কিরূপে আশা করিতে পার নিরস্ত্র নিরীহ নগরের উপকণ্ঠবাসী বিদ্যাপীঠের আচার্য ও শিক্ষার্থী গণ বহিঃশত্রুর সহিত সংগ্রাম করিবে? তুমি বিদিত নও যেখানে যেখানে বৌদ্ধ কেন্দ্র ছিল সেখানে সেখানে পশুপত শৈবছিল, কেহ কিছু করিতে পারেনি। বৌদ্ধ ধর্ম এদেশে নতুন সমাজ গড়েনি, হিন্দুকে আচার ভ্রষ্ট করেনি, জাতিচ্যুত করেনি, সমাজ শৃঙ্খলা নষ্ট করেনি, রাজ্য শক্তি পরিচালনা করেনি। তোমার বেদ বেদান্ত তোমাতে চিরদিন আছে, তোমার স্মৃতি, শ্রুতি, ইতিহাস, পুরাণ, ভৃগু পরাশর তোমাতে আছে। হিন্দুর ভাব প্রবণতা, গতানুগতিকতা, ও ধর্মান্ধতা দূরীকরণের জন্য বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুদয়। বৌদ্ধ ধর্ম কলুষিত হলে এদেশ হতে লুপ্ত হয়ে যেতনা। যদি যথার্থই বৌদ্ধ ধর্ম এদেশ হতে বহিস্কৃত হয়ে থাকে, তবে বুঝতে হবে উহার ভিতরে বুজরুকি ছিলনা, ছলচাতুরী ছিলনা। ছিল সবরকমের জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনা, প্রচার ও বিস্তার, আর সভ্যতায় এশিয়ার বহুদেশ ও জাতিকে তোমার দেশের কাছে অনুগত করা। বৌদ্ধ ধর্মের দাঁড়াবার ভিত্তি ছিল সমাজ নহে, রাজ্য শাসন নহে, সংঘারাম বা শিক্ষাগার। যেদিন এসকল সংঘারাম ইসলাম পন্থী বিজয়ী তুর্কিবীর একে একে এসে ধূলিসাৎ করিলেন, উহার সব গেল- আর তিষ্ঠিতে পারিল না। বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠের একদিকে এই ধ্বংসলীলার করুণ কাহিনী মাত্র।

বৌদ্ধরা হিন্দুর সর্বনাশ সাধনের জন্য মুসলমান আক্রমণকারীকে এদেশে ডেকে এনে নিজের নাক কাটালেন ও পরের যাত্রা ভঙ্গ করিলেন, ইহা একেবারে ভূয়ো কথা। সাধুর বেশে তোমার রাজাদের অবিশ্বাসী গুপ্তচরগণ সর্বত্র চলাফেরা করিতেন- ইহা নতুন কথা নহে। রামাই পণ্ডিতের শূণ্য পুরানের শেষে ‘নিরঞ্জনের রুম্মা’ শীর্ষক যে কবিতাটি আছে তাহাই হইল তোমার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের ভিত্তি। ‘দেব নিরঞ্জন’ যে বুদ্ধ, আর ‘শূণ্য পুরাণ’ যে বৌদ্ধ গ্রন্থ তাহাই তুমি প্রমাণ করিলেনা, সাক্ষী প্রমাণ ছাড়াই তুমি স্বকল্পিত আসামীকে ফাঁসি দিয়া বসিলে।

এদেশে তথা এদেশের উপনিবেশ সমূহে বহু লেখা মালা বছরের পর বছর আবিষ্কৃত ও পঠিত হচ্ছে। তুমি স্থির চিন্তে এসকল পড়, চিন্তাকর আর বল তোমার সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত।

এদেশের জনসাধারণের মধ্যে ধর্মের ধারা কি ব্রহ্মা ও মহেশ্বর (প্রপিতা-মহেশ্বর), হরি ও হর এক, বুদ্ধ ও শিব এক, যে-ই বুদ্ধ সে-ই শিব (সোগত-মহেশ্বর)। আর সবকথা হলেও একথা সত্য নহে- বৌদ্ধ ধর্ম তোমার জাতীয়তা নষ্টের কারণ। এসকল কষ্ট কল্পনা ছেড়ে তুমি নীরবে চিন্তা কর গৃহত্যাগী ও ভিক্ষান্নে দিন যাপনকারী বৌদ্ধচার্যগণ কিরূপে এদেশে সর্বত্র জ্ঞান, বিজ্ঞান ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সংঘারাম, বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। শ্রীমান শ্রীধর বড়ুয়ার পুস্তকে লুপ্ত বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠের উজ্জ্বল স্মৃতি জাগিয়ে তোলে বলেই তাহা আমার কাছে এত প্রিয় বস্তু, আদরের সামগ্রী।

শিক্ষার প্রণালী, উদ্দেশ্য ও আদর্শ বিষয়ে বহুতথ্য বৌদ্ধ সাহিত্যে আছে। কোন প্রকারের শিক্ষা কোন শ্রেণীর শিক্ষার্থীর পক্ষে উপযোগী, শিক্ষা ক্রমিক হবে কিংবা হবে না, চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা কিরূপ হবে, মনের শিক্ষার গঠন কিরূপ হবে, চরিত্রের শিক্ষার গঠন কিরূপ হবে, বুদ্ধির শিক্ষার গঠন কিরূপ হবে, শিক্ষা কোন প্রকার জ্ঞানের অনুবর্তী হবে, কোন জাতীয় শিক্ষকের হস্তে শিক্ষার ভার ন্যস্ত হবে, পাঠ্যক্রম কিরূপ হবে, পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন কিরূপ হবে, ইত্যাদি বিষয় সম্যক আলোচিত হয়েছে। জ্ঞান ও চরিত্রের পথে এগোবার বড় রাস্তা হল আর্য অষ্টমার্গ। সকলের আগে চাই সম্যক দৃষ্টি। যাহা সম্যক তাহা স্বজ্ঞ, সরল, অপ্রান্ত লক্ষ্য ভেদী। তারপর সম্যক সংকল্প যাহা লক্ষ্যাভিমুখী, সুদৃঢ়, অটল, অচল, স্থির। এরূপ দৃষ্টি ও সংকল্প লইয়াই জ্ঞানানুগ শ্রদ্ধার পূর্ণতা। সম্যক সংকল্পের প্রকাশ সম্যক বাক্য, আজীব ও কর্মে। চিন্তা, বাক্য ও কর্মের সমতা সাধনে জীবনের গতি নিয়মিত হয়, জীবন মর্যাদা সম্পন্ন ও উন্নতিশীল হয়। প্রকৃত আত্মোৎকর্ষ সাধন করিতে সম্যক ব্যায়ামের প্রয়োজন। ব্যায়ামের অপর নাম প্রধান বা পরাক্রম- স্ব সাধ্য বস্তুর পূর্ণতা সাধনের জন্য। শুধু উপস্থিত ব্যাধি নিবারণ করিলে চলিবে না, ভাবী ব্যাধির পথ রুদ্ধ করিয়া ও কর্তব্য শেষ হল না, বর্তমান স্বাস্থ্য রক্ষা করেও নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না; আশানুরূপ স্বাস্থ্য বৃদ্ধির উপায় ও সঙ্গে সঙ্গে করে যেতে হবে। এরূপে দেহের, মনের ও চিন্তার স্বাস্থ্য বৃদ্ধির জন্যে চাই- ব্যায়াম। আহার কেবল দেহের পুষ্টির জন্যে নহে, ইন্দ্রিয়, মন, ও বিজ্ঞান সকলের পুষ্টির জন্যে উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত আহারের প্রয়োজন। পরিপুষ্টি সাধনের পক্ষে ব্যায়াম যথেষ্ট নহে, প্রয়োজন আছে সম্যক স্মৃতির। স্মৃতির অনুশীলনের পক্ষে প্রয়োজন সতত, সব সময়ে, সকল অবস্থায় জাহ্নত, সচেতন, ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে চলা। সে জন্যে চাই একাগ্রতা, মনসংযোগ, দেহ ও মনের লঘুতা, মৃদুতা, কমনীয়তা, প্রভৃতি গুণ। লক্ষিত বিষয় পেতে হলে চাই সবশেষে প্রয়োজন সম্যক সমাধি তন্ময়তা। সমাধির পর সমাধির পর সমাধি, সোপানের পর সোপান। পদে পদে অগ্রসর হয়েছে, আত্ম প্রসাদ পেয়েছে, তথাপি আছে- ‘উত্তরিতর’ আরও যাবার অধিক এগোবার। তবে তুমি উন্নতির পথের যথার্থ পথিক। জ্ঞানের উন্নতি করিতে চাও ছাড় শ্রুতি পরম্পরা, ছাড় অন্ধতা ও শাস্ত্র নির্ভরতা, ছাড় কুট তর্ক ও

বাগবিতণ্ডা, ছাড় মতামতের দেহাই। আপন বিবেক চিন্তা যুক্তির সহিত যাহা মিলে না তাহা মেনে নিও না। পরের মুখে ঝাল খেও না। বাহিরের রূপে সভ্য-ভব্যতায় মানুষের বিচার করো না। ‘মা অনুস্সাবন, মা পরম্পরায়, মা কিরিয়ায়, পিটকস্স সম্পদানেন (সম্পদায়েন), মা তক্ক হেতু, মা আকার পরিবিতক্কেন, মা দিটঠিনিজ্জান খণ্ডিয়া, মা ভব্বরূপতায়, মা সমনো নো গারু’তি। শুধু পরমত জেনে, পরের বই পড়ে, শাস্ত্র পাঠ করে, গুরু মশায়ের মুখে মুখে শুনে, কিংবা পাঁচ জন হতে খবর নিয়ে যে জানা তাহা হল মাত্রজ্ঞাত পরিজ্ঞা (জ্ঞাত পরিজ্ঞান)। ইহা জ্ঞানের চরম নয়, সূত্রপাত। দ্বিতীয় স্তরে আসা চাই তার পরিঞ্ঞায়, জ্ঞাত জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করে চেষ্টা ও ক্ষমতা। তৃতীয় স্তরে চাই পহান পরিঞ্ঞায়, (বর্জন পরিজ্ঞান), স্বজ্ঞানের দ্বারা প্রচলিত ভ্রান্ত মত সম্পূর্ণ রূপে বর্জন। ব্যঙ্গ করিয়া বলিতে গেলে, তখন মনে হবে- “অযং পন্নকো জিনো ন কিম্মি আহ,” এই জীর্ণকায় গুরু মশায় বলবার মত কিছুই বলেননি, বলিতে পারেন নি।

অপর হতে লব্ধ জ্ঞান হল শ্রুতময়ী প্রজ্ঞা। স্বচিন্তা প্রসূত জ্ঞান চিন্তাময়ী প্রজ্ঞা। স্থাপনা বুদ্ধি প্রসূত জ্ঞান ভাবনাময়ী প্রজ্ঞা। যদি প্রথম প্রকারের জ্ঞান তোমার লক্ষ্য, তাহা পাবার পছা হল এই। যদি দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান তোমার লক্ষ্য, তাহা পাবার পছা হল এই। আর যদি তৃতীয় প্রকারের জ্ঞান তোমার লক্ষ্য; তাহা পাবার পছা হল এই। তোমার যেতে হবে তিন রাস্তায়। এক এক জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ সাধন। শিক্ষার্থী সব সমান নয়। কেহ বা উগ্ঘাটিতঞ্ঞ (উদঘাটিতজ্ঞ), হা তে হাওড়া বুঝে নিতে পারে, আভাসে সব বোঝে, সংকেত মাত্র যথেষ্ট। কেহ বা বিপক্ষিতঞ্ঞ (বিপক্ষিতজ্ঞ), সামান্য ব্যাখ্যা পেলেই বুঝে নিতে পারে, অর্থের উপলব্ধি হয়। কেহ বা নেয় (নয়) পদে পদে বুঝিয়ে বুঝিয়ে, অর্থবোধ একেবারে নাই। কোরান সরিপ আবৃন্তি করে হাফিজ, মানে জিজ্ঞাসিলে হতভম্ব।

প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে উপদেশের স্বরূপ এক, ব্যাখ্যা প্রণালী এক, অপরদের পক্ষে অন্যরূপ। যে আচার্য বা শিক্ষকের উপর শিক্ষার ভার তাঁকে পঁচিশটি গুণের অধিকারী হতে হবে। তিনি (১) সদা সর্বদা ও সাবধানে অশ্বেবাসীর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করবেন, (২) অশ্বেবাসীর অভ্যাস অনভ্যাস জানবেন, (৩) শয়ন ও বিশ্রাম অবগত হবেন, (৪) সুখাসুখ জানবেন, (৫) খেতে পেল না পেল জানবেন, (৬) রুচি বিশেষত্ব বিদিত হবেন, (৭) ভূজ্য দ্রব্য উপযুক্ত ভাবে ভাগবন্টন করে দেবেন, (৮) উৎসাহ দেবেন- মা ভৈঃ তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে, (৯) ভিতরে চলে কিরূপে জানবেন, (১০) বাহিরে চলাফেরা করে কিরূপে তা-ও জানবেন, (১১) কুলোকের সহিত আলাপাদি করবে না, বলে দেবেন, (১২) দোষ দেখলে শোধরাবেন, (১৩) সাগ্রহে, (১৪) অথগ ভাবে, (১৫) নিরুপটে, (১৬) নিঃশেষে কর্তব্য পরায়ণ হবেন, (১৭) সর্ব বিদ্যায় পারদর্শী করিব এরূপ পিতৃ হৃদয় পোষণ করবেন,

(১৮) শিক্ষা বলে বলীয়ান করিব সংকল্প রাখবেন, (১৯) মৈত্রী চিন্তা জাগরুক রাখবেন, (২০) বিপদে আপদে অশ্বেবাসীকে পরিহার করবেন না ইত্যাদি।

আচার্য বিদ্যা শিক্ষার জন্য দায়ী, উপাধ্যায় চরিত্র গঠনের জন্য দায়ী। যেমন শিক্ষক ভাল, তেমন ছাত্র ও ভালো হওয়া চাই। (১) বিশ্ব প্রকৃতির সকল বস্তু, সকল জীব, ও সর্ব ঘটনা হতে জ্ঞানাহরণের ক্ষমতা থাকা চাই, (২) সমর্চ্যা, সমদর্শী গুণে গুণী হওয়া চাই। (৩) বিচার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হওয়া দরকার। (৪) বিচারে নিরপেক্ষতা, নির্ভিকতা, ঘেঘ গুণ্যতা ও অমূঢ়তা থাকা আবশ্যিক। যেমন, একদিকে পরীক্ষা, উপ-পরীক্ষা, তুলনা, গবেষণাদি গুণ, তেমন অপরদিকে উপযুক্ত ভাবে প্রকাশের শক্তি থাকা আবশ্যিক। (৫) জ্ঞান, কর্ম, ও চরিত্র একরূপে নিয়মিত হওয়া আবশ্যিক যাহাতে ব্যক্তির জীবন বিকশিত হয়।

ইন্দ্রিয় দমন অর্থে, ইন্দ্রিয় নিধন করা নহে। জাতিভেদ দূরীকরণ অর্থে জাতিবাদ বা জাতীয় বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ করা নহে। যে কোন আকারে জীবনের অভিব্যক্তি হয়। উহাকে অর্থযুক্ত করে তোলাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য।

গীতা প্রবচন :

১। স্ব ধর্মাচারণকারীকে ফল ত্যাগ করিতে হইবে।কর্ম কর আর তার ফল ছাড়। গাছে জল দিবে, দেখা শুনা করিবে কিন্তু নিজে তার ছায়ার, ফল ফুলের প্রত্যাশা রাখিবে না। ইহাই স্ব ধর্মাচরণ রূপ কর্মযোগের স্বরূপ। সেরেফ কর্ম করিলেই কর্মযোগ হইল তাহা নয়। স্ব ধর্মাচরণ রূপ কর্ম গতানুগতিক কর্ম নয়। উত্তম রূপে করিয়া তার ফল ত্যাগ করিবে একথা বলিতে সহজ, শুনিতে সহজ কিন্তু আচরণ করা কঠিন। কারণ ফল বাসনা বস্তুত কর্মের প্রেরক শক্তি বলিয়া গণ্য হইয়া গিয়াছে।

‘কর্ম কর আর ফলের আসক্তি ছাড়’- এই পৃথকীকরণ দেহ ও আত্মার পৃথকীকরণ তুল্য। স্ব ধর্মাচরণে বাহ্য ফল রূপ এই যে দেহ তাহা ত্যাগ করিতে হইবে আর চিন্তা শুদ্ধি রূপ ভিতরে যে সারভূত আত্ম তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। দেহ ভাবনা দূর করিয়া প্রত্যেক বস্তুর সার গ্রহণ করার অভ্যাস আমাদের করিতে হইবে। সর্বক্ষেত্রে দেহকে পৃথক করে আত্মার পূজা করা চাই। বাহ্য ফল কর্মের দেহ আর কর্মের ফলে যে আত্ম শুদ্ধি আসে তাহাই ঐ কর্মের আত্ম। [১৭২ পৃঃ]

২। সকাম পুরুষের কর্ম অপেক্ষা নিষ্কাম পুরুষের কর্ম অধিকতর ভালো হওয়া চাই। সকাম পুরুষ ফলাসক্ত তাই ফলের স্বপ্ন চিন্তায় তার সময় ও শক্তি অল্লাধিক ব্যয় হইয়াই যায়। পক্ষান্তরে ফলেচ্ছারহিত লোকের প্রতি মূর্ত্ত আর সমগ্র শক্তি কাজে নিয়োজিত হয়। নদীর ছুটি নাই, হাওয়ার বিরাম নাই, সূর্য অনুক্ষণ জ্বলিতেছে। তদ্রূপ নিষ্কাম কর্মী নিরন্তর সেবা কর্ম ছাড়া আর কিছু জানে না। অতএব একরূপ নিরন্তর কর্মরত পুরুষের কর্ম যদি উৎকৃষ্ট না হয় তবে হইবে কাহার? এর মধ্যে চিন্তের সমতা এক বড় নিপুন গুণ। নিষ্কাম পুরুষের তাহা পৈতৃক সম্পত্তি। [১৯ পৃঃ]

৩। কর্মযোগে ফল ত্যাগই গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। কর্মফল ত্যাগ করলে কর্মযোগী অনন্ত গুণ ফল পায়। (স্বয়ম্বর লক্ষী অসংখ্য প্রার্থীকে ফেলে মাল্য দিলেন নিরাসক্ত বিষ্ণুর গলে- 'যে চাহে না রমা হয় তারই দাসী'।)

সাংসারিক লোক অপার কর্মকরে ফল পায় অল্প। আর কর্মযোগী সামান্য মাত্র করে অনন্ত গুণ পায়। এই পার্থক্য হয় ভাবনার পার্থক্য হেতু। টলষ্টয় এক জায়গায় বলেছেন- "লোকে যীশুর ত্যাগের প্রশংসা করে। কিন্তু এই যে সাংসারিক জীব এরা প্রত্যহ কত যে রক্ত শুকায়, কত যে কঠোর শ্রম করে! দু'দুটা গাধার বোঝা পিঠে নিয়ে সংসারী জীব চক্কর কাটছে; যীশু অপেক্ষা তাদের কষ্ট কতই না বেশী, আর কতই না দুর্গতি। তার অর্ধেকও যদি তারা ভগবানের জন্যে করে তবে সত্য সত্যই তারা যীশু থেকে বড়ো হয়ে যাবে। [পৃঃ ২৭]

৪। সংসারী মানুষ ও কর্মযোগী এ দু'য়ের কর্মের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখুন। মনে করুন উভয়েই গোপালন করছেন। কর্মযোগীর দৃষ্টি গোসেবা করলে সমাজ প্রচুর দুখ পাবে। গাইকে উপলক্ষ করে মনুষ্যত্বের এবং পশু জগতের সহিত তার প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হবে। অন্যজনের ন্যায় বেতন পাবে বলে নয়। বেতন ও পাবেই। কিন্তু আনন্দ এই দিব্য ভাবনাতে। কর্মযোগীর কর্ম তাকে বিশ্বের সহিত সমরস করিয়া দেয়।

কর্মযোগী যে কর্ম করে সেই কর্মের ভাষা হতে সে দিব্য জ্ঞান লাভ করে থাকে। কর্ম ত নয় তা তাদের আধ্যাত্মশালা। তাদের সেই কর্ম উপাসনাময়, সেবাময় হয়ে যায়। বাহ্যত ব্যবহারিক, কিন্তু মূলতঃ তা আধ্যাত্মিক। বড় ভাই ছোট ভাইয়ের কাছে, মা-বাপ সম্বানদের কাছে, গুরু শিষ্যের কাছে, নেতা অনুরাগীর কাছে নিজ নিজ আচরণ দ্বারা আদর্শ স্থাপন করবে। এটা তাদের কর্তব্য। কর্মযোগী ছাড়া একাজ কে করবে? [পৃঃ ৩৩]

৫। অমুক কর্ম পরমার্থিক এরূপ মার্কা মারার দরকার নেই। কর্ম জাহির করা নিঃপ্রয়োজন। উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচারী হওত নিজ কর্মে অন্যের চেয়ে শতগুণ উৎসাহ প্রদর্শন করো। আহার কম, মিলিবে ও তিন গুণ কাম। তোমার হাত সমাজের অধিক কাজ করুক। তোমার ব্রহ্মচর্য কাজে ফুটে উঠুক। চন্দনের সুবাস ছড়িয়ে পড়ুক। [পৃঃ ৩৫]

৬। সমাজ হতে ছল দূর করা এক মস্তবড় কাজ। ছলে সমাজ ডোবে। জ্ঞানী নিত্য তৃপ্ত বলে যদি নিশ্চিন্ত বসে যায়, তবে অপরেও হাতের উপর হাত রেখে নিশ্চেষ্ট বসে যাবে। একে অন্তরে তৃপ্ত বলে শান্ত, অপরে মনে মনে হাহাকার করেও নিশ্চেষ্ট। এই অবস্থা ভয়ানক। তাই সাধু পুরুষ মাঝেই শিখরে পৌঁছে ও সাধনার আঁচল বড় সতর্কতার সাথে ধরে থাকেন। কর্ম ত্যাগ করবে। কিন্তু মনে মনে থাকবে উপোসী ও অসুখী। অতএব কর্মযোগী সাধারণ জনের ন্যায়ই কর্ম করে যায়।

৭। কাম এবং ক্রোধ- এই দুই কর্মযোগীর প্রধান শত্রু। এ চাই, ও চাই না; 'এটা নাও ওটা ছাড়' এই স্বভাবের সংস্রব ত্যাগ অবশ্যই করতে হবে। [পৃঃ ৩৫]

৮। যাহারা সার্বজনীন সেবা করছে তারা স্ব ধর্মাচরণই করছে। লোকে যেখানে গরীব ও বিপন্ন সেখানে সেবা করে তাদের সুখী করাই প্রবাহ প্রাপ্ত ধর্ম। কিন্তু সার্বজনীন সেবকদের সকলেই কর্মযোগী এরূপ মনে করা ভুল। লোক সেবা করতে গিয়ে মনে যদি শুদ্ধ ভাব না জাগে, শুদ্ধ ভাবনা না থাকে তবে সে লোকের সেবা ভয়ঙ্কর হওয়ার সম্ভাবনা আছে। নিজ আত্মীয় স্বজনের সেবা করতে গিয়ে আমরা যতটা অহংকার, যতটা ঘৃণা মৎসর, যতটা স্বার্থ আদি বিকার সৃষ্টি করি, লোক সেবার নামেও তাই করি। [পৃঃ ৩৮]

৯। তত্ত্বের সহিত মস্ত্র থাকা চাই। কেবল বাহ্য তত্ত্বের যেমন মূল্য নাই তেমনই কর্মহীন মস্ত্র ও মূল্যহীন। হাত দিয়ে যেমন, হৃদয় দিয়ে ও তেমন সেবা করা চাই। তবেই না হাত হতে খাঁটি সেবা পাওয়া যাবে। বাহ্য কর্মে হৃদয়ের আদ্রতা যদি না থাকে, তবে সেই স্ব ধর্মাচরণ শুদ্ধ থেকে যাবে। তাতে নিকামতার ফুল ও ফুটেবে না, ফল ও ধরবে না। [পৃঃ ৪০]

১০। বাইরের কর্মের সাথে মনের সংযোগের নামই বিকর্ম বা বিশেষ কর্ম। কর্মের সাথে বিকর্মের সংযোগ হলে শক্তির ক্ষুরণ হয়। উহার ক্ষুরণে কাম ক্রোধাদি জন্ম হয়ে যাবে আর তার ফলে সেই পরম জ্ঞানের উদয় হবে।

কর্মে বিকর্ম ঢাললে কর্ম যে দিব্য হয় তা দেখুন, সম্ভানের পিঠে মা হাত বুলান। মা যেমন তেমন ভাবে একবার হাত ফিরালেন আর ঐ তুচ্ছ ক্রিয়াতে মা ও সম্ভানের মনে যে ভাব কেলে গেল তার বর্ণনা করবে কে? আর এরই নাম কর্ম ও বিকর্মের সংযোগে দিব্য শক্তির ক্ষুরণ। এর অন্য নাম কর্ম ও বিকর্মের সংযোগে অকর্ম সৃষ্টি। এর অর্থ এই যে, কর্ম যে করেছে তা মনেই হয়না। কর্ম তখন বোঝা মনে হয় না। করেও অকর্তা। মেরেও তুমি মারলে না। যেমন, মা পুত্রকে মারেন। তবুও তাঁর আঁচলেই সে মুখ লুকাই। কিন্তু তুমি একবার মেরে দেখ ত! তাই বলি চিন্তা শুদ্ধি হতে কৃত কর্ম নির্লোভ হয়। অন্যথায় কর্মের কতই না বোঝা আমাদের বুদ্ধির উপর হৃদয়ের উপর চাপিত। কর্মে বিকর্ম জুড়িয়া দিন। দেখবেন যত কর্মই করেন না কেন ক্লান্তি নাই। মন তখন ধ্রুবের মতো শান্ত, স্থির ও তেজোময়। কর্মে বিকর্ম ঢালিলে উহা অকর্ম হয়ে যায়। কর্ম করে যেন তা পুনঃ মুছে ফেলা হল তেমনই লঘু ভার এর। কর্মকে বিকর্ম করা- এই যে কলা তা পাওয়া যাবে সাধুদের ব্যক্তি জীবনাভিজ্ঞাতে। লেখ্য ভাষা এক্ষেত্রে দুর্বল। [পৃঃ ৪২]

১১। নিজ ক্রটি দেখা মাত্র তাহা সংশোধন করার জন্যে ব্যস্ত হওয়া চাই। ভুল বোঝার পরও কি তা তেমনই করতে থাকবেন? যখনই নিজ ভুল আমাদের নিকট ধরা পড়বে তখনই আমাদের পুনর্জন্ম হয়। মনে করবে তা তোমার জীবনে নবীন প্রভাত। সত্য সত্যই তুমি এখন জাগ্রত হয়েছ। এখন দিন রাত পরীক্ষা কর সাবধানে চল। নতুবা আবার পা ফসকাইবে, মন্দ অভ্যাস আবার ফিরে আসবে। [পৃঃ ৯৮]

দোষ ধরা পড়লেই সে দোষ দূর করা যায়। দোষ ধরা না পড়লে প্রগতি বন্ধ হয়, বিকাশ থেমে যায়। [পৃঃ ৪৭]

১২। ছোট খাট ব্যাপারেও সজাগ থাকা চাই। জলে যে ডুবিতেছে তৃণ ও তার অবলম্বন। সংসার সাগরে আমরা ডুবিতেছি। ভাল একটু করি ত তাহাই আমাদের অবলম্বন হয়। তাহা আমাদের উদ্ধার করিবে।

১৩। গান্ধীজীর দিকে তাকাও। রোজ সুতা কাটিতেন। দৈনিক সুতা কাটার উপর তিনি জোর দিতেন। প্রতিদিন কেন? কাপড়ের জন্যে সময় সময় কাটিলে কি হয় না? কিন্তু তাহা ত ব্যবহারিক দৃষ্টি। নিত্য কাটাতে আধ্যাত্মিকতা রহিয়াছে- দেশের জন্যে আমাকে কিছু করিতে হইবে এই চিন্তা রহিয়াছে। ঐ সুতা প্রতিদিন আমাদেরকে দরিদ্র নারায়ণের সহিত যুক্ত করিতেছে। তাহা হইতে সংস্কার দৃঢ় হয়। [পৃঃ ৯৯]

১৪। একবারে ঢালিলে কর্ম সফল হইবার নয়। সতত বিন্দু বিন্দু পড়িতে থাকার নাম উপাসনা। [পৃঃ ১০০]

১৫। সকল চেষ্টার পরে যতদিন না মানুষ দেখতে পায় যে নিজ চেষ্টায় আর কুলাচ্ছে না ততদিন প্রার্থনার মাধুর্য তার কাছে ধরা পড়ে না। [পৃঃ ১৮৪]

১৬। দুঃখের মূল কারণ আলস্য। সকলে শারিরীক শ্রম করার ব্রত গ্রহণ করে তো এই দুঃখ দূর হয়ে যাবে। শ্রমে স্বাস্থ্য ভাল হয়, বুদ্ধি সতেজ, তীব্র ও শুদ্ধ হয়। [পৃঃ ১৯৩]

১৭। কোন বলদ ১৮ বছর ঘানি টেনেছে বলে সে কি যন্ত্র শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে গেল? যন্ত্র শাস্ত্রজ্ঞ এক আর ঘানির চারিদিকে ঘোরে যে বলদ সে আর এক। তদ্রূপ ১৮ বছর মাষ্টারী করে কি শিক্ষা শাস্ত্রী হওয়া যায়? ওজন, আকার, মূল্য বা সময় বিচার্য নয়। মূল্য ভাবনার। [১২২ পৃঃ]

১৮। সফ্রেটিস বলেছেন, “সদগুণকেই আমি জ্ঞান বলি।

১৯। বাহ্যত আমি কাকেও নমস্কার করি। কিন্তু এই শির নত করার সাথে যদি মনটা ও নত না হয় তবে বাহ্য ক্রিয়া নিরর্থক। [পৃঃ ৩৮]

২০। ইন্দ্রিয় সংযম সহজ নহে। এই জন্য মহান প্রাণ আবশ্যিক। জ্ঞান ও চাই। তাহলে ও সব সময় যে উহা উত্তম রূপে নিষ্পন্ন হবে তা নয়। তবে কি আশা ছাড়ব? হাল ছাড়ব? না, সাধকের কখনো নিরাশ হতে নেই। সাধক নিজের সকল কর্ম নৈপুণ্য কর্মে নিয়োগ করবে। তা অপরিপাতি হলে ভক্তি জুড়ে দেবে। এটি একটি মহামূল্য উপদেশ বলে জানবে। [পৃঃ ২৫]

২১। নিত্য পঠনীয় মন্ত্রবৎ হইলে তাহা চিন্তে রেখাপাত ত করেই না, উল্টা লয় পায়। কিন্তু এই দোষ নিত্য পাঠের নয়, মনন না করার। নিত্য পাঠের সংগে সংগে নিত্য মনন ও নিত্য আত্ম নিরীক্ষণ দরকার। [পৃঃ ২৪]

২২। স্থিত প্রাজ্ঞ বলতে স্থির বুদ্ধির লোক বুঝায়। নামেই তাহা সুস্পষ্ট। কিন্তু সংযম ছাড়া বুদ্ধি স্থির হবে কিরূপে? তাই স্থিত প্রজ্ঞাকে সংযম মূর্তি বলা হয়েছে।

বুদ্ধি আত্মনিষ্ট হতে হবে, আর অন্তর্বাহ্য ইন্দ্রিয় সমূহের হতে হবে বুদ্ধির অধীন। ইহাই সংযমের অর্থ। ইন্দ্রিয় রূপী বলদ দ্বারা তিনি নিকাম স্ব ধর্মাচরণের ক্ষেত সুন্দর রূপে আবাদ করে লন। প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাস তিনি পরমার্থে ব্যয় করেন। [পৃঃ ২৫]
২৩। নিছক নির্গুণ যেমন শূণ্য থাকে, নিরাকার সত্ত্বের অবস্থা ও তদ্রূপ হতে পারে। উপায় হচ্ছে, যে গুণীতে গুণ মূর্তিমান হয়েছে তার দর্শন। [পৃঃ ২৪]

(নির্গুণ) সাংখ্য বুদ্ধি + (সত্ত্ব) যোগবুদ্ধি + (সংস্কার) স্থিত প্রাজ্ঞ

↓
সম্পূর্ণ জীবন শাস্ত্র
ফল : মোক্ষ- নির্বাণ

বুদ্ধের উপলব্ধি জাত নির্বাণ সম্পর্কে মতামত

১। ঋনাদি ভেদে তেভুমকা ধম্মে হেট্টু পরিয়ায বসেন বিননতো সংসিদ্ধনতো বান সঙ্ঘাতায় তন্থায় নিক্খন্তস্তা বিসয়াতিব্বম বসেন অতীতস্তা নিক্খানং।

‘নির্বাণ’ ‘নি’ উপসর্গের সাথে ‘বান’ শব্দের সমাস বদ্ধতায় ‘নির্বাণ’ পদ সিদ্ধ হয়েছে। বান তৃষ্ণারই নামান্তর। তৃষ্ণা অপর সাধারণ সহকারী কারণ সহযোগে জীবগণকে ভব হতে ভবান্তরে সিদ্ধন বা বন্ধন করায় বলে বান নামে অভিহিত হয়। ‘নি’ উপসর্গ তৃষ্ণার অভাব প্রতিপাদক। ‘বান’ কে তীর অর্থে ও ব্যবহার চলে। লোভ, দ্বেষ, মোহ রূপ তীরের বিদ্ধ দুঃখ নেই অর্থেও নির্বাণ বুঝায়।

অর্থাৎ যে ধর্ম প্রত্যক্ষ করলে সর্ব দুঃখের নিরোধ বা পরিনিবৃত্তি হয় তাহাই পরিনির্বাণ।

নির্বাণ শাস্তির লক্ষণ। দুঃখের উপশম-ই ইহার স্বভাব। জন্ম মৃত্যু রূপ চ্যুতিহীনতা ইহার রস বা কৃত্য।

মহর্ষীগণের মতে ও-

পদমচ্ছুতমচ্চস্ত সঙ্ঘতমনুত্তরং

নিক্খাণ মিতি ভাসন্তি বানযুস্তা মহেসয়া।

তৃষ্ণামুক্ত বুদ্ধাদি মহর্ষীগণ অচ্যুত অত্যন্ত অকার্যকারণ সঙ্ঘাত অনুত্তর শাস্তিপদকে ‘নিক্খাণ’ নামে অভিহিত করেন।

২। নির্বাণের দুই অবস্থা। সোপাদিশেষ ও অনুপাদিশেষ। অতীত জন্মের অবিদ্যা ও তৃষ্ণারূপ হস্তাঘয়ে বর্তমান পঞ্চক্কদ্ধ দৃঢ় রূপে আদান বা গ্রহণ করায় বলেই ইহার নাম (পঞ্চক্কদ্ধ) উপাধি। এই উপাধি বা দেহধারী জীব অবিদ্যা ও তৃষ্ণার অবর্তমানে যে প্রীতিসুখ লাভ করেন তা (স-উপাদিশেষ) সোপাদিসেস নিক্খাণ এবং উপদি বা

দেহের অবর্তমানে ‘অনুপাদিসেস’ নিৰ্বাণ। অনুপাদিসেস নিৰ্বাণের অবস্থা অনিৰ্বচনীয়। বুদ্ধের মতে-

‘বিএগণস্ নিরোধেন তন্থজ্জয় বিমুত্তিনো
পজ্জাতস্ সৰ্ব নিৰ্বাণং বিমোক্ষো হোতি চেতসো।

অর্থাৎ- প্রজ্জ্বলিত অগ্নিস্কন্ধ নিৰ্বাণের মতো তৃক্ষাক্ষয়ে বিমুক্ত যোগীর বিজ্ঞানের নিরোধে চিন্তের বিশেষ মোক্ষ বিশেষ মুক্তি লাভ ঘটে।

মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য নাগার্জুন- এর মতে-

অপ্রতীতম অসম্প্রাক্তম অনুচ্ছিন্নম অশ্বাশ্বতম
অনিরুদ্ধম অনুৎপন্নম এব নিৰ্বাণং উচ্যতে।

অর্থাৎ- (চরম) বিজ্ঞানের নিরোধের পর চিন্ত সম্ভূতির যে অবস্থা হয় তা প্রতীতি বা ধারণার অতীত। সম্প্রাপ্তির অতীত অর্থাৎ বস্তু বিশেষের ন্যায় লভ্য নহে। ইহা ছেদন যোগ্য বিষয় ও নহে। ইহা রোধের যোগ্য ও নহে- যেহেতু ইহার উৎপত্তি নাই। এসকল লক্ষণযুক্ত অবস্থাই নিরূপাদিসেস নিৰ্বাণ।

জ্ঞানীগণ সমগ্র পদার্থকে সম্ভূত ও অসম্ভূত এই দু’ ভাগে বিভক্ত করেছেন। যা কার্য-কারণ সম্ভূত তা সম্ভূত। আর যা কার্য-কারণ সম্ভূত নহে তা অসম্ভূত। ইহা-ই নিৰ্বাণ।

বুদ্ধ বলেন, হে ভিক্ষুগণ; ইহা উৎপত্তি বিনাশ এবং উভয়ের মধ্যে স্থিতির অনন্যাবস্থা। কারণ সম্ভূত কার্য মাত্রই পরিবর্তনশীল। তথা উত্থান হতে পতন পর্যন্ত পরিণাম স্বভাব। বহুবিধ হেতু ও প্রত্যয় সহযোগে জীব জন্ম গ্রহণ করে, তাই মরে। আবার জন্ম হতে মৃত্যুর মধ্যে ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়ে জ্বর ব্যাধিগ্রস্ত হয়। সুতরাং পঞ্চস্কন্ধ রূপ জীব বা সংসার দুঃখময়।

দেহ বিদ্যমানে সুখ দুঃখের যে জোয়ার ভাঁটা, সেই সুখ-দুঃখের উপশমই হলো সুখ। অনুপাদিসেস অবস্থাই সেই উপশম সুখ। এই অনিৰ্বচনীয় অবস্থাটা সুখ সংজ্ঞায় না হলে, প্রকাশ করার মতো অন্য ভাষা মিলে না। তাই ভগবান সিংহনাদে দেশনা করলেন- ‘নিৰ্বাণং পরমং সুখং’।

এমন নিৰ্বাণ কোথায়? নিৰ্বাণের কোন বর্ণ গন্ধ বা ভৌগলিক অবস্থান নেই। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, তেজ্জ্বাতির গতি নিরন্তর আছে। অথচ সাধারণে তা চর্মচোখে দেখে না। তদরূপ নিৰ্বাণ সাধারণের নিকট সহজে বোধগম্য না হলেও, জীবন দুঃখের দহনে কাতর আরক্ত বীৰ্য্য যোগী ইহার সাথে সম্পর্কিত হয়ে পরম শান্তি লাভ করতে পারেন। কাজেই নিৰ্বাণের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা এর নাম দিয়েছেন ‘The flower of Indian thought’। ব্যবহারিক কারণে ঘটশূণ্য বললে জলের অভাব, কিন্তু পটশূণ্য বললে চালের অভাবই বুঝাবে। অতএব ‘নিৰ্বাণের সর্বশূণ্যতা’ আর ব্যবহারিক শূণ্যতা এক নহে। ‘অধি নিক্কুতি ন

নিব্বুতোপুমা' অর্থাৎ নিব্বুতি আছে কিন্তু নিব্বুতো ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই। ইহাই বৌদ্ধ শূন্যতাবাদ।

ছাতিফাটা তৃষিতের শীতল জল পানে যে অনুভূতি, তা প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়। তেমনি নির্বাণ- ও। চারি আর্ষসত্যের সম্যক উপলব্ধির পথেই মিলবে এই নির্বাণের সন্ধান।

চারি আর্ষসত্য কি?

চারি আর্ষসত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

১) দুঃখ আর্ষসত্য, ২) দুঃখের কারণ আর্ষসত্য, ৩) দুঃখের নিরোধ আর্ষসত্য এবং ৪) দুঃখ নিরোধের মার্গ বা উপায় আর্ষসত্য। 'আর্ষসত্য' অর্থে অনন্য, চিরন্তন এবং প্রাজ্ঞজনের বোধগম্য সত্য বুঝায়।

১) দুঃখ আর্ষসত্য কি? জন্ম দুঃখ, জ্বর দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বিয়োগ দুঃখ, ইচ্ছিত বস্তুর অলাভ দুঃখ, সংক্ষেপে বলতে গেলে জন্মের কারণে দেহ ধারণ হেতু তথা এই পঞ্চস্কন্ধের কারণে জীবনে যত কিছু ঘটে সবকে দুঃখময় রূপে দর্শনের দ্বারা প্রজ্ঞা-চক্ষু উৎপাদনই দুঃখ আর্ষসত্য।

২) দুঃখের কারণ আর্ষসত্য কি? সংক্ষেপে মোহ তথা এবং তৃষ্ণা বা অত্যাশঙ্কিই দুঃখ উৎপত্তির মূল কারণ।

৩) দুঃখ নিরোধ আর্ষসত্য কি? প্রজ্ঞার আলোকে তৃষ্ণার পরিণতি দর্শন পূর্বক বিষ্ঠা তুল্য ঘৃণিত, মহা অগ্নি তুল্য সেই তৃষ্ণাকে সমূলে উচ্ছেদ সাধনই দুঃখের নিরোধ আর্ষসত্য।

৪) দুঃখ নিরোধের মার্গ বা উপায় আর্ষসত্য কি? জীবন দুঃখের অবসানের সাধনায় এই মার্গ বা উপায় হলো ৮টি। দৈনন্দিন জীবনাচারে যা নিয়মিত অনুশীলনে গাঢ় অভ্যাসে পরিণত করতে হয়। যথা- ১) সম্যক দৃষ্টি খাঁটি বা অপ্রাস্ত সত্য জ্ঞান। আমার যাবতীয় সুখ-দুঃখ আমার কর্ম দ্বারাই সৃষ্ট, অন্য কারো হাত এতে নেই। ২) সম্যক সংকল্প পরিভোগের পরিবর্তে ত্যাগের সংকল্প, হিংসার পরিবর্তে মৈত্রীর সংকল্প, পরের দুঃখে করুণা জাহ্নত করার সংকল্প। ৩) সম্যক বাক্য- সত্য বা অবিরুদ্ধ বাক্য। ৪) সম্যক কর্মান্ত- সং বা পবিত্র কর্মী হওয়া, ৫) সম্যক আজীব- সং জীবিকা, ৬) সম্যক ব্যায়াম- একান্ত অনবদ্য সং চেষ্টা, ৭) সম্যক স্মৃতি- কালে, বাক্যে ও মনে সদা জাহ্নত অবস্থায় পাপ বিরতি চিন্তে কর্ম সম্পাদন, ৮) সম্যক সমাধি- উপরোক্ত সপ্তবিধ কর্ম সম্পাদনে চিন্তের একাগ্রতা, চিন্তা নিবিষ্টতা ভাব অক্ষুন্ন রাখা।

গৃহীত জীবনে সপ্ত অপরিহানী বা উন্নতির কারণ :

১। পারিবারিক বা সামাজিক সমস্যা সমূহ সমাধানে অথবা পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের লক্ষ্যে ঘন ঘন সকলে একত্রিত হওয়া। সং উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হলে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় হয়, সহমর্মীতা বৃদ্ধি পায়, যথা সময়ে সমস্যার সমাধান হয়।

২। বিচ্ছিন্ন ভাবে, অনেচ্ছ পর পর, অনিচ্ছুক মনোভাব নিয়ে সভা বৈঠকে যোগদান না করে একই সময়ে, পবিত্র দায়িত্ব জ্ঞানে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে একতাবদ্ধ হয়ে সমবেত হওয়া এবং সকলে একমত হয়ে একই সঙ্গে বৈঠক হতে উঠে যাওয়া, একতাবদ্ধ হয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত মতে কাজ করা, কোন কারণে সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামতের বিরুদ্ধাচরণ না করা।

৩। পরিবারে বা সমাজে পূর্বে যে সকল সদাচার ছিল তা ত্যাগ না করা, মিথ্যা কুসংস্কার থাকলে তা ত্যাগ করা, বর্তমানের মঙ্গল জনক বিধি ব্যবস্থা সমূহের প্রবর্তন করা এবং কদাচার সমূহ হতে সযত্নে দূরে থাকা। সর্বদা প্রচলিত রাজ্য শাসন নীতির অনুবর্তী হয়ে চলা।

৪। পরিবারে ও সমাজে বৃদ্ধ বয়োজ্যেষ্ঠদের গৌরব, সম্মান প্রদর্শন করা এবং সেবা-সৎকার করা। তাঁদের হিতোপদেশ মেনে চলা।

৫। পরিবারে ও সমাজে কুলবধু, কুলকুমারীদের দূষণ, বলৎকার, বলপূর্ব নিজ গৃহে বসতি- এসকল অধর্ম, অন্যায় আচরণ হতে সম্পর্গ বিরত থাকা। তাদের মান-সম্মান ও নিরাপত্তা বিধান করা।

৬। পরিবারে ও গ্রামে যে সকল ধর্মস্থান, ধর্ম সম্পদ, এবং সার্বজনীন স্থান ও সার্বজনীন কল্যাণ মূলক সম্পদ থাকে, তার সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ করা। তৎ সমুদয়ে রক্ষণাবেক্ষণে প্রদত্ত সম্পদ কোন কারণে নষ্ট হতে না দেয়া। অধিকন্তু নিজের নিকট হতে শক্তি প্রমাণে উক্ত সম্পদ রক্ষায় অংশ গ্রহণ করা।

৭। সমাজে ও পরিবারে যারা গুণী জ্ঞানী, ধার্মিক, শীলবান, ধ্যানী, মার্গলাভী, পরকল্যাণ ত্রুতী ব্যক্তি আছেন, তাঁদের সার্বিক সুখ, সুবিধা, ও সেবা-যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা। অনুরূপ জ্ঞানী ধ্যানী, শীলবান সজ্জন সৎপুরুষের আরো আগমন হউক- প্রত্যহ এরূপ কামনা করা। এই সপ্ত বিধি পালনে পরিহানী রোধ হয়, উন্নতি অবশ্যম্ভাবী হয়।

ভিক্ষুদের সপ্ত অপরিহানীয় বিধি :

১। ভিক্ষুগণ যদি সর্বদা সম্মিলিত হন, সম্মিলিত হতে সঙ্কোচ বোধ না করেন। এবং পরস্পরের ঋণী বিচ্যুতি সংশোধনে সহায়তা প্রদান করেন, আপন বিচ্যুতি অকপটে প্রকাশ ও আত্ম সংশোধনে সর্বদা উৎসাহী থাকেন। এমনটি হলে ভিক্ষু জীবনের শ্রীবৃদ্ধি অনিবার্য হয়।

২। ভিক্ষুগণ যদি একতাবদ্ধ ভাবে সম্মিলিত হন, সকলে অকপটে যুক্তি সহ আপন মতামত সভা বৈঠকে প্রকাশ করেন, সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামত শিরোধার্য করে একতাবদ্ধ ভাবে উঠে যান এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত একতাবদ্ধ হয়ে বাস্তবায়িত করেন। এতে ভিক্ষু জীবনের শ্রী-সমৃদ্ধি অনিবার্য হয়।

৩। ভিক্ষুগণ যতদিন বুদ্ধ কর্তৃক অমঙ্গল প্রদ অ-প্রজ্ঞাপ্ত বিধি বা শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত না করেন, প্রজ্ঞাপিত মঙ্গল প্রদ বিধি ও শিক্ষা উপদেশ সমুচ্ছেদ বা লঙ্ঘন না করেন, তৎসমুদয় অনুশীলনে উৎসাহী থাকেন। ততদিন ভিক্ষু জীবনের শ্রী-সমৃদ্ধি অনিবার্য থাকবে। বুদ্ধ কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত কোন শিক্ষাপদ পরিবর্তন বা নতুন শিক্ষাপদ প্রবর্তনে সজ্জেকে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তই নিতে হবে।

৪। ভিক্ষুগণ যতদিন হ্রবির, বহুত্রিভুজ ধ্যানী, বহুদিনের প্রব্রজ্যিত, সজ্ঞপিতা, সংঘনেতাগণকে সৎকার করবেন, গৌরব করবে, সম্মান-পূজা ও রক্ষণাবেক্ষণ করবেন, তাঁদের হিতোপদেশের অনুবর্তী হয়ে চলবেন; ততদিন ভিক্ষু জীবনের শ্রী-সমৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

৫। ভিক্ষুগণ যতদিন পুনঃজন্ম দায়িকা উৎপন্ন তৃষ্ণার বশবর্তী না হবেন, চতুষ্প্রত্যয়ের জন্যে দায়কের পদানুবর্তী না হবেন; ততদিন ভিক্ষু জীবনের শ্রী-সমৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

৬। ভিক্ষুগণ যতদিন অরণ্য স্থিত শয়নাসনের প্রতি সাপেক্ষ অর্থাৎ অরণ্যে বাস করার একান্ত পক্ষপাতি থাকবেন; ততদিন ভিক্ষুদের শ্রী-সমৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

৭। ভিক্ষুগণ যতদিন নিজ নিজ অন্তরে এই স্মৃতি জাগাবে যে, আমার নিকটে প্রিয়শীল, ধ্যানী, অনাসক্ত সত্রক্ষাচারীগণ আগমন করুন, আগত শীলবান, ধ্যানী, জ্ঞানী, অনাসক্ত সত্রক্ষাচারীগণ সুখে ও নিরাপদে অবস্থান করুন; ততদিন ভিক্ষুদের শ্রী-সমৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

এই সপ্ত বিধি অনুশীলনে ভিক্ষুর উন্নতি, বিদ্যা-বিমুক্তি অবশ্যম্ভাবী, কখনো পরিহানী ঘটবে না।

২য় সপ্ত অপরিহানীয় বিধি :

১। ভিক্ষুগণ যতদিন কর্মপ্রিয়, বহুবিধ কর্মে ব্যাপ্ত না হবে।

২। ভিক্ষুগণ যতদিন সারহীন আলাপপ্রিয়, সারহীন আলাপরত না হবে।

৩। ভিক্ষুগণ যতদিন নিদ্রারাম, নিদ্রালু, নিদ্রারামতায় অনুযুক্ত না হবে।

৪। ভিক্ষুগণ যতদিন জনসঙ্ঘারাম, জনসঙ্গরত, জনসঙ্গরামী না হবে।

৫। ভিক্ষুগণ যতদিন পাপেচ্ছানুযায়ী, পাপেচ্ছার বশবর্তী না হবে।

৬। ভিক্ষুগণ যতদিন পাপমিত্র, পাপসহায়, পাপ প্রবণ, পাপ কুটিল না হবে।

৭। ভিক্ষুগণ যতদিন সামান্যমাত্র ফল বা স্রোতাপত্তি ফলমাত্র প্রাপ্ত হয়ে অরহত্ব ফল প্রাপ্ত না হওয়ার পূর্বে আমার কর্তব্য শেষ হইল- এই বলে উৎসাহ ত্যাগ না করবে।

৩য় সপ্ত অপরিহানীয় বিধি :

- ১। ভিক্ষুগণ যতদিন শ্রদ্ধা সম্পন্ন হবে।
- ২। ভিক্ষুগণ যতদিন পাপ কর্মে লজ্জাশীল হবে।
- ৩। ভিক্ষুগণ যতদিন পাপে ভয়শীল হবে।
- ৪। ভিক্ষুগণ যতদিন শাস্ত্রজ্ঞ বহুশ্রুত হতে উৎসাহী হবে।
- ৫। ভিক্ষুগণ যতদিন কায়িক ও মানসিক (চৈতসিক) আরক্ত বীর্য সম্পন্ন হবে।
- ৬। ভিক্ষুগণ যতদিন স্মৃতিমান ও স্মৃতিশক্তি বর্ধনে উৎসাহী থাকবে।
- ৭। ভিক্ষুগণ যতদিন পঞ্চকঙ্কের (দেহের) উদয়-ব্যয় (উৎপত্তি-বিনাশ) সম্পর্কে প্রজ্ঞা সমন্বাগত হতে স্বতঃ উৎসাহী থাকবে। ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যস্বাভাবী, পরিহানি হবে না।

৪র্থ সপ্ত অপরিহানীয় বিধি :

- ১। ভিক্ষুগণ যতদিন চারি প্রকারে (দাঁড়ানে, গমনে উপবেশনে এবং শয়নে) স্মৃতি সম্বোধ্যজ্ঞ উৎপাদনে করতঃ (ভাবনা) তা বর্ধিত করতে স্বতঃ উৎসাহী থাকবে।
 - ২। ছয় প্রকারে ধর্ম বিচয় সম্বোধ্যজ্ঞ উৎপাদন করতঃ বর্ধিত করবে।
 - ৩। নয় প্রকারে বীর্য সম্বোধ্যজ্ঞ উৎপাদন করতঃ বর্ধিত করবে।
 - ৪। দশ প্রকারে প্রীতি সম্বোধ্যজ্ঞ উৎপাদন করতঃ বর্ধিত করবে।
 - ৫। পাঁচ প্রকারে উপেক্ষা সম্বোধ্যজ্ঞ উৎপাদন করতঃ বর্ধিত করবে।
 - ৬। সাত প্রকারে প্রতীতি সম্বোধ্যজ্ঞ উৎপাদন করতঃ বর্ধিত করবে।
 - ৭। পাঁচ প্রকারে উপেক্ষা সম্বোধ্যজ্ঞ উৎপাদন করতঃ বর্ধিত করবে।
- ততদিন ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যস্বাভাবী পরিহানি হবে না।
- * মহাপরিনির্বাণ সূত্র (বজ্রানুবাদ) এর পরিশিষ্টে বিশদ দ্রষ্টব্য।

৫ম সপ্ত অপরিহানীয় বিধি :

- ১। ভিক্ষুগণ যতদিন অনিত্যানুদর্শনে উৎপন্ন সংজ্ঞা (ভাবনা) বর্ধিত করবে।
 - ২। ভিক্ষুগণ যতদিন অনাত্মানুদর্শনে উৎপন্ন সংজ্ঞা বর্ধিত করবে।
 - ৩। ভিক্ষুগণ যতদিন অন্তর্ভানুদর্শনে উৎপন্ন সংজ্ঞা বর্ধিত করবে।
 - ৪। ভিক্ষুগণ যতদিন আদীনবানুদর্শনে উৎপন্ন সংজ্ঞা বর্ধিত করবে।
 - ৫। ভিক্ষুগণ যতদিন ত্যাগানুদর্শনে উৎপন্ন সংজ্ঞা বর্ধিত করবে।
 - ৬। ভিক্ষুগণ যতদিন বিরাগানুদর্শনে উৎপন্ন সংজ্ঞা বর্ধিত করবে।
 - ৭। ভিক্ষুগণ যতদিন নিরোধানুদর্শনে উৎপন্ন সংজ্ঞা বর্ধিত করবে।
- ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যস্বাভাবী, পরিহানি হবে না।

৬ষ্ঠ অপরিহানীয় ধর্ম বিধি :

১। যতদিন ভিক্ষুরা সত্রাচারীগণের সম্মুখে এবং পরোক্ষ তাদের প্রতি কার্যিক কর্মসমূহ মৈত্রী পূর্ণ চিন্তে সম্পাদন করবে।

২। যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুরা সত্রাচারীগণের সম্মুখে এবং পরোক্ষ তাদের প্রতি বাচনিক কর্মসমূহ মৈত্রীপূর্ণ চিন্তে সম্পাদন করবে।

৩। যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুরা মনো কর্মসমূহ মৈত্রীপূর্ণ চিন্তে সম্পাদন করবে।

৪। যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুরা চীবরাদি ধর্মতঃ লব্ধ প্রত্যয় শীলবান সত্রাচারীগণের সহিত সমান অংশে বিভাগ করিয়া পরিভোগ করবে।

৫। যেই শীলসমূহ তৃষ্ণার দাসত্ব হতে মোচন করে মুক্ত ভাবকরণ সমর্থ বুদ্ধাদি বিজ্ঞান কর্তৃক প্রশংসিত, তৃষ্ণা ও দৃষ্টি দ্বারা অপরাধমর্শিত (অমুক অন্যায় তুমি করেছে- ইহা বলতে অক্ষম), উপাচার ও অর্পণা সমাধি প্রবর্তনকারী, সেই শীলসমূহ ভিক্ষুগণ যতদিন অখণ্ড অচ্ছিন্ন অশবল (অবিবিধ রূপে), অকল্যাণ রূপে (অমলিন ভাবে) প্রতিপালন করবে, সত্রাচারীগণের প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে সেই সমুদয় শীলে সমান শীল সম্পন্ন হয়ে বিহার করবে।

* সপ্ত আপত্তি কঙ্কের আদি বা অন্তের শিক্ষাপদ ভঙ্গ হলে- খণ্ড, মধ্যের শিক্ষাপদ ভঙ্গ হলে ছিদ্র, ক্রমাধ্বয়ে ২/৩টি শিক্ষাপদ ভঙ্গ হলে সবল, অন্তরে অন্তরে ভঙ্গ হলে- কল্যাণ নামে কথিত হয়। যাহার কোন শিক্ষাপদ ভঙ্গ হয়নি তাঁর শীল অখণ্ড, অচ্ছিন্ন, অসবল, অকল্যাণ বলা হয়। স্রোতাপনাদি মার্গফল লাভী ভিক্ষুগণ যেখানে বাস করুন না কেন তাঁদের শীল একই সমান থাকে। পুথুজ্ঞান (মার্গফলহীন) ভিক্ষুগণ নানা স্থানে বাস করলে ও তাঁদের শীল যেন ভঙ্গ না হয়, ভঙ্গ হলেও যেন যথোচিত প্রতিকার করেন- এরূপ বিহারীকে শীল সমন্বাগত বিহারী বলে উক্ত হয়েছে। শীল বিতৃষ্ণি দ্বারা দেব- ব্রহ্মাদি হওয়ার তৃষ্ণায় শীল পালনকে দৃষ্টি দ্বারা অপরাধমর্শিত বলে উক্ত হয়।

৬। ভিক্ষুগণ, আমার এবং তোমাদের প্রত্যক্ষভূত যে নির্দোষ নৈয়ায়িক মার্গ সম্প্রযুক্ত সম্যক দৃষ্টি (জ্ঞান), যেই জ্ঞান অনুযায়ী চললে সংসার দুঃখের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি ঘটে, ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্যন্ত সত্রাচারীগণের সম্মুখে ও পরোক্ষে সেই দৃষ্টিতে (জ্ঞানে) সমান দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে বিহার করবে।

এই ষড়বিধ অপরিহানীয় ধর্ম ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান থাকলে, এই ষড়বিধ অপরিহানীয় ধর্মের অনুবর্তী হয়ে চললে ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যস্বাভাবী পরিহানী ঘটবে না।

সাধু! সাধু! সাধু!

[প্রজ্ঞাবংশের আত্মজীবন প্রথম খণ্ড সমাপ্ত]